মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১.শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩.৯। আগষ্ট, ১৯১২। [.ম সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

মহিলার অষ্টাদশবর্ষের নির্ঘণ্ট।

১ম সংখ্যা, শ্রাবণ।

২য় সংখ্যা, ভাদ্র।

৩য় সংখ্যা, আশ্বিন।

৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক।

৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ।

৭ম সংখ্যা, মাঘ।

৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন।

৯ম সংখ্যা, চৈত্র।

১০ম সংখ্যা, বৈশাখ।

১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ।

১২শ সংখ্যা, আষাঢ়।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১৮শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১৯। আগষ্ট, ১৯১২। [ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি আপনার অযাচিত কৃপাতে তোমার কন্যাগণের জন্য শত সহস্র মঙ্গলাশীর্ব্বাদ দান করিয়াছ। অগণ্য-নক্ষত্র-শোভিত বিচিত্র-রূপধারী আকাশ তুমি না চাহিতে দিয়াছ, ফল-জল-ধনরত্ন-শোভ-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ এই পৃথিবী তোমারই দয়ার দান, প্রিয় আত্মীয়-গণ, গুরু উপদেষ্টৃগণ, সকল জনমণ্ডলী তোমারই কৃপায় আমরা লাভ করিয়াছি। তোমার কৃপায় এত পাইয়াও আমাদের অভাব দূর হয় নাই, তুমি নিত্য নব নব অভাব সকল নিজ কৃপাতে পূরণ করিতেছ; এসকল তোমার এক প্রকার বিধি, কিন্তু তুমি আমাদিগের পক্ষে উন্নতর এক বিধি করিয়াছ, যে যদিও আমরা না চাহিয়া এত পাইয়াছি তথাপি ইহাতে আমাদিগের নিবৃত্তি হইবে না। পৃথিবীসম্বন্ধে এত ধন পাইয়াও যে আমাদের আত্মা অতি দীন দরিদ্র রহিয়াছে, তাহা এই অবস্থা প্রকাশ করিতেছে যে, তুমি তোমার কন্যা-গণকে আত্ম-রাজ্যের ধন, প্রেম, পুণ্যের ভিখারিণী হইতে বলিতেছ। এদিকে দেখ, হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, সংসারে বিবিধরূপ অযাচিত দান পাইয়া তোমার কন্যাগণ একরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহারা এই চঞ্চল ধনজনকে স্থায়ী সুখের আধার মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়া-ছেন। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তোমার বঙ্গবাসিনী কন্যাগণকে তুমি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেও যে, সংসারে যাহা যাহা পাইয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন সে সকল অতি সত্বর চলিয়া যাইবে— অপরদিকে তোমার নিকটে স্বর্গের সম্পদ্ প্রার্থনা করিলে তুমি কৃপা করিয়া তাহা দান করিবে এবং সে সম্পদ চিরকালের জন্য তাঁহাদিগকে সুখী করিবে। করুণা-ময়, তুমি করুণা করিয়া তোমার কন্যা-দিগকে দিব্যচেতনা দান কর, যে তাঁহারা

আপনাদিগের আত্মার দৈন্য অনুভব করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যগ্র হইয়া উঠুন। দয়াময়, দয়া করিয়া ধনজনে সুখী মানব সকলকে তাহাদিগের মোহমুগ্ধ অবস্থা বুঝিতে দেও এবং তোমার স্বর্গরাজ্যের মহাধন প্রেম পুণ্যের জন্য ব্যাকুল কর এই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা।

ভারত মহিলা ও বর্ত্তমান শিক্ষা।

যেমন রাজপুরুষবর্গ তেমন ভারতবাসী শিক্ষিতগণ ভারত মহিলাকুলের শিক্ষার অভাব সহস্র কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। অথচ ভারতের জনসাধারণে জ্ঞানালোক-বিস্তারের এখনও অত্যল্প মাত্র চেষ্টা হইতেছে। বহুসংখ্যক পুরুষই এ ভারতে অদ্যাবধি বর্ণমালার জ্ঞানেও বর্জ্জিত; ভারতের নারীর আর কথা কি? যাহারা ভারতে ভদ্রলোক, জ্ঞানচর্চ্চা ভিন্ন জীবিকাসংগ্রহের যাঁহাদের গত্যন্তর নাই, তাঁহাদের অনেকের গৃহাভ্যন্তর অর্থাৎ যোষিৎবর্গও ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন। মহিলাদিগকে ঘোরতর মূর্খতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা ভারতের অধঃপাতের প্রধানতম হেতু। অদ্যাবধি সেই হেতু দূরীকরণে ভারতে নব্যশিক্ষিত সভ্য ভব্য নামধারিগণ সকলে একমন একবাক্যে দৃঢ়ব্রত হন নাই, অথবা ইহা তেমন অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া বোধ হয় অনেকে অনুভব করেন: নাই। যাঁহারা এই ভারতবর্ষে নারীজাতির শিক্ষাবিধানে সচেষ্ট, তাঁহাদেরও গোড়া হইতে একটি ভুল হইয়া যাইতেছে। সে ভুলটি না রাজকীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের, না এদেশীয় নারীজাতির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিগণের চক্ষে পড়িতেছে। এ ভুল সংশোধনের জন্য তুমুল আন্দোলন, সকলের সমবেতভাবে করা আবশ্যক। পরন্তু কোন পত্রিকা-সম্পাদক, কোন শিক্ষাবিভাগীয় রাজকীয় সদস্য, কিম্বা উচ্চ শিক্ষিত লোক এ বিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করিতেছেন না। আমরা এজন্য এ বিষয় নির্দ্দেশ করা অত্যাবশ্যক বোধ করিতেছি। সে বিষয়টি এই :—

মহিলাগণের শিক্ষার আদর্শ।

এদেশে পুরুষদিগকে যে আদর্শে শিক্ষা প্রদান করা হয়, নারীদিগকেও ঠিক সেই আদর্শে শিক্ষাপথে অগ্রসর করা হইতেছে। বালক বালিকাগণের পরীক্ষাও একত্র গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বালিকাদিগকে বালকদিগের সহিত পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

সংসারে পুরুষের জীবনের কার্য্য এবং নারীর জীবনের কার্য্য যে এক নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয়। পুরুষের শরীর মন হৃদয় হইতে নারীর শরীর মন হৃদয়কে বিধাতা একই অথচ পৃথক্ উপাদানে সৃজন করিয়াছেন। উভয় জাতি এ সংসারের কল্যাণার্থ এবং মনুষ্যজাতির উন্নতি সাধনার্থ একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিবে, ঈশ্বরের এ অভিপ্রায় সভ্যাসভ্য এবং শিক্ষিতাশিক্ষিত নির্ব্বি-

শেষে সমস্ত মানবসমাজে দেদীপ্যমান। বাল্যাবধি চালচলন ক্রীড়া কৌতুক বিষয়ে বালক হইতে বালিকা বিভিন্ন। এইরূপ পরিষ্কার প্রাকৃতিক বিভিন্নতা শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাকালে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা কি নিতান্তই বিচারবিরহিত খাম খেয়ালের প্রকাশ নহে? শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা অধ্যক্ষ, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত, চিন্তাশীল এবং অনেকে বিশেষভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ নামে খ্যাত। তথাপি তাঁহারা বালিকাকুলের প্রতি তাহাদের অনুপযোগী শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থানের প্রতিকূলে কেহই একটি কথাও বলিতেছেন না; ইহার অর্থ কি আমরা তাহা অবধারণে অসমর্থ বোধ করিতেছি।

যে সকল বালিকা বর্ত্তমান প্রণালীঅনুসারে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে না; তাহারা মস্তিষ্কের পীড়ায় অনেকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। শিক্ষিতাগণের মধ্যে যাঁহারা গৃহিণী ও জননী হইতেছেন, তাঁহাদের অনেক অত্যাবশ্যক বিষয়ে উচ্চভাবে কিছুই জ্ঞান সঞ্চিত হয় নাই। এজন্য তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অভাব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী অবলাবান্ধববর্গেরও সেদিকে তিল পরিমাণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। সকলেই গতানুগতিকের মত যেমন চলিয়া আসিয়াছে তেমন স্রোতেই স্ব স্ব কন্যা ও আত্মীয়াদিগকে ভাসাইয়া দিতেছেন, ইহা কি ঠিক হইতেছে? আমরা এ বিষয়ে রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ এবং স্বদেশীয় শিক্ষিতদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য শত সহস্র বার অবশ্যই চেষ্টা করিব।

এদেশে বর্ত্তমান সময়ে স্বল্পসংখ্যক মহিলা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নানারূপে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা ত ভুক্তভোগী। তাঁহাদিগের প্রতি আমরা একান্ত অনুরোধ করি, যে বালিকাদিগকে বালকদের আদর্শানুসারে বাল্যাবধি শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান কি তাঁহারা সঙ্গত বোধ করেন? অধুনা মহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত কতিপয় মাসিক পত্রও এদেশে মাসে মাসে শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছে। সে সকল পত্রিকাতে কেন এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করা হয় না! তাঁহারা কেহই কি এ বিষয়ে চিন্তা করেন না? অথবা এ বিষয়ে কি তাঁহাদের মনে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিকূল ভাব কি কিছুই নাই? নারীজাতি যদি নারীজাতির শক্তি সামর্থ্য ও তাহার অনুরূপ পরিস্ফুরণ বিষয়ে চিন্তা না করেন, তবে শিক্ষার দ্বারা বিশেষ কি ফললাভ হইল?

নারী নরের সহায়। নারী নরের অনুগত। নারী নরের মুখাপ্রেক্ষিণী। ইহা ত চিরদিনের চলিত অবস্থা। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমিতে শিক্ষিতা নারীগণ বরং নরবৎ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রমণী প্রকৃতিতে স্থির থাকিয়া রমণীরূপে কিরূপে নর হইতে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইবেন, সেরূপ যত্ন কি ইউরোপে, আমেরিকা মহাদেশে নারীজাতিমধ্যে এক বিন্দু ও প্রকাশ পাইতেছে? নারী মনুষ্য

জাতির জননী। সুতরাং জননীরূপে নারী জাতি চিরদিন মানবজাতির পূজনীয়া থাকিবার কথা। জননীরা বিংশশতাব্দীতে শিক্ষা ও ধর্ম্মে, আচারে ও রীতিতে কিরূপে প্রাচীন কালের রমণী-কুলাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়া সত্য সত্য নরকুলের পূজার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কি তাঁহারা আপনারা চিন্তা করিবেন না?

নারী গৃহলক্ষ্মী গৃহকর্ত্রী। গৃহে নারীরই আধিপত্য। গৃহধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য রীতি নীতির উচ্চতা ও পবিত্রতা রক্ষার ভার নারীভিন্ন কে বহন করে? তবে নারী-গণের কি এজন্য পুরুষগণ অপেক্ষা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন নাই? পুরুষের সহিত সমভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে নারী-জাতির সেই বিশেষত্ব কিরূপে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ হইবে। অস্মদ্দেশে যত দিন নারীজাতি কোনরূপ শিক্ষা একবারে পায় নাই, ততদিন প্রকৃতি তাহাদিগকে এক প্রকার গৃহিণী-ধর্ম্ম শিক্ষা দিত। এখন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করা প্রযুক্ত সেই স্বভাবের প্রভাব অনেকটা থাকে না। এসকল বিষয়ে রমণীগণের কি চিন্তা হইবে না?

যে সকল ইংলণ্ডীয় শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি এদেশে শিক্ষা বিভাগের অধিপতি ও সদস্য, তাঁহারা কি তাঁহাদের স্বদেশে নারী জাতির শিক্ষা পুরুষের সহিত সম ভাবে প্রবর্ত্তিত দেখেন? যদি তাহা না হয় তবে এতদ্দেশে কেন তাহা হইবে? এদেশের অত্যন্ত পতিত ও দুরবস্থাতে ইংরাজগণ এদেশের যুবক যুবতী দিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদেশীয় জন সাধারণের তখন এবিষয়ে একবিন্দু কর্ত্তব্য বোধ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যদি এই শিক্ষা বিষয়ক ঘোরতর আন্দো-লন এবং উদ্যমের সময়ে বিশেষভাবে নারী জাতির উপযোগী শিক্ষাবিধানের উপযোগী ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে এদেশীয় মহিলাকুলের ঘোর অনিষ্ট নিবা-রণের পথ আর কোন কালে হইবে, কে জানে? একারণে আমরা রাজকীয় শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষগণের নিকট নিতান্ত বিনয়াতি-শয়-সহকারে নিবেদন করি যে, তাঁহারা ভারতীয় কিংবা বঙ্গদেশীয় বালিকাগণের শিক্ষার স্বতন্ত্র আদর্শ নির্দ্ধারণ করুন। ইহার অভাবে সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। শরীর, মন ও জীবনের যথার্থ কল্যাণ এবং উপযোগিতা-লাভই যদি শিক্ষাবিধানের উদ্দেশ্য, তবে যে আদর্শে বালক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেই আদর্শে বালিকাকে শিক্ষা দিলে কখন কি সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে?

আমরা উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা প্রত্যেক শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং উচ্চ শিক্ষিতা রমণীদিগের নিকট যেমন উপস্থা পিত করিতেছি, তেমনি রাজকীয় শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি। শীঘ্র এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির হওয়া আমরা অত্যাবশ্যক বোধ করি।

তথাগত শিষ্য আনন্দ।

যখনই পৃথিবীতে নূতন কোনও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখনই ঐ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহায্যকারী কয়েকটী শিষ্যেরও আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ নূতন ভাব লইয়া যে ধর্ম্ম জন্মলাভ করে তাহা প্রচার করিবার জন্য, দেশ বিদেশের জনমণ্ডলীকে তাহা বিদিত করিবার জন্য নানা স্থানে গতায়াত করা প্রয়োজন হইয়া উঠে; আবার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের তিরোভাবের পর ঐ নূতন ধর্ম্মকে জাগ্রত রাখিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়; এই সকল কারণে কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে নূতন ধর্ম্মের প্রকৃতভাবে উদ্বুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

এইরূপে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব তাঁহার দীর্ঘজীবনে তাঁহার চতুঃপার্শ্বে এমন কয়েকটী শিষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ধর্ম্মের বিশেষভাবকে জাগরিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সারিপুত্র, তাঁহার পরে মৌদ্গল্লায়ন এবং তদ্ভিন্ন অনিরুদ্ধ, কাশ্যপ, উপালি, আনন্দ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্লায়ন তথাগতের তিরোধানের পূর্ব্বেই পৃথিবী ত্যাগ করেন, কিন্তু অন্যান্য সকলে বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণের পরে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার সময় পাইয়াছিলেন।

তথাগতের ধর্ম্ম কঠিন সাধনার ধর্ম্ম। যাহা কিছু আমরা স্বাভাবিক মনে করি তাহার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত—স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি সমস্তই দুঃখের মূল, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই এই সকল প্রবৃত্তি আসিয়া মনুষ্য-হৃদয় অধিকার করে; সুতরাং এগুলিকে যে কেবল দমন করিতে হইবে তাহা নহে, হৃদয় হইতে এ সমস্তকে উন্মূলিত করিতে হইবে। অতএব সিদ্ধার্থের প্রকৃত অনুচর তিনি যাঁহার মন হইতে সমস্ত বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইয়াছে, হৃদয়ের স্নেহ, মায়া, মমতা সমস্ত নির্ব্বাপিত হইয়াছে, সুখ দুঃখ সমান হইয়াছে, এবং শোক, আনন্দ তাহাদের পার্থক্য হারাইয়াছে। পৃথিবীর কোনও অবস্থা তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারিবে না। বুদ্ধদেব বহুশিষ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এত লোকে এরূপ কঠিন বিধি কি করিয়া পালন করিয়াছিলেন এবং পালন করিয়া অর্হৎ, অর্থাৎ মহাসাধক গণ্য হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইহাতেই বুঝা যায় যে শাক্যসিংহের প্রধান অনুচরগণ সাধনা দ্বারা স্ব স্ব চিত্তকে বজ্রকঠিন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা অন্য সকলের পক্ষে সত্য হইলেও কোমলচিত্ত আনন্দের পক্ষে ইহা কখনও সত্য হইতে পারে নাই। বাস্তবিক তথাগতের শিষ্যবর্গের

কঠিন এবং শুষ্ক সংযম-সাধনার ইতিহাসে আনন্দের চরিত্র একটী অভিনব বস্তু। আনন্দের হৃদয় প্রেমের হৃদয় ছিল, ইহা ভালবাসা দান করিতে পারিত এবং ভালবাসা আশা করিত; বহুবৎসরের সাধনাতে এবং বুদ্ধসহবাসেও তিনি হৃদয়ের প্রেম এবং স্নেহের স্রোত শুষ্ক করিতে পারেন নাই; শোক এবং মৃত্যু তাঁহার নিকট মহাবিভীষিকাপূর্ণ ছিল। যদিও এই সকল কারণে জীবনের শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি অর্হৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আমাদের নিকট তাঁহার এই ত্রুটির জন্যই তিনি আদরের বস্তু হইয়া আছেন। মানব-হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে না দিয়া তাহাদিগকে দমন করা অস্বাভাবিক, সুতরাং তাহা কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে পারে না; সেইজন্যই অন্যান্য শিষ্যজীবনী হইতে আনন্দের জীবন আমাদের মনকে কোমলরসে পূর্ণ করে।

আনন্দ সিদ্ধার্থের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র, সুতরাং সিদ্ধার্থ এবং আনন্দ অতি নিকট সম্পর্কিত ভ্রাতৃদ্বয়। অর্হৎ অনিরুদ্ধ এবং সিদ্ধার্থবিরোধী দেবদত্তও সিদ্ধার্থের আত্মীয় ছিলেন। কথিত আছে যে শাক্যসিংহ এবং আনন্দ উভয়ে একই দিনে এবং একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দের বাল্যকালের কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, কেবল যখন হইতে তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন তখন হইতেই তাঁহার বিষয় আমরা জানিতে পারি। অনিরুদ্ধ, আনন্দ, দেবদত্ত এবং শাক্যবংশের অন্য কয়েকটী রাজপুত্র ক্ষৌরকার উপালির সহিত একত্রে মল্লদেশস্থ অনুপ্রিয় গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দেবদত্ত ভিন্ন অন্যান্য সকলেই অতিশীঘ্র অর্হৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু আনন্দ সাধনার প্রথম অবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন। যে ধর্ম্ম হৃদয়তন্ত্রী সকলকে পৃথিবীর বন্ধন হইতে কঠোরভাবে ছিন্ন করিয়া দেয় তাহাতে কোমল-হৃদয় আনন্দ যে অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। এই কঠিন ধর্ম্ম তাঁহার স্বভাবের অনুরূপ না হওয়াতে অল্পকালের মধ্যেই আনন্দের মহা দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি ভিক্ষুর জীবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থের জীবন যাপন করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। এই বিষয় বৌদ্ধশাস্ত্রে যে অলীক বর্ণনা আছে তাহার সার কথা এই যে, বুদ্ধদেব আনন্দের মানসিক দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আর কিছুকাল জেতবনে থাকিয়া ভিক্ষুজীবনে অভ্যস্ত হইতে আদেশ করিলেন। শাক্যসিংহের আজ্ঞায় আনন্দ নূতন চেষ্টায় ও নূতন উদ্যমে সাধন আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া চিরজীবন ভিক্ষুরূপে বাস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এই সময় হইতেই আনন্দ একান্তমনে বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। দার্শনিকের কূটতর্কসমুদ্রে সন্তরণ করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল, কিন্তু প্রেমে তাঁহাকে পরাজয় করিবার কেহ

ছিল না। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া তিনি ধর্মগুরুর অবিশ্রান্ত সেবা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে বুদ্ধদেবের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। বৌদ্ধ বিবরণ সকলে দেখা যায়, যে রোগে কি সুস্থতায় আনন্দ সকল সময়ে তথাগতের সহচর ছিলেন। কিন্তু পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলেও বুদ্ধদেব যে তাঁহাকে যথেষ্ঠ সম্মান করিতেন তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে, যখন বহুসংখ্যক পুরমহিলা শাক্যের নিকট ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন একমাত্র আনন্দের আন্তরিক অনুরোধেই শাক্যসিংহ মহিলাদিগকে তাঁহার ধর্ম্মমণ্ডলীতে গ্রহণ করিলেন। নারীদিগকে মণ্ডলীভুক্ত করিতে বুদ্ধদেব প্রথমতঃ অত্যন্ত আপত্তি করেন, কিন্তু আনন্দ তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন যে, নারীজাতির নিকট তিনি কত ঋণী, তাঁহার মাতা তাঁহাকে সাতদিনের শিশু রাখিয়া পরলোকে গমন করেন, সেই সময় হইতে মাতৃস্বসা প্রজাবতী তাঁহাকে কত স্নেহও যত্নে লালিত — পালিত করেন, এবং অনুমতি-প্রার্থিনী মহিলাগণও সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই মণ্ডলীভুক্ত হইতে আসিয়াছেন। সদাশয় আনন্দের কথায় এইরূপ বশীভূত হইয়া বুদ্ধদেব নারীদিগকে ভিক্ষুণী হইতে অনুমতি দান করেন।

বুদ্ধদেবের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার জন্য একজন পরিচারক নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন হইল। এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সেবা আনন্দ করিতে থাকিলেও তাঁহাকে সে কার্য্যে মণ্ডলী নিযুক্ত করে নাই। ভিক্ষুদিগের সভা আহ্বান করিয়া কাহাকে পরিচারক করা হইবে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। প্রধানশিষ্যেরা অনেকে ঐ কার্য্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ তাহা হইলে প্রচারকার্য্যে বাধা উপস্থিত হইবে। তখন কেহ কেহ আনন্দকে ঐ কার্য্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তিনি তাহা পারিলেন না; কিন্তু বলিলেন, "যদি বুদ্ধদেব আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্য লইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তো আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাত আছেনই; তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই হয়। আমি অধিক আর কি বলিব, আমি কৃতার্থ হইব।" ইহা জানিয়া বুদ্ধদেব তখনই তাঁহাকে পরিচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে আনন্দ তাঁহাকে সিদ্ধার্থের নিকট লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার আদেশ ইত্যাদি সমস্তই আনন্দ বহন করিতেন। এইরূপে শাক্যসিংহের শেষ পঁচিশ বৎসর কাল একমাত্র আনন্দ তাঁহার সেবা করেন।

আনন্দ বুদ্ধদেবে তাঁহার সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে বা তাঁহার নিন্দা করিলে আনন্দের প্রাণে বাজিত। একদা কোশাম্বিদেশে বাসকালীন সে স্থানের লোকেরা বুদ্ধানুচরদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতে থাকেন, এবং যাহাতে বুদ্ধদেবের দুর্নাম হয় তাহারই চেষ্টা করেন। এই দুর্ব্যবহার সহ্য

করিতে না পারিয়া আনন্দ তথাগতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অন্য কোনও স্থানে বিহার স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আনন্দ, যদি সে স্থানেও আমরা এইরূপ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হই?" আনন্দ বলিলেন, "তাহা হইলে অন্যত্র গমন করিব।" "কিন্তু সে স্থানেও যদি একই ব্যবহার পাই?" "পুনরায় স্থান পরিবর্ত্তন করিব।" এই শুনিয়া বুদ্ধদেব কিছুকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে আনন্দের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সামান্য সহিষ্ণুতা থাকিলেই আমরা এই স্থানপরিবর্ত্তনের কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। জ্ঞানী ব্যক্তি সহিষ্ণুতা এবং সদ্গুণদ্বারাই তাঁহাদের শত্রুদিগকে জয় করেন।" কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থবিরোধী দেবদত্ত যখন একটী বিরুদ্ধ দল গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সিদ্ধার্থ-প্রেমিক আনন্দকে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিন্দু-মাত্রও যে সফল হইতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য। পুনশ্চ শাক্যসিংহের অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার নির্ব্বাণের প্রায় দশ মাস পূর্ব্বে তাঁহার উৎকট ব্যাধি হয়, এবং তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত যাতনা হয়। পরে আত্মশক্তি-প্রভাবে ও ধ্যান-বলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তখন আনন্দ ভীত হইয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব আর ফিরিবেন না। আরোগ্যলাভের পর তিনি বলিলেন, "ভগবান্, আপনাকে যখন পীড়িত দেখিলাম, তখন আমার এরূপ ক্লেশ হইয়াছিল যে, আমি মস্তক উত্তোলন করিতে পারি নাই।" সংসারের ক্লেশ এবং দুঃখ, নিন্দা ও অপমান, স্নেহ ও ভক্তি যাঁহার হৃদয়কে এরূপ ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তিনি যে উচ্চশ্রেণীর সাধক হইতে পারেন নাই তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

শেষোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে প্রধান শিষ্য সারিপুত্র নিজ গ্রামে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা সারিপুত্রের ভস্মাবশেষ লইয়া বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং বুদ্ধদেব ভিক্ষুগুলীকে সমবেত করিয়া সারিপুত্রের চরিত্র এবং জীবন সম্বন্ধে অতি সুন্দর এবং করুণ উপদেশ দান করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কোমল-হৃদয় আনন্দের মন গভীর দুঃখ এবং বিষাদে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি ক্রমাগত অশ্রুপাতপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় এবং সততসেবানিরত সেবককে এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, "হে আনন্দ, ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার আমি উপদেশ দ্বারা তোমার মনকে এপ্রকার দুঃখ ও শোকের ভাব হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।...এপ্রকার কোনও ঘটনা কি কখনও হইতে পারে যখন আমাদের ক্রন্দন এবং হাহাকার করা প্রয়োজন হইবে?" কথিত আছে যে এইরূপ উপদেশে আনন্দের মন শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু আনন্দের চরিত্রবিষয়ে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এ কথা কতদূর সত্য, তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে।

ক্রমে সিদ্ধার্থের পরিনির্ব্বাণের দিন আসিল। এই পঁচিশ বৎসর কাল আনন্দ রাত্রিদিন যাঁহার সেবা করিয়াছেন, যাঁহার প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় বদন নিরন্তর দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ আনন্দ তাঁহাকে হারাইবেন। যখন আনন্দ বুঝিতে পারিলেন যে সিদ্ধার্থের সময় নিকট হইয়াছে, তখন তিনি আর নিকটে থাকিতে পারিলেন না। গভীর বেদনা গোপন করিবার ইচ্ছায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ মল্লরাজদিগের সভাগৃহে যাইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, "হায়, ভগবান বুদ্ধ আর থাকিবেন না। আমার মুক্তি আর কাহার নিকটে পাইব? আমার উপদেশদাতা আর কে হইবে? আর কাহার জন্য আমি প্রাতে মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিব? আর কাহার পদযুগল মুছাইয়া দিব? কাহার বসিবার জন্য আসন প্রস্তুত করিব? কাহার শয়নের জন্য শয্যা রচনা করিব? কাহার ভিক্ষা পাত্র এবং চীবর ভিক্ষার্থে গমনকালে উপস্থিত করিব?' এইভাবে হাহাকার ও ক্রন্দন করিয়া আনন্দ তাঁহার হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে প্রিয় আনন্দকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া তথাগত তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপার সমস্ত জানিতে পারিয়া আনন্দকে নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিলেন, "হে আনন্দ, তোমার ক্রন্দন এবং হাহাকার বৃথা হইতেছে; শোকে আত্মহারা হইও না, অশ্রু সম্বরণ কর। তোমাকে কি পূর্ব্বে আমি বলি নাই যে, দূরতা এবং মৃত্যু আমাদিগকে অতি প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করে?... তুমি সাধনা করিতে আরম্ভ কর, শীঘ্রই তুমি সংসারের ভার এবং মোহ সকল হইতে মুক্তি লাভ করিবে।' এই বলিয়া শাস্তা সমবেত ভিক্ষুবর্গের নিকট আনন্দের গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন যে আনন্দ একজন প্রকৃত সাধু, এবং অন্যান্য অর্হৎগণ হইতে অধিকতর সুকুমার এবং অমায়িক গুণে মণ্ডিত এইরূপে গুণবর্ণনা করিয়া আনন্দের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে তথাগতের পরিনির্ব্বাণের সময় অতি নিকটবর্ত্তী; কিন্তু আনন্দের ইচ্ছা নহে যে তথাগত কুশিনগরের ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানের নিকটে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন, কারণ তাঁহার আশঙ্কা যে তাহা হইলে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি কুশিনগরের অধিবাসিগণ যথেষ্ট সম্মান-প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বুদ্ধদেব আনন্দের এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি ঐ স্থানই তাঁহার নির্ব্বাণের উপযুক্ত নির্ব্বাচিত করিলেন। শাস্তা সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রির শেষ যামে অশীতিবৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমায় লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর অর্হৎগণের অনুরোধে আনন্দ মল্লরাজগণকে এই শোকসংবাদ দান করেন এবং

তাঁহারা আসিয়া মহাসমারোহে দাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তথাগতের নির্ব্বাণের কিছুকাল পরেই তাঁহার শিষ্য কাশ্যপ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র গুলি স্থির করিয়া লইবার জন্য একটী মহাসঙ্ঘ সম্মিলিত করিবার প্রস্তাব করেন; এই সঙ্ঘে পাঁচশত প্রধান অর্হৎ মিলিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণালীবদ্ধ করিবেন এই স্থির হয়। এই সঙ্ঘের সকলেই অর্হৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্‌ব্যতীত একমাত্র আনন্দকে ঐ সঙ্ঘে লওয়া হইয়াছিল; কারণ তিনি অর্হৎ না হইলেও শাস্তার নিকট ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং শাস্তা কখন কাহাকে কি বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদিত ছিল। যাহা হউক রাজগৃহে সঙ্ঘের অধিবেশন হইবে স্থির হওয়াতে তাহার প্রস্তুতির জন্য অর্হৎগণ চল্লিশ দিন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আনন্দ এই চল্লিশ দিন অন্য কোনও কার্য্যে ব্যয়িত না করিয়া বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ শোক প্রকাশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় এবং পূজ্য ধর্ম্মগুরু যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শোকাকুলচিত্তে আনন্দ সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বিশেষতঃ জেতবন বিহারেই আনন্দ অধিক সময় যাপন করিলেন। সিদ্ধার্থের সেবার জন্য যখন যে স্থানে তিনি যে কার্য্য করিতেন, এখনও অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই সকল কার্য্য করিতে থাকিলেন। তিনি গৃহ মার্জ্জিত করিতেন, শয্যারচনা করিতেন, এবং পাদধৌত করিবার জলও আনিয়া রাখিতেন। যেন বুদ্ধদেব এখনও দেহে বর্ত্তমান আছেন। প্রেমপূর্ণ গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি এই বলিতেন, "এই স্থানেই তো শাস্তা আসন গ্রহণ করিতেন, এই শয্যাতে তিনি শয়ন করিতেন, এই বারান্দায় তিনি পদচারণা করিতেন, এই স্থানে স্নান করিতেন;" এই বলিয়া প্রতিস্থানে যাইয়া তিনি কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইতেন এবং অবিরত অশ্রুপাত করিতে থাকিতেন। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে স্থানীয় অধিবাসিগণ ক্রন্দন করিতে করিতে এই সকল কার্য্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিত। এইরূপে শোক প্রকাশ করিয়া আনন্দ যথাসময়ে রাজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সেস্থানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আনন্দ অর্হৎ না হইয়াও ঐ মহাসঙ্ঘে অর্হৎদিগের সহিত আসন কেন পাইবেন, কেহ কেহ এই আপত্তি করিল। ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দ অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ অনুভব করিলেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই অর্হৎ হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এখন তাঁহার অর্হৎ হওয়া কিছু কঠিন ছিল না, কারণ তিনি এ পৃথিবীতে যাঁহাকে প্রিয় এবং প্রাণাপেক্ষা নিকট মনে করিতেন সেই তথাগত আর নাই; তাঁহার ভববন্ধন মোচিত হইয়াছে। এ সংসারে তাঁহার অভিলষণীয় আর কিছু নাই, সুতরাং তিনি এক নির্জ্জন এবং নিস্তব্ধ স্থানে যাইয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন; এস্থানে তাঁহার অর্হৎ

ছুইবার পক্ষে আর কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না। সমস্ত রাত্রি ধ্যান এবং সাধনার পর প্রত্যুষসময়ে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইল, তিনি অর্হৎ হইলেন এবং পৃথিবীর মোহ এবং মায়ার বন্ধন হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইলেন।

এদিকে পরদিবস মহাসঙ্ঘ সম্মিলিত; পাঁচশত অর্হৎগণের মধ্যে সকলেই আসন গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল আনন্দের আসন শূন্য। হঠাৎ আনন্দ আসিয়া দেখা দিলেন এবং তাঁহার সুন্দর বদনকমলের অদ্ভুত মুখশ্রী এবং স্থিরজ্যোতি দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে আনন্দ এখন আসন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তিনি অর্হৎ হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কাশ্যপ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাধক উপালি বিনয় পিটক ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিবৃত করিলেন এবং সভা তাহা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আনন্দ সূত্র-পিটক অর্থাৎ উপদেশাবলী ইত্যাদি সভার নিকট বিবৃত করিলেন এবং সভা সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিধর্ম্ম নামক তৃতীয় বিভাগ সভার নিকট বিবৃত করিলেন। প্রায় সাত মাস ক্রমাগত সভার কার্য্য হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

আনন্দের জীবনের শেষ সময়ের ঘটনার বিষয় পরিষ্কার কিছু বলা কঠিন, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে তিনি ভক্তি ও প্রেম সহকারে তাঁহার হৃদয়-দেবতা তথাগতের স্মৃতি শেষপর্য্যন্ত পূজা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের কঠিন সাধনা এবং নীরস জীবনের মাহাত্ম্য আমরা না বুঝিতে পারি; কিন্তু যে হৃদয় স্বাভাবিক কোমলতাহেতু এই দুরন্ত সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে নাই, এই সকল শুষ্কহৃদয় ভিক্ষুদিগের সঙ্গলাভ করিয়াও হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে সরস রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই মহান্ হৃদয় এবং সুন্দর চরিত্রকে আমরা সম্মান ও ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারি না; সেই জন্যই আনন্দের চরিত্র আমাদিগের নিকট সুমধুর।

নারী জীবনের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য লইয়া মানব সমাজ চলিতেছে। সকলেই কোন না কোন লক্ষ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনপথে অগ্রসর হইতেছে। সভ্য অসভ্য, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ ও দেশভেদে উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার। নারী জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেহ বলিবেন জগতের সেবাই নারী জীবনের উদ্দেশ্য; আর কেহ হয়ত বলিবেন আদর্শ মাতৃজীবন প্রাপ্তিই নারী জীবনের উদ্দেশ্য। আমি দুইজনের বাক্যই শিরোধার্য্য করিলাম। কারণ সেবাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেবা অতি উচ্চ ধর্ম্ম। প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ জাতিও অক্লান্তভাবে স্বজাতি ও স্বদেশের সেবা করিতেছেন। সেবা দাসত্ব নহে। প্রেম সেবার মূল। নারী প্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া লোকের সেবা করিবেন এবং দুর্গম সংসার পথে সকলের পক্ষে

আলোকস্বরূপিণী হইবেন। সামাজিক হীনতা হইতে দাসত্বের উৎপত্তি। নারী জাতি জ্ঞান এবং প্রেমদ্বারা সমাজে আত্ম-সম্মানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই তাহার সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে নারী জাতির যে এত দুর-বস্থা, আত্মসম্মানের অভাব তাহার মূল কারণ। গৃহকর্ম্ম অতি পবিত্র এবং নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তজ্জন্য আপনাকে **কেবল গৃহমধ্যে** আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য **নহে। লোকহিতৈষণা ব্রত তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি বৃদ্ধির জন্য সাধনা নারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাই লোক শিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। কোন মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া, যদি আপনি অশিক্ষিতা** নারী-সমাজ হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে নারীর উন্নতির আশা কোথায়? মরু-ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় উহা নিষ্ফল নহে কি? সেবা নারী জীবনের ধর্ম্ম— পরিবারের সেবা, স্বজাতির সেবা এবং স্বদেশের সেবা। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহাপুরুষ আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে উৎ-সাহিত করিতেছেন, তাঁহারাও সেবা ব্রতে ব্রতী। কেহ জ্ঞানদ্বারা, কেহ শরীরদ্বারা, কেহবা অন্যান্য বিষয় দ্বারা মানবের সেবা করিতেছেন। যে সকল মহাপুরুষ পৃথিবী পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সেবা-ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের মহো-পকার সাধন করিয়াছেন, তাহাকে সেবা ভিন্ন আর কি বলিব? সেবাব্রত কেহ যেন হেয় মনে না করেন। মানবকে প্রীতি করিলে ঈশ্বরকেই প্রীতি করা হয়; কারণ মানব তাঁহারই সন্তান। লোক-সেবা ও প্রীতি নরনারীকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর করে।

ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে সেবা নারী জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। যদি এই সত্য ভারতের প্রত্যেক নারী-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে কত মেরী কার্পেণ্টার—কত সংঘমিত্রা ভারত বক্ষে অভ্যুদিতা হইয়া স্বদেশের দুঃখ দূর করিতে পারেন। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে **মহারাজ অশোকের প্রিয়তমা কন্যা সঙ্ঘ-মিত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, সহচরী বৃন্দ-সহ সিংহলে গমন করিয়া, রাজান্তঃপুর-বাসিনীদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।**

হিন্দুজাতি বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার কয়েকটি শ্লোক বিশ্ববারানাম্নী মহিলা রচিত। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, অতি দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাজ্ঞ-বল্ক্য ঋষিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নারীর শিক্ষা ও আধুনিক নহে, নারী জগতের সেবাও আধুনিক নহে এবং নারীর ব্রহ্ম-জ্ঞানও আধুনিক নহে। ভারতের নারী-বৃন্দ, আত্ম বিসর্জ্জনে, আত্মদানে চিরদিনই অভ্যস্ত। ভারতের সেবাপরায়ণা মহিলা-গণ স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সংসারের জন্য ও পরের জন্য অম্লানবদনে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আধুনিক সময়ে ভারতাকাশে **অনেক লীলাবতী, খণা প্রভৃতি বালসূর্য্য উদিত হইয়া আপনার জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে-ছেন। কিন্তু মাধ্যাহ্নিক জ্যোতিঃ বিস্তার**

করিতে অনেক বিলম্ব আছে। কবি বলিয়াছেন, "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" মানবজাতি চির উন্নতিশীল। এ জগতে কেহই চিরদিনের জন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতে আসে নাই। জগদীশ্বর সকলকেই এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি অসভ্য যে আমেরিকার নিগ্রোজাতি, তাহারাও এখন স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতেছে। তাহারাও সুশিক্ষা দ্বারা আপনাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছে। তবে কি শুধুই ভারতীয়া নারীবৃন্দ এই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে? না। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গীয় আলোক দ্বারা ভারতীয়া নারী জাতির অজ্ঞানান্ধকার, মোহান্ধকার দূর করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ আদর্শ মাতৃজীবনের বিষয়। সন্তান মাতার নিকট যত শিক্ষালাভ করে, বোধ হয়, তত পিতা কিংবা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করে না। পুরাকালে ভারতবর্ষে শক্তিস্বরূপিণী মাতৃজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইত। কিন্তু আধুনিক সময়ে ভারতবক্ষ হইতে নারীজাতির সে মর্য্যাদা দূরীভূত হইলেও ধনসম্পদ বিধায়িনী লক্ষ্মী, দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গা ও জ্ঞানদায়িনী বাক্‌দেবী নারীরূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। অনেকে বলেন, শাস্ত্রকারগণ প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষজাতি ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা এইরূপ নারীর প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা না করিলে পদে পদে ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। ভারতের আজ যে শোচনীয় দুরবস্থা, তাহা মাতা ভগিনী কন্যারূপিণী নারীর অবমাননার ফল। তাই বুঝি প্রথমেই কবির হৃদয়ে নারীর ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার কথা মনে হইয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন, "তোরা না করিলে এ মহা সাধনা; এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

কবির সঙ্গীত অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যদি কোন দিন ভারত জ্ঞান ও ধর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে নারীর উপযুক্ত সুশিক্ষা তাহার অন্যতম মূল কারণ হইবে। মাতা যদি সুশিক্ষিতা না হন, তাহা হইলে সন্তান সুশিক্ষিত হইবার আশা কোথায়? পুত্র যেখানে সমিতির আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, মাতা সেখানে সাংসারিক সুখসম্পদের আলোচনা করিতেছেন; ইহা কি প্রকার বিসদৃশ, তাহা প্রিয় পাঠিকা ভগ্নীগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। মাতা সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা ও সুসংযতমনা হইলে, সন্তান নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। মহাশক্তির অংশরূপিণী মাতাকে অশিক্ষিতা রাখিয়া সুশিক্ষিত সন্তানলাভের আশা নির্ব্বাপিত করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য কবি বলেন—

সতীগর্ভে সাধুসুত, এই জগতের রীত
রসালে কি হীন ফল ফলে?

আমরা পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষের কল্যাণে ধর্ম্মজগতে এবং সংসারে নানা বিষয়ে সুশিক্ষালাভ করিতেছি এবং যাঁহাদের আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি; তাঁহাদের জননীগণও নানাগুণের অধিকারিণী ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে ভারতীয়া নারীদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, গভর্মেণ্ট যদি ভারতীয় নারীদিগকে শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষা কার্য্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে সন্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না; গৃহ জ্ঞান এবং সুখের আধার হইবে না।

জগতে সকল পদার্থই ধ্বংসশীল; কিন্তু মহাজনদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম চিরস্থায়ী। শিপ্রাতটশোভিনী উজ্জয়িনী নগরী এখন লুপ্তপ্রায়, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাব্যসুধা এখন জ্ঞানীদিগের জ্ঞানসুধা চরিতার্থ করিতেছে। এই মরণশীল জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ। আমি ভগবানের পরমপদে ভারতীয়া ভগিনীদিগের জন্য প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা জ্ঞান এবং ধর্ম্মবলে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয়া হইতে পারেন।

শ্রীভক্তিসুধা দেবী।

প্রার্থনা।

আমার সাধনা-আশা-জীবন-মরণ
চরণ-সরোজ তব করিয়া চুম্বন
গুঞ্জরিছে নিশিদিন, প্রাণের সঙ্গীত
ফুল্ল শতদলে ঘেরি যেমতি ঝঙ্কৃত
হয় মুগ্ধ মধুপের অন্তর ভেদিয়া
জানাতে সে তৃষ্ণাতুর মাগিছে অমিয়া
অমিয়া-হৃদয়া পাশে! হে মোর দেবতা,
জুড়াও মর্ম্মের মোর তীব্র ব্যাকুলতা।
আমারে নীরব কর, করিয়া মগন
ওই চারু কোকনদে—নিভৃত গোপন
সুধা-পারাবার মাঝ! স্তব্ধ হয়ে শুধু
জন্মে জন্মে অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষিত মধু
আনন্দে করিব পান—হেরিব তোমায়
কেবলি আমার হয়ে বিরাজ ধরায়!

আয়োজন।

কখন আসিবে শিশু—আজ আয়োজন!
দীন হীন পিতামাতা
শেলাই করিছে কাঁথা
একটুকু অবসর পেতেছে যখন!
ছোট সে কুটীর খানি
কত মতে নাহি জানি
দিবানিশি অবিরত সাজাইতে চায়!
যেন কিছু মলিনতা
এক তিল অশুচিতা
আজিকে রহিতে কোথা নাহি দিবে হায়!
কোন্ দেবতার সাড়া
বুঝিবা পেয়েছে তারা
বিভল পাগল তাই তা'রি পানে চেয়ে!

সুখ ভরা চরাচর
আজি যেন মধুতর
অভিনব মনোহর তা'রি খোঁজ পেয়ে!
কি চোখে যে দু'জনায়
আজি দোঁহে নেহরায়
তাহারা বুঝেনা নিজে শুধু হাসি ফুটে!
ধন-জন-মান-হারা
পেল কি হরষ ধারা
কোন্ সে অমরা হতে এল সুধা লুটে!
আমি বুঝিয়াছি ওরে,
গায় পাখী নিশি-ভোরে
স্বরগের পারিজাত মাধুরী বিকায়!
মাধবী চাঁদের কণা
জীবনের আরাধনা
প্রণয়ের শিশুরূপ উদিবে ধরায়!
সে যে সব ব্যথা হরি'
দিবে দোঁহে এক করি'
দিনের আঁধার ঘরে বিকায়ে কিরণ!
যুগল হৃদয় করে তা'রি আয়োজন!

"সাধনাকুঞ্জ" চট্টগ্রাম। } শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত!

রন্ধন, আহার এবং গৃহস্থালী।

গতবারে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা সাধারণতঃ রন্ধনের জন্য যে সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টতর খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তম খাদ্য বলিতে স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য বুঝিতে হইবে। পুরমহিলাদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাঁহাদের রন্ধনগৃহে অবস্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাদ্বারা যেন কেহ এমন না বুঝেন যে রমণীদিগকে আমি রন্ধনশালা হইতে একেবারেই বিদায় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতেছি। সুস্থদেহ রমণী স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন এবং অভ্যাগতদের আহার্য্য প্রস্তুতের ভার পাচক ব্রাহ্মণের প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। আমি ইহাই বলিতে চাই যে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা শুধু রন্ধনগৃহে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না।

সন্তান পালন, শিশুদের শরীর সুস্থ রাখিবার উপায়, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা রমণীদিগের একান্তই আবশ্যক। এসকল বিষয়ে যাঁহারা পূর্ব্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত উহা শিক্ষা করিতে হইবে। শিশুদিগকে কুখাদ্য প্রভৃতি প্রদানের ন্যায়, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান সম্বন্ধেও প্রায়শঃ আমরা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়া থাকি। শিশুচরিত্রে অনভিজ্ঞ, অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের হস্তেই সচরাচর শিশুদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার বলে প্রকৃতিরাজ্য হইতে জ্ঞানরাজি সংগ্রহ করিয়া কোমল শিশু হৃদয়ের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায়, ইঁহাদের অনেকেরই তাহা নাই! দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিশুদের শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করা তাঁহাদের

সময়ের অপব্যবহার বা শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করেন। রমণীগণ শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। যতদিন তাহা সম্ভব না হইবে তত দিন জননীগণকে এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত রমণী স্বামী পুত্রের জন্য অম্লানবদনে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ সন্তানের জন্য শিক্ষালাভে যত্নবতী হইবেন, ইহা কি একান্তই দুরাশা? এতদ্ভিন্ন স্বামীকে পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি দিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা উচিত। গৃহ প্রাঙ্গণে শাক সবজীর বাগান করিলে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং সাংসারিক ব্যয়ের তালিকা অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। তাছাড়া আফিসের কর্ম্মভারক্লিষ্ট স্বামীকে বাজার খরচ, ধোপার হিসাব প্রভৃতি রাখা হইতে মুক্তি দিলে, আফিসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরও তাহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার আনন্দলাভ করা যায়। রন্ধন করিয়াই সময় পাই না এ ওজর করিয়া কোন রমণীই এই সকল কর্ত্তব্য হইতে দূরে থাকিতে পারেন না।

আমার মনে হইতেছে, অনেকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে খুব বড় বড় কথা, পরকে উপদেশ দেওয়া এমনই সোজা বটে।" তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপরে যাহা লেখা হইল আমি স্বয়ং তাহা যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া থাকি। বাল্য-বিবাহ রহিত হইলে বঙ্গনারী শিক্ষালাভের অনেকটা সময় পান সত্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ দ্বারাই বাল্য বিবাহ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, সুতরাং বিবাহিত জীবনেই আমাদিগকে শিক্ষালাভের দ্বারা জীবনের উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইতে হইবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, কোন প্রতিকূল অবস্থাই সাধু ইচ্ছার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।

সময়ের মূল্য বুঝিলে, এবং মূল্যবান্ সময় বৃথা ব্যয়িত হইতে দিব না, এরূপ সঙ্কল্প থাকিলে আমাদের কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই সময়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না। সময় সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যখনই আমি কাহারও সহিত আমাদের নারীজীবনের উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তখনই বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে বলিতে শুনিয়াছি—"আর কোন ছেলেপিলের সংসার—ওদের খাওয়ান পরান, এখন কি আর কোন কথা ভাববার সময় আছে? তোমাদের কাঁচা বয়স, যা হয় একটা তোমরাই কর।" আবার যাঁহাদের কাঁচা বয়স তাঁহারা তো নারীরূপিণী জড়পিণ্ড বিশেষ, চালাইলে চলেন, না চালাইলে থামিয়া থাকেন, থামিয়াই থাকেন। রাঁধা বাড়া, এবং পরিবেশন প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহাদের প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত্রির কতক ভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে। দৈনিক আহার্য্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন প্রভৃতির

জন্য প্রত্যহ চারিঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু আমি অনেককেই এজন্য আট নয় ঘণ্টা ব্যয় করিতে দেখিয়া থাকি।

শৃঙ্খলার অভাবই সময়ের এইরূপ অপব্যবহারের একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হয় না, তাহাতে অনেক সময়ে অসুবিধার একশেষ হয়। রান্না করিতে গিয়াছেন, উনুনে কড়াই চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, শিশিতে তেল নাই, তখন তাড়াতাড়ি সাত বৎসরের মেয়েকে বলা হইল, “মা, যা তো হাঁড়ি থেকে এক শিশি তেল শিগ্‌গির ক'রে ভ'রে নিয়ে আয়।” মেয়ে দৌড়িয়া গেল, আর আসে না। “ও হতভাগি! ও পোড়ার মুখি! শিগ্‌গির আয়, হতভাগা মেয়ের তেল ভরবার যোগ্যতাটুকু হলোনা—পারেন কেবল খেতে।” এদিকে মেয়ে তেল ফেলিয়া, শিশি ভাঙ্গিয়া প্রহারের ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মা আসিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন; চড়, গাল টিপিয়া দেওয়া প্রভৃতি জননীসুলভ প্রহার এবং গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। নিজে যে ভুল করিয়াছেন তজ্জন্য নিরপরাধ শিশুকে শাস্তি দিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই যে কেবল সময়ের মূল্য বোঝে না, এমন নহে পুরুষদের মধ্যেও অনেকে সময়ের মূল্য বোঝেন না। ইংরেজ এরূপ জড়তার ধার ধারেন না, তাই যাঁহারা আফিসে কাজ করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই কার্য্যস্থলে ঠিক সময়ে যাইতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকেই প্রাতঃসময়টা বৃথা গল্পগুজবে কাটাইয়া আহারের সময় কোনওরূপে নাকে মুখে গুঁজিয়া আহার কার্য্য সম্পাদন করেন, আর “আমার জামাটা কোথায় গেলরে? আমার চিরুণীখানা খুঁজে পাচ্ছিনা” প্রভৃতি রবে বাড়ীর সকলকে অস্থির করিয়া তোলেন। যাহা হউক এইরূপে কর্ত্তাকে বিদায় করিয়াই যে পাচিকা বধূ রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবেন তাহা নহে, যাঁহাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই তাঁহাদের লইয়া আরও বিপদ। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, এবং সকল বিষয়েই একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত, এ জ্ঞান অনেকেরই নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে যদি এক সঙ্গে আহার করিতে বসেন, তবে সে দৃশ্য দেখিতেও অতি সুন্দর, সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিবার পক্ষে, তাহা অতি উত্তম অবসর, পাচিকার পক্ষেও তাহা খুব সুবিধাজনক। কিন্তু এরূপ সুশৃঙ্খলা এবং নিয়মপরতন্ত্রতা অধিকাংশ পরিবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদিদি রান্না করিয়া ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছেন, ঠাকুরপোর খোঁজ খবর নাই, অনেকক্ষণ পরে তিনি আসিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্নানই হয় নাই। যাহা হউক তাঁহাকে কোনওরূপে খাওয়াইয়া দিবার পর, আবার শিশুদের পালা উপস্থিত হইল। এইরূপে যাঁহার রন্ধনের পালা

থাকে তিনি প্রায় বেলা দুইটার আগে মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যাপার শেষ করিয়া রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন না। এবং যে রমণী পরিবারবর্গের এবম্বিধ খেয়ালের অনুবর্ত্তিনী হইতে কোনওরূপ ক্লেশ অনুভব করেন না, তিনিই আদর্শ কুলবধূরূপে বাচ্যা হন। ইহার অর্থ এই যে নারীশক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা এত ক্ষুদ্র যে, রন্ধন ভিন্ন স্ত্রীজাতি যেন আর কোন কাজেরই উপযুক্ত নহেন।

জিনিষ পত্র যথাস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া না রাখাতে অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং অনেক জিনিষ একেবারেই হারাইয়া যায়। অনেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র যত্নের সহিত রাখিয়া দেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় রাখিয়াছেন তাহা মনে থাকে না। এইজন্য রন্ধন সামগ্রী, শেলাইয়ের উপাদান, পুস্তক, কাপড় প্রভৃতি সকল জিনিষই প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ স্থানে রাখিয়া দিবার অভ্যাস করিবেন। প্রয়োজন মত উঠাইয়া লইয়া আবার কাজ শেষ হইলেই পুনরায় উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন। কিন্তু একজনে এরূপ করিলে কোন লাভ নাই, পরিবারস্থ সকলেরই এরূপ একটা সঙ্কল্প থাকা আবশ্যক যে তাঁহারা যেখানকার জিনিষ সেইখানে রাখিবেন। বালকবালিকারা পড়িবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য জায়গায় বই লইয়া বসিল, তারপর কোন তামাসা দেখিবার জন্য বা কেহ ডাকিলে সেই খানেই রাখিয়া চলিয়া গেল, জনক জননী কদাচ এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় দিবেন না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পিতামাতা সন্তানদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন তাঁহারা স্বয়ং তদনুসারে চলিলে মৌখিক উপদেশ বেশী না দিলেও ক্ষতি হয় না, কিন্তু নিজেরা অন্যরূপ আচরণ করিলে সহস্র উপদেশ বা শাসনেও কোন ফল হয় না। গৃহসজ্জার উপকরণগুলির যেটী যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা শুধু সেই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করা উচিত। চব্বিশ ঘণ্টা শয্যা পাতা থাকিবে, আর সময় নাই, অসময় নাই, তাহার উপর শুইয়া পড়ার অভ্যাস ভাল নহে। ইহাতে বিছানা শীঘ্র শীঘ্র ময়লা হয়, এবং শ্রীভ্রষ্ট হয়। আফিসের কাজে রাশি রাশি কাগজ নাড়া চাড়া করিতে হয়, ঐ সকল কাগজ যদি ইতস্ততঃ থাকে, একজন কর্ম্মচারী যদি একখানি কাগজ হাতে করিয়া তাঁহার বন্ধুর সহিত স্থানান্তরে গল্প করিতে করিতে সেই খানেই তাহা ফেলিয়া আসেন, তবে তাঁহাকে কত মুস্কিলে পড়িতে হয়। আপন বাসগৃহকেও একখানি আফিস গৃহ মনে করিতে হইবে। এখানেও শিশুদের বোর্ডিং হাউস, বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। গৃহিণীকে এই আফিসের বড় কর্ত্রী বলা যাইতে পারে, গৃহের সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খলার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তাঁহার এমন শক্তি থাকা আবশ্যক যে তিনি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন। তিনি সকল বিষয়ে পরিবারে সকলের আদর্শস্থানীয়া হইবেন। তিনি

স্বয়ং খুব বিনীতা, মিষ্টভাষিণী এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী হইবেন। শিক্ষা এবং সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকিবে, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করিবেন. যদি তিনি এই সকল গুণবিশিষ্ট হন তবে সকলেরই হৃদয়ের উপর তাঁহার এমন একটী প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, যে কেহই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইবে না; অথচ প্রত্যেকেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত দেখিবেন। কিন্তু এরূপ আদর্শ গৃহিণী শুধু উপদেশ শুনিয়াই হওয়া যায় না, ইহার জন্য আশৈশব শিক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং বালিকাদিগকে শিশুকাল হইতেই এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিণী এবং সুজননী হইতে পারে।

আজকাল অর্থাভাবের অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মাসিক দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারাও বলেন অভাব এবং অসচ্ছলতার মধ্যে আছেন; পঞ্চাশ ষাট টাকা বেতনভোগী চাকরীজীবীদের অবস্থা তাহা হইলে কত শোচনীয়! অবশ্য জিনিষ পত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ অভাব অনটন ভোগ করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আহার বিহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা অনাবশ্যক বাহ্যিক আড়ম্বরের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের এই বিলাসিতার ভাবকেই বর্ত্তমান অর্থকষ্টের একটা প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিরূপে অল্প আয়ে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালান যাইতে পারে আমরা ক্রমশঃ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।
(ভারতমহিলা।)

রেভারেণ্ড চার্লস ভয়েসি।

গত ২২শে জুলাই রয়টারের টেলিগ্রামে জানাগেল লণ্ডন একেশ্বরবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা চার্লস ভয়েসী সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম্মের এক মহা যুগপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছে। বিধাতা মনুষ্যজাতিকে শাস্ত্রবন্ধন, সম্প্রদায়বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া আপনার দিকে, স্বর্গরাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তিবাদ, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, পাপ মোহ বিমুক্ত হইয়া মানুষ স্বাধীন ও প্রমুক্তভাবে, সাক্ষাদ্‌ভাবে যাহাতে পরমেশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে বিধাতা পৃথিবীর সকল দেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে তাহার উপায় সূচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে চার্লস ভয়েসী সাহেবের সহযোগে একেশ্বরবাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ লণ্ডননগরে ভয়েসী সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করেন। খৃষ্টীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের

শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল নানা স্থানের ভজনালয়ে পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। একদা তিনি অনন্ত নরকের বিরুদ্ধে উপদেশ দান করেন; তাহাতে কতিপয় গোঁড়া খৃষ্টান অসন্তুষ্ট হন এবং ইয়র্কের প্রধান ধর্ম্মযাজকসহযোগে ভয়েসী সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমায় তিনি হারিয়া যান ও মোকদ্দমার খরচ দিতে বাধ্য হন। যদিও গোঁড়া খৃষ্টান সমাজ কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইলেন, অন্যদিকে উদার মতাবলম্বী লোকদের যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতে লাগিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমাদের আচার্য্যদেব ইংলণ্ডে গমন করেন। তাহার অল্পদিন পরেই ভয়েসী সাহেব খৃষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৯২ শকের ১৬ই চৈত্র ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছিল—"ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড চার্লস ভয়েসী নামক একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কতিপয় উদার মত স্বাধীনতার সহিত প্রচার করাতে কয়েকজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের বিচারে তাঁহাকে মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। রেভারেণ্ড ভয়েসী বলেন, পাপের জন্য অকৃত্রিম দুঃখই মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের সম্মিলন পক্ষে যথেষ্ট, অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধি আবশ্যক করে না। ঈশ্বর আমাদের পিতা, এবং আমরা তাঁহার সন্তান, এই সত্য সমস্ত মধ্যাং এবং তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকে দূরীকৃত করে। খৃষ্টকে উপাসনা করা পৌত্তলিকতা। ঈশ্বরবিষয়ে জ্ঞান দান করিতে কোন পুস্তক উপায় হওয়া অসম্ভব। মনুষ্যহৃদয়ে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশিত হয়। খৃষ্টান সমাজে স্পষ্টরূপে স্বাধীন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাতে তাঁহাকে তাড়িত হইতে হইল। তাঁহার উক্তমত প্রত্যাহরণ করিয়া লইবার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে আপনার সরল মত গোপন করিলেন না। এ প্রকার সাহসী বীরপ্রকৃতি একটী লোকের সে দেশে এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।"

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দর্শনে তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি এতদূর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে, ঈশাকে এক জন সাধুপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। ব্রাহ্মগণ যে ঈশার প্রতি ভক্তিমান, ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ভয়েসী সাহেব ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদের সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটি উপদেশ লিখিতেন, উহা মুদ্রিত করিয়া পাঠ ও বিতরণ করিতেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৮৪ বৎসর হইয়াছিল, এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের সিন্ধুদেশবাসী ব্রাহ্মবন্ধু স্বর্গগত নেভাল রাও ও হিরানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ মতিরাম ভয়েসী সাহেবের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু উক্ত বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মতিরাম ব্যারেষ্টারী করিতেন, এক্ষণে সিন্ধুদেশে জজের কর্ম্ম করেন; ভয়েসি সাহেবের চারি পুত্র ও চারি কন্যা। ভগবান পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন এবং তাঁহার শোকাকুল সন্তানবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

ভয়েসি সাহেবের অভাবে ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদী সমাজের কার্য্য কিরূপ চলিবে আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

(ধর্ম্মতত্ত্ব)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা নিশ্চয় জানি, জাপানদেশ দূর হইলেও বঙ্গদেশের পুরুষ নারী সকলের নিকট জাপান সুপরিচিত। গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে জাপান সকলের প্রিয় ও আদরের দেশ হইয়াছে। এখন জাপানের উন্নতিতে ও সুখে ভারতবাসী সুখী ও জাপানের দুঃখে সকলে দুঃখী। জাপানের সম্রাট মতসুহিতুর মৃত্যুর সংবাদ ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ—আজ জাপানবাসীদিগের শোকে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ সহানুভূতি করিতেছেন, বঙ্গদেশের নরনারীও আজ জাপানের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ সমবেদনা প্রকাশ করা অনেক সময়ে একটি বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র হইয়া থাকে। কোন বড়লোকের মৃত্যু হইলেই সভা করিয়া শোক-প্রকাশ করা একটা ভদ্রতার নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যে মিকাডো সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিলেন তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ করা একটি প্রাণের আবেগের ব্যাপার। পৃথিবীতে কত রাজা রাজ্যশাসন করিয়া মরিয়াছেন ও মরিবেন, কিন্তু সম্রাট মতসুহিতুর মত সম্রাট ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মতসুহিতু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। গত ২৯শে জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র সম্রাটকুমার যোশীহিতু পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।

সম্রাট মতসুহিতুর রাজ্যের প্রারম্ভে জাপান সমস্ত পৃথিবীর সভ্যজগতে একরূপ অপরিচিত ছিল। এরূপ অল্পসময়ে পৃথিবীর উন্নত জাতিসকলের সহযোগী ও সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, তাহা কেহ মনে করিতে পারে নাই। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে যিনি প্রাচীনকালের প্রথা অনুসারে সাধারণের দৃষ্টির অতীত কাল্পনিক অমানুষিক শক্তি ও গুণে শোভিত ভয় ও মান্যের বস্তুমাত্র ছিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে তিনি প্রজাতন্ত্র নিয়মে শাসিত একটি উন্নত জাতির সর্ব্বজনপ্রিয় রাজারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে যতকিছু উন্নতির স্রোত পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে, জাপান সে সমস্তের উপযুক্ত পরিমাণ অংশ লাভ করিতেছে। ভগবানের বিধানে যেমন সম্রাট উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনই তাঁহার চারি-

দিকে অনেকগুলি মহদ্ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই অল্পকাল মধ্যে জাপান দেশকে বর্ত্তমান কালের প্রবলপ্রতাপ জাতি সকলের মধ্যে এক উচ্চস্থান দান করিয়াছেন।

আমরা "ভারত মহিলা" হইতে "রন্ধন, আহার এবং গৃহস্থালী" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 'মহিলার' পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। ইহাতে গৃহিণীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে কয়েকটি অতি সুন্দর কাজের কথা ও পরামর্শ আছে। শিক্ষিতা মহিলাগণের গৃহে সকল বিষয় সুব্যবস্থা হইবে, সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে, ইহা কে না আশা করে? শিক্ষার ফল যদি গৃহে না দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয় তাঁহাদের শিক্ষা কেবল পুস্তকগত, কোন কার্য্যকর হয় নাই। নারীগণ চিরদিন গৃহকার্য্য করিয়াছেন এবং করিবেন, ইহার মধ্যে যাঁহারা যত অল্পসময়ে যত উত্তমরূপে আপনাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপন করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে সময় ব্যয় করিতে পারিবেন, এবং প্রতিবেশীর সাহায্য করিতে পারিবেন ততই তাঁহাকে সফল ও সুদক্ষ গৃহকর্ত্রী বলা যাইবে। আমাদিগের গৃহকার্য্যগুলিকে এখন নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং নূতন আলোকে পরিচালিত হইয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে। গৃহের ভিতরে যদি সংস্কার না হয়, তাহা হইলে পরিবারের ও সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? যে সকল গৃহিণী আপনাদিগের দৈনিক জীবনের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাব ও চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রস্তাব ও কার্য্য সকল আমরা প্রকাশ করিয়া সকল পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিব।

আজকালকার স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ মাছির অনিষ্টকারিতা বিষয়ে দিন দিন অনেক কথা আমাদিগকে জানাইতেছেন। মাছি যে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অনিষ্টকর জীব, এবিষয়ে আমাদিগের একটা স্বাভাবিক সংস্কার থাকিলেও আমরা এবিষয়ে অধিক কিছু জানি না ও মাছি নিবারণের কোন চেষ্টাও আমাদের মধ্যে নাই। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, আমেরিকাতে ওএর নামক নগরে মাছির উচ্ছেদসাধনে বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বোষ্টন নগরের এক মহিলাসমিতিও মাছি বিনাশের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা সাধারণকে এই ভাবে অনুরোধ করিতেছেন:—

ঐ মাছিটা মারুন।

—কেন?

কারণ—

(১) মাছি যত প্রকার ময়লা ও পচা জিনিষে জন্মায়।

(২) মাছি টাইফয়েড জ্বর, যক্ষ্মা, উদরাময় প্রভৃতি বিবিধ ভয়ানক রোগের ময়লার উপর বসে ও চলে।

(৩) একটা মাছি আমাদের খাদ্য সামগ্রীর উপর ষাটলক্ষ রোগ-বীজ সংযুক্ত করিতে পারে।

(৪) একটা মাছি এক গ্রীষ্মকালের মধ্যে ১৯৫, ৩১২, ৫০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাছির উৎপত্তি করিতে পারে।

(৫) মাছি স্বাস্থ্যের শত্রু—আমাদিগের সন্তানগণের—সমস্ত সমাজের শত্রু।

আটদিনের কম মাছিদের ডিম পরিপক্ক হইয়া নূতন মাছির জন্ম হয় না। যদি আমরা সমস্ত ময়লা প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে উত্তমরূপে পরিষ্কার করি, যদি সমস্ত ময়লা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখি তাহা হইলে মাছি জন্মিতেই পারে না।

এই অত্যাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আপনি কি সাহায্য করিবেন না ?

এখন মহিলার পাঠিকাদিগের নিকট নিবেদন—তাঁহারা কি এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাছির ভয়ানক অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া মাছি নিবারণের চেষ্টা করিবেন না ?

বঙ্গাধিপ লর্ড কার্মাইকেল সস্ত্রীক বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা পরিদর্শন করিতেছেন, দেশের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেছেন ; নানা স্থানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়ে আপ্যায়িত করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হইতেছেন. লর্ডপত্নী পুরললনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া মহিলাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করিতেছেন। আমাদের চট্টগ্রামস্থ কোনও বন্ধু লিখিয়াছেন, "গত কয়েকদিন লাটসাহেবকে লইয়া এখানে খুব ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সৌজন্যে সকলেই প্রীত হইয়াছেন। গবর্ণর পত্নী নিম্নলিখিত কয়েকটী মহিলাকে সায়ংকালে তাঁহার সঙ্গে চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। টেবিলে কেক বিস্কুট ইত্যাদি সজ্জিত ছিল, অতিথিগণ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন, এবং প্রায় একঘণ্টা কাল তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিলেন। গবর্ণর মহোদয়ও পরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান ও জলযোগ করিয়াছিলেন। মহিলাগণ তাঁহাদের ব্যবহারে যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছেন। উপস্থিত মহিলাদের নাম—এডিসনাল সিভিলিয়ান জজ মিঃ গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী, বেরিষ্টার মিঃ সুরেন্দ্রলাল খাস্তগিরীর স্ত্রী, ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুরের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত, খাস্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া মুখার্জ্জি, এম, এ, শ্রীমতী সুশীলা সেন বি, এ, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের দুই পুত্রবধূ এবং ডাক্তার দুর্গাদাস দত্তের পুত্রবধূ (ইনি হিন্দুমহিলা)।"

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে যদিও বাল্যবিবাহ কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু এখনও সমগ্র সমাজে বাল্যবিবাহের প্রাচুর্য্য বিলক্ষণ রহিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে জনসংখ্যা গণনা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, এখনও ভারতে এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ১৭০০০ সতের হাজার বালক বালিকা বিবাহিত। এক হাজার বালিকা বিধবা, তিনশত বালক বিপত্নীক। দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক বালিকা ৩১৫০০০০ বিবাহিত। দশ বৎসরের বালক বালিকার দেহ মন কত

অপরিণত, এবং এই বয়সের পূর্ব্বেই সাড়ে একত্রিশ লক্ষ বালকবালিকা বিবাহিত হয়; ইহা ভাবিলে কি মনে হয় যে এ অধঃপতিত ভারতে বাল্যবিবাহ রহিত হইতেছে? শিক্ষিত নরনারীদের কর্ত্তব্য যে, স্বীয় প্রতিবেশীকে বাল্যবিবাহ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন।

— —

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, এক ফরাসী পুরুষের স্ত্রীর প্রকৃতি বড়ই উগ্র হইতে আরম্ভ হইল। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, দেয়ালে যে লাল রঙ্গের কাগজ মোড়ান আছে, উহাই এ উগ্রতা উৎপাদন করিয়াছে; লাল কাগজের পরিবর্ত্তে সবুজ কাগজ মোড়ান হউক। তদনুসারে সবুজ কাগজ মোড়ান হইল; দুই দিন পরে দেখা গেল যে, স্ত্রীলোকটি দৈবশক্তি লাভ করিয়াছে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেয়ালে মোড়ান সবুজ কাগজকে স্নায়ুবীয় পীড়া, অস্থিরতা, বিরক্তি, অকারণে উগ্রতার অমোঘ ঔষধ রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

———

কেম্‌ব্রিজে একজন ভদ্রমহিলা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি একটি দরিদ্র-সন্তান প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। গরীব লোকেরা কেহই সন্তানের মমতা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। বিধাতার প্রদত্ত সন্তানবাৎসল্য অতিক্রম করা স্বাভাবিক নহে।

———

মা।

কি দিয়ে গড়েছ দেব স্বর্গের প্রতিমা?
মানবের অন্তঃপুরে
ভুবনমোহিনী সুরে
ঝঙ্কারিল কোন্ ধ্বনি তোমার মহিমা!
মধুর বীণার তন্ত্রী কোন সুরে গায়
যুগে যুগে কালে কালে
এক(ই) সুরে একই তালে
উঠেছে যে মধু বোল থামিবার নয়।
অন্তঃসলিলা ফল্গু ব'য়েছে হৃদয়ে
ছাপিয়া উভয় তীরে
বাহি স্রোত ধীরে ধীরে
এ অনন্ত প্রেমধারা যেতেছে বহিয়ে।
উন্নত পর্ব্বত সম উদার চরিত
ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা
ক্ষমা, দয়া, সরলতা
শান্তি, প্রীতি, একাধারে করেছ নিহিত।
শরতের মেঘমুক্ত চন্দ্রিমার জ্যোতি
মলিন ইহার কাছে;
তাতেও কলঙ্ক আছে
অকলঙ্ক শশধর জিনি এ মুরতি।
বরিষার অনাবিল বারিধারা যথা
পড়িয়া ভূমির পরে
তাহারে সরস করে
কঠিন ধরণী গাত্রে দেয় উর্ব্বরতা;
তেমতি এ স্নেহধারা মানবের চিতে
সিঞ্চি সুশীতল রস
উদ্ধতেরে করে বশ
দাম্ভিকে সুজন করে শিখায় নমিতে।
জগতের একমাত্র কল্যাণ-রূপিণী
আপনারে বিস্মরিয়া
সুখ শান্তি বলি দিয়া
অসহায় মানবের জীবন-দায়িনী!
কোন মহা পুণ্যবলে মানবের ঘরে
পাঠালে এ হেন দেবী
অনন্ত প্রেমের ছবি
মানবে কি লয়ে যাবে স্বরগের দ্বারে?
একি এ পবিত্র স্নিগ্ধ স্বর্গের মাধুরী
গৃহে গৃহে মানবের
পূর্ণ প্রেমস্বরূপের
প্রকাশ একি, একিবা আদর্শ তোমারি?

বাঁকীপুর } ইন্দুপ্রভা দেবী।

——

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০শ ভাগ] ভাদ্র ১৩১৯। সেপ্টেম্বর, ১৯১২। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময়ী পরম জননী, তোমার আশ্চর্য্য লীলাতে সুখাভ্যস্তা, আরামপ্রিয়া নারী, কষ্টসহিষ্ণু প্রেমরূপিণী জননীতে পরিণতা হন। যে নারী জননী হইয়াছেন তিনি আর আপনার জন্য জীবন ধারণ করিতে পারেন না, তিনি স্নেহপরবশ হইয়া সন্তানের সকল প্রকার অভাব নিবারণ করিতে ও তাহার সুখসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অকাতরে আপনাকে দান করেন। তাহা দেখিয়া ভক্ত কবি গাহিলেন—"মহাশক্তি রূপে নারীর হৃদয়ে সুকোমল মাতৃভাব প্রকাশিয়ে, করিলে মোহিত মানবের চিত দেখালে মুরতি ভুবনমোহিনী।" আমরা এই মাতৃভাব দেখিয়া স্বভাবতই মুগ্ধ হই—তোমাকে ধন্যবাদ দান করি। কিন্তু তোমারই নিয়মে সন্তান দীর্ঘকাল অসহায় থাকে না, সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, আর নারীর স্নেহরূপ জননীমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সমাজে দেখিতে পাই, অপর কত শিশু স্নেহময়ী জননীর অভাবে কত ক্লেশ পায়, এমনকি সেই অবস্থায় শিশুকালে নানারূপ অভাবে, অযত্নে, কষ্টে ও রোগে প্রাণ হারায়। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে তুমিই ইচ্ছা করিতেছ যে, যখন কোন জননীর আপনার সন্তানগণের জন্য তত ব্যস্ত থাকিতে হয় না, তখন তিনি মাতৃহীন বা দুস্থ শিশুগণের জননী হইবেন। তুমি যাহাদিগকে মাতৃত্ব দিয়া সম্পন্ন করিয়াছ তাঁহারা মাতৃত্বের কার্য্য করিবেন না ইহা তোমার অভিপ্রায় কখনও হইতে পারে না। অপর যে সকল নারীর অন্তরে মাতা হইবার আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ, কিন্তু সন্তান দাও নাই তাঁহাদের প্রতি ইহাই তোমার আদেশ যে, তাঁহারা মাতৃহীনদিগের মাতা হইয়া আপনাদিগের অন্তর্নিহিত ভাবকে চরিতার্থ করিবেন এবং এইরূপে তোমার জগতের মঙ্গল করিবেন। আমরা যখন

তখন দেখিতে পাই যে আমাদের দেশে একদিকে মাতাগণের ক্রোড় শূন্য রহিয়াছে, অপর দিকে মাতৃক্রোড় না পাইয়া নির্দ্দোষ অসহায় শিশুগণ কষ্ট পাইতেছে ও নষ্ট হইতেছে তখনই প্রাণে আশায় আসে যে তোমার ব্যবস্থা পূর্ণ আছে—কেবল মানুষের দৃষ্টি খোলে নাই। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তুমি কৃপা করিয়া মাতৃগণের মনে প্রেরণা দেও যে তোমার প্রেমে পরিচালিত হইয়া অসহায় বা মাতৃহীন শিশুগণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া স্বর্গের দেবীত্ব লাভ করুন এবং তোমার রাজ্য পৃথিবীতে আসিবার পক্ষে সাহায্য করুন। তুমি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

প্রবীণা মহিলাগণের কর্ত্তব্য কার্য্য।

আমরা যে শ্রেণীর নরনারীর সহিত সর্ব্বদা বাস করি, তাঁহাদিগকে শ্রমজীবী বলে না, কিন্তু দেখিতে পাই তাঁহাদের সকলকেই শ্রম করিতে হয়, এমন কি কাহাকে কাহাকেও গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। বন্ধুবান্ধবের গৃহে যাইয়া দেখি গৃহকর্ত্তা আপনার বাণিজ্য, ব্যবসায় বা চাকরী লইয়া এত ব্যস্ত যে কোন বন্ধু লোক দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া একটু আলাপ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং অনেক সময়ে কর্ম্মের চাপে ভদ্রতা ত্যাগ করিয়া বন্ধুকে অচিরে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য হন। গৃহিণীগণের কার্য্যও তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যস্ত রাখে। যাঁহাদিগকে নিজে রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করিতে হয়, শিশু ও বালকবালিকাগণের সেবাশুশ্রূষা ও শিক্ষাদান করিতে হয় তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বসিয়া কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না, বিশেষ কার্য্যানুরোধেও গৃহত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে পারেন না। এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় কি না তাহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এ বর্ণনা যে সত্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই শ্রমই শরীর মনকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ করে এবং এই শ্রম করিয়া ধর্ম্মসাধন করিলেই সত্যসাধন হয়। ইহার ভিতরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য, সময় ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থানসকলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট অসুবিধা দূর হইবে কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর পরিশ্রম চিরদিন থাকিবে, কারণ ইহাই বিধাতার বিধান।

গার্হস্থ্য জীবনের যে পরিশ্রমের কথা বলা হইল তাহা কর্ম্মঠ জীবনের কথা। সাধারণত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসর বয়সের মধ্যে এ জীবন একরূপ শেষ হয়। কিন্তু মানুষের জীবনের শক্তি ও ক্রিয়াশীলতা তাহার পরও থাকে। সংসারের কার্য্যের প্রধান সময় চলিয়া গেলে পুরুষগণের পক্ষেও স্বীয় শক্তির ও সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন হইয়া পড়ে। অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক পুনরায় নূতন কর্ম্মের

উদ্ভাবন করিয়া নূতন ব্যস্ততা লইয়া সময় ও শক্তির ব্যবহার করেন, তদভাবে আলস্যে সময় কাটাইয়া শক্তি, উৎসাহ ও স্বাস্থ্য হারাইয়া দুঃখে জীবন শেষ করেন। ভদ্র মহিলাগণের অবস্থা এ বিষয়ে আরও কঠিন হয়। আমরা এই বিষয় একটু আলোচনা করিতে অদ্য প্রবৃত্ত হইতেছি। যে বয়সে আমাদের ভদ্রলোকেরা চাকরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন বা বয়স হইয়াছে বলিয়া পরিশ্রমের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন তাহা অপেক্ষা অল্প বয়সে ভদ্র মহিলাগণ আপনাদিগের জীবনের দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য সকল হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইতে হইতেই পুত্র কন্যাগণের লালনপালন, প্রাথমিক শিক্ষা দান ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য ও পরিবারের অপর কার্য্যের ব্যস্ততা হইতে নারী অবসর প্রাপ্ত হন। সাধারণত বিশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারী গৃহিণী রূপে গৃহের সকল ভার বহন করেন, তিনি এক দিনের জন্য গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিলে সকল বিশৃঙ্খল হয়, মাতার অনুপস্থিতিতে শিশুর কোন্ বিপদ্ না হইতে পারে ? কিন্তু যখন বালকবালিকাগণ যুবক যুবতী হইয়া উঠিল, যখন তাহারা আপনাদের জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী মনোনীত করিয়া আপনাদিগের মনোমত সংসারের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইল, যখন পরিবারের ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের ভার তাহারা লইল, যখন তাহারা জনক জননী হইয়া আপনাদিগের শিশুদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিল, তখন প্রবীণা ভদ্রনারীর স্থান কোথায় ? তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য কি ? প্রবীণাগণ আপনাদিগের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি লইয়া কি করিবেন ? এ বিষয়ে আমরা সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের প্রাচীন সমাজের দিকে একবার দৃষ্টি করি। আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন ভাবাপন্ন পরিবারে অপরিণত বয়সে বধূ গৃহে আসিয়াছেন, শ্বশ্রূ প্রভৃতির সাহায্য, উপদেশ ও পরামর্শ ভিন্ন স্বকীয় গৃহকার্য্য কিছুতেই করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অভিভাবক-হীন অবস্থায় সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত ক্লেশকর ও সময় সময় বিপজ্জনক। এস্থলে প্রবীণা মহিলাগণ নবীনাগণের সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নবীনা গৃহিণী গৃহকার্য্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই আর প্রবীণাগণের সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন বোধ করেন না। তখন প্রাচীনাগণের পক্ষে তীর্থবাস করিয়া বিশেষভাবে ধর্ম্ম সাধনা একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ। ইংলণ্ড, ইউরোপ ও আমেরিকার পারিবারিক ব্যবস্থার কথা শুনিতে পাই যে প্রবীণা ও নবীনাগণের সংঘর্ষণের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ পুরুষ ও নারী পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া আপনারা নূতন একটি সংসার স্থাপন করেন; মাতা, প্রবীণা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা অন্য কোন অভিভাবিকার তাহাতে কোনও স্থান নাই। সে দেশে প্রবীণাগণ শেষ জীবনে ঠিক কি কার্য্য করেন তাহা জানি না, তবে বৃদ্ধা নারীগণ বৃথা গল্প, পরচর্চ্চা ও অল্প অল্প ধর্ম্ম সাধনা

করিয়া জীবন ব্যয় করেন এইরূপ শুনিতে পাই। নব্যালোকের নব আদর্শ ও অবস্থা লইয়া সংসার করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত তাঁহাদিগের পক্ষে প্রাচীনা নারীগণের জীবনের কোন্‌রূপ ব্যবহার প্রার্থনীয় তাহা স্থির করা উচিত। কেবল তাহাতেই চলিবে না, যাঁহারা দেখিবেন যে বুদ্ধিদ্বারা ইহার মীমাংসা হয় না তাঁহারা ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি তাহা স্থির করিয়া লইবেন। মাতা, পরম পূজনীয়া নারী, পিতৃস্বসা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি অত্যন্ত আদর ও সম্মানের পাত্রী; অথচ কেবল ভক্তিশ্রদ্ধা, মান্য ও প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহাদের জীবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াশীলতাকে অস্বীকার বা বধ করিতে পারি না। যদি তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত কার্য্য না দিতে পারি, যদি তাঁহাদিগকে এমন পথ না দেখাইয়া দিতে পারি যে তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন সংসার কার্য্যে দেহ মন প্রাণ দিয়া তৃপ্ত ও সুখী ছিলেন; পরেও সেইরূপ বা তদপেক্ষাধিকরূপ কার্য্যে তদ্গত ও আপ্তকাম হইবেন; তাহা হইলে তাঁহারা অসুখ অশান্তিতে জীবন ধারণ করিবেন এবং তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহাদিগের বধূদিগকেও অসুখ অশান্তিতে মগ্ন করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই অবস্থা কতক পরিমাণে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, এবং যদি সময় থাকিতে প্রাচীনা নারীগণের জীবনের সদ্ব্যবহারের কোন স্বাভাবিক ও সুখপ্রদ ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে নূতন ভাবাপন্ন পরিবার সকলের ভয়ানক দুর্দশা হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা গুলির যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের ফল বলা যাইতে পারে এবং অনেক পরিবারের পক্ষে শুদ্ধ তাহাই বটে; কিন্তু যাঁহারা নূতন ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়া আপনাদিগের জীবনের সকল বিভাগকেই সেই আলোকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই ধর্ম্মের প্রভাবে সামাজিক ব্যবস্থা সকলের সংস্কার করিতেছেন তাঁহাদিগের বিষয় বলিতে হয় যে ধর্ম্মের আদর্শ অনুসারেই এ সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে। কন্যাগণ শিক্ষিতা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, জীবন বিষয়ে উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া ও ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনার মনোমত স্বামী গ্রহণপূর্ব্বক সংসার রচনা করিতেছেন। এইরূপে সংসার করা কেবল সভ্যতার কার্য্য নহে; ইহা একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের আদেশে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ। সুমার্জ্জিতজ্ঞান ব্যক্তিগণ উচ্চ সামাজিক নীতি অনুসারে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবেন কেবল তাহা নয়, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহকে ঈশ্বরের গৃহ জানিয়া গৃহে নিয়মিত ঈশ্বরারাধনা করিবেন; এবং ঈশ্বর যেমন মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের মনে ও গৃহে সেইরূপ মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গল কার্য্য হইবে। এইরূপ বিশ্বাসী পরিবার যেমন সংসারের সমস্ত কার্য্য উচ্চ আদর্শ অনুসারে সম্পন্ন করিবেন, সেই রূপ নিত্য নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ দেবতার উপাসনা করিয়া তাঁহাতে প্রেমরস ও পুণ্য-

রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন এবং যখনই আপনার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া একটুও সময় পাইবেন তখনই অন্যের অজ্ঞানতা, দারিদ্র, দুঃখ প্রভৃতি দূর করিয়া সহানুভূতি যোগে প্রতিবেশীর সহিত একাত্মতা সাধন করিবেন। যতই এইরূপে ধর্ম্মশীলা গৃহিণী প্রেমভক্তির সহিত পূজোপাসনাতে অগ্রসর হইবেন ততই দেখিতে পাইবেন যে সংসারের কার্য্যে যত দিন ব্যাপৃত থাকা একান্ত প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা একদিনও অধিক সংসার লইয়া জীবন যাপন করা ক্ষতির কারণ। কারণ সাধুজীবন পাঠ করা, সাধু চরিত্র আস্বাদ করা, ভক্তগণের সঙ্গে ভগবানের পূজা বন্দনা করা, তাঁহার মহিমার আলোচনাতে জীবনকে পূর্ণ রাখা মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর অধিকার ও তাহাতে উচ্চতর সুখ। ভগবানের প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়া এবং সাধুচরিত্রে পরসেবায় গৌরব দর্শন করিয়া পৃথিবীর প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইবেন এবং প্রতিবাসীর অভাব, অবিশ্বাস, পাপ, রোগ, শোক প্রভৃতির সংবাদ পাইবা মাত্র তাহাদিগের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনাকে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ভগবানের নিয়মে নারী মাতা হন, মনুষ্য স্বভাবের যত প্রকার অভাব, যত প্রকার প্রয়োজন তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হন। যখন নারী গৃহিণী তখন তিনি সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়া স্বামী পুত্র কন্যার সেবা করিয়া সংসারের মঙ্গলরূপিণী দেবী হইয়া কার্য্য করিলেন। সময়ে তাঁহার সে কার্য্য শেষ হইয়া গেল কিন্তু তাঁহার শক্তি, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা এবং সেবাতে সুখবোধ সকলই রহিয়া গেল। যৌবনে মনুষ্য প্রকৃতিই প্রধান শক্তি হইয়া তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল কিন্তু তিনি ধর্ম্মশীলা সাধিকা; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সাধন করিয়া স্বর্গীয় প্রেম স্পর্শ অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। পরিণত বয়সে তিনি স্বর্গীয় প্রেম লাভ করিয়া, দেবীভাবে চালিত হইয়া, মনুষ্যের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পুত্রকন্যাগণ তাঁহার চির প্রিয়, কিন্তু তাহারা তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকটে থাকিয়া সেবা করিবার তাঁহার প্রয়োজন নাই। প্রবীণা নারী এইরূপে সংসারের পরিমিত কর্ম্মক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ প্রেমে সেবা করিতে অভ্যস্ত হইয়া প্রমুক্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য এক দেবী হইয়া বাহির হইলেন। যেখানে অভাব, কষ্ট, পাপ, রোগ প্রভৃতি নরনারীকে ক্লেশ দান করিতেছে সেখানে যেমন স্বর্গের ঈশ্বর নিজ কৃপাতে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহার সেবিকাও সেবাকার্য্যে তাঁহারই ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ ব্রহ্ম যে আনন্দময়, ইহা অন্য সাধকের নিকট একটা বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে, কিন্তু যে নারী এইরূপে দেবত্ব লাভ করিয়া কার্য্যত ব্রহ্মোপাসনা করিবেন তিনি যত শুদ্ধ প্রেমে আত্মদান করিবেন তত ব্রহ্মরস ও ব্রহ্মানন্দ পান করিবেন। আমাদের যে সকল পাঠিকা সংসারে

থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন তাঁহারা যদি এই ভাবে ধর্ম্ম ও সেবাব্রত সাধন করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে যখন সংসার তাঁহাদিগকে তেমন চাহিবে না তখন এইপথে জীবনে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদরূপ শান্তি আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিতে পারিবেন।

মহিলাধর্ম্ম।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচী এবং প্রতীচী উভয়ের সাক্ষাৎকার হইতেছে। জ্ঞান ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি উভয় দিকে বিভিন্ন ছিল। এখন উভয় দিকের লোকের মিলন ও সংঘর্ষে উভয় দিকেই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। সবলের সহিত দুর্ব্বলের মিলনে দুর্ব্বলের ক্ষতি; সবলেরই জয় হওয়ার কথা। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় মহিলাদিগের ধর্ম্ম অতি দৃঢ়। সতীত্ব ও একনিষ্ঠতা, পতিপরায়ণতা ও গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, দুর্ব্বল ও অজ্ঞান, হীন ও পতিত পূর্ব্বদেশে সহস্র সহস্র বৎসর হইতে অত্যন্ত স্থির অবস্থাপন্ন। পশ্চিম-দেশের নব্য সভ্যতাগর্ব্বিত সমাজের মস্তক এবিষয়ে পূর্ব্বদেশের নিকট অবনত না হইয়া পারে না।

অন্যদিকে সামাজিকভাবে সেবা ধর্ম্ম ও তৎসংসৃষ্ট নীতি রীতি বিষয়ে পাশ্চাত্য রমণীগণ নমস্য বলিয়া পরিগণিত হইতে-ছেন। এতদ্দেশীয় পুরমহিলাগণ যখন যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সেবাতে রত পাশ্চাত্য মহিলাগণের সাহস, উৎসাহ ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার কাহিনী শ্রবণ করেন তখন তাঁহারা শির অবনমিত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অন্তঃপুরচারিণী প্রাচ্য মহিলাগণের শ্রমশীলতা, নিস্পৃহতা, ভোগ-বিমুখীনতা এবং পতি পুত্রাদি ও অতিথি-গণের সুখ সুবিধার জন্য প্রযত্ন-পরতার কাহিনী শ্রবণে পাশ্চাত্য সভ্যতাগর্ব্বে গর্ব্বিত মহিলাগণেরও হৃদয় মন বিস্ময়-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

ইউরোপ এবং আমেরিকা খ্রীষ্টান। কিন্তু ভারতবর্ষ হিন্দু, চীন ও জাপানাদি বৌদ্ধ। রমণীধর্ম্মের আদর্শ ভারত চীন জাপানে এক এবং ইউরোপ ও আমে-রিকাতে অন্যতর।

খ্রীষ্টানধর্ম্মে রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট মতানুসারে নারীজাতির ধর্ম্মা-দর্শ এক হইয়াও দুই ভাগে বিভক্ত। এদিকে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভিন্নতানু-সারে প্রাচ্য রমণীকুলেরও ধর্ম্মাদর্শ বিভিন্নরূপ।

রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক জ্ঞানী ধনী ও পদস্থ লোক চির-কুমার ব্রতধারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা নরনারীনির্ব্বিশেষে ভোগসুখে বিরত থাকেন, মনুষ্যজাতি যাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস ভক্তিতে সমুন্নত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মনুষ্যজাতির সেবাকার্য্যে আপনাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া থাকেন। ঐ শ্রেণীস্থ সন্ন্যাসীদিগের এক এক জনের জীবন

বস্তুতঃ নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত থাকিয়া মানবজাতিরূপ ভূতলের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। সন্ন্যাসিনী খ্রীষ্ট-ভক্ত রমনীগণের শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বাস্তবিকই অতি চমৎকার। ইঁহারা খ্রীষ্টভক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া নর-নারীর প্রতি অসাধারণ প্রীতিপূর্ণভাবে তাহাদের নানারূপ সেবাকর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করেন।

ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মে সেবার মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। যদিও পুরুষের ন্যায় অনেক রমনীও বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়ে গৃহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতধারিণী হইতেছে, তথাপি তাহারা জনসমাজের বিশেষ সেবাব্রতে ব্রতী এরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী বা বৈরাগিণী হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষাদ্বারা উদরপুজা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের কেহ কেহ নামকীর্ত্তন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জনসমাজের আত্মিক সেবা করিয়া থাকে; নতুবা তাহাদের বৈরাগ্যব্রত দ্বারা অন্য লোকের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধিত হয় কি না তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী পুরুষগণ সকলেই যখন কেহ সন্ন্যাসী এবং কেহ মৃত হইল, রাজান্তঃপুরবাসিনীদিগের পরিরক্ষণকারী শেষ হইয়া গেল, তখন শাক্যসিংহের পত্নী গুণবতী সতী গোপা প্রভৃতি শাক্যকুলকামিনীগণ ভিক্ষুণী হইবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব গত্যন্তর না দেখিয়া ভিক্ষুণীদল গঠন করিয়া দিলেন। শ্রীমতী গোপা সেই ভিক্ষুণীদল মধ্যে প্রধানা হইলেন। গোপা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকার্য্যও করিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদলের কার্য্যের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে কাহারও বিদিত নাই। ভারতবর্ষের সীমা মধ্যে পূর্ব্বকার মত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব নাই, এখানে বৌদ্ধসঙ্ঘ নাই। চীন জাপানাদি দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণের কোনরূপ সেবাব্রত প্রচলিত আছে কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি।

হিন্দুরমনীর ন্যায় বৌদ্ধসীমন্তিনীগণও সতীত্ব এবং সহিষ্ণুতা লইয়া স্ব স্ব গৃহ মধ্যে পতি পুত্রাদির সেবাকার্য্যেই জীবন ক্ষয় করিতেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মহিলাকুল স্ব স্ব পরিবার মধ্যেই কার্য্যক্ষেত্র পাইয়া পরিতুষ্ট থাকেন। গৃহকার্য্য ও আহারীয় প্রস্তুত বিষয়ে, গৃহবাসীদিগের রোগ শোক দুঃখ বিপদে সহানুভূতিতে এবং উপযুক্তরূপে সেবা শুশ্রূষাবিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধরমনীগণ অতুল শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে বৌদ্ধবংশ নির্ব্বংশ প্রায়। সুতরাং বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণের অবস্থা হিন্দুদিগ হইতে স্বতন্ত্র হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে এক অভিনব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রহ্মজ্যোতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পত্তি কেবল বঙ্গে নহে সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অপরাপর রমনীসমূহ মধ্যে বিজ্ঞান ও

পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ পাইতেছে। ভারতের ও বঙ্গদেশের নীতিধর্ম্ম ও রীতিব্যবহার পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে এক অভিনব ভাবাপন্ন হইতেছে। শিক্ষিতা মহিলাগণ প্রাচীনা হিন্দুরমণী মতও নহেন, সভ্যতাভাবাপন্ন পাশ্চাত্য রমণীবৃন্দেরও মত নহেন। তাঁহারা যে কি হইয়াছেন এবং তাঁহাদের যে আদর্শ কি হইবে তাহাও যেন অদ্যাবধি স্থিরতর হয় নাই।

নবধর্ম্মের প্রভাবে অস্মদ্দেশে পুরুষদিগের মধ্যে যে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেরূপ ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন রমণীবৃন্দ মধ্যে অদ্যাবধি সংসাধিত হয় নাই। রমণীদলে ধর্ম্মবিপ্লবের তরঙ্গ বিলম্বেই লাগিয়া থাকে। পতি-প্রেমের প্রভাবে অথবা ভাতৃস্নেহের আকর্ষণে পড়িয়া কোন কোন মহিলা নবাগত ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কোন নবধর্ম্ম সংস্কার কালেও কৃতার্থ হইয়াছেন এরূপও দেখা গিয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তিসাধনের কালে শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যাদির পত্নীগণ ভক্তির ধর্ম্মই অবশ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে, বৈরাগ্যের অগ্নিতে দগ্ধরূপে, কোন মহিলার নাম শ্রুতিগোচর হয় না। কোন্ সময়ে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব রমণীগণ সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাব্রত ও নামজপকার্য্যকে মোক্ষকার্য্য রূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং কাহার দ্বারাই বা ইহার প্রবর্ত্তনা হয় তাহাও জানিবার পথ নাই। কোন বৈষ্ণব কি এবিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য বিদিত করিতে পারেন?

খ্রীষ্টধর্ম্মে এ বিষয়ে ইতিহাস আছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং অকৃতদার এবং প্রাচ্য সন্ন্যাসীর অবস্থাপন্ন জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে অনেকে বিবাহিত ছিলেন। তাঁহারা ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক পরিবারাদির প্রতিপালন এবং আবশ্যকতানুসারে প্রচার কার্য্যও করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ে সন্ন্যাসী কিম্বা সন্ন্যাসিনী দলের সৃষ্টি হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম মিশর ও ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রবেশ করার পরে সন্ন্যাসী দলের বীজ গঠিত হয়; তাহা হইতে তৃতীয় খৃষ্ট শতাব্দীতে সন্ন্যাসীর দল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসিনী দল গঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমতঃ বঙ্গদেশের পুরুষেরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা রাজা রামমোহনের সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে কোন মহিলার সংশ্রব ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সংস্কারের ভাবও প্রবেশ করে। তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে এবং জীবনের কর্ত্তব্য-সাধনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব প্রবেশের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও সত্যধর্ম্ম যাহাতে পুরমহিলাগণ গ্রহণ পূর্ব্বক কুসংস্কার-বিমুক্ত ও অসত্য হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইতে পারেন মহর্ষি এ বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারে এবং তাঁহার বন্ধুদিগের পরিবারে এ বিষয়ে সফলতাও লাভ হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী বন্ধুগণ উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং বিশুদ্ধ নীতি পরিবারে, জনসমাজে এবং স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া নব ধর্ম্মপথে যাত্রী হইয়া যে মহাপরিবর্ত্তন স্রোত খুলিয়া দিয়াছেন তাহার ফল সমস্ত ভারতবর্ষ ভোগ করিতেছে। তাঁহাদিগের পত্নীগণও পতি প্রেমে আবদ্ধ হইয়াই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবধর্ম্মের আলোক আপনার এবং অপরমহিলাদিগের পারত্রিক, ঐহিক কল্যাণ লাভার্থিনী হইয়া দুই এক-জন মহিলা এ যুগের নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশেও জ্ঞান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কালে বহু মহিলা এক নবীন পথ প্রদর্শন করিবেন এরূপ আশা করা যায়। সুতরাং সে বিষয় এদেশীয় অগ্রণী নর নারীদিগের চিন্তা করা উচিত।

যে দেশে মৈত্রেয়ী, গার্গী বিশ্ববারা প্রভৃতি পরাবিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলার জন্ম, যে দেশে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ গণিতাদি অপরা বিদ্যায় বিদুষী বহু প্রাচীন মহিলা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে সীতা সাবিত্রীর পদধূলি পড়িয়া রহিয়াছে, সে দেশে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনকালে প্রাচীনের সহিত নবীন মিশাইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সম্মিলন করিয়া নবীন মহিলাকুল সমুদ্ভূত হইবেন ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়। এজন্য নবধর্ম্ম ও জ্ঞান, শিল্প ও কলাবিদ্যা, গৃহধর্ম্ম ও পরসেবার সংমিলনে এক অভিনব আদর্শ নারীবৃন্দের সম্মুখে সংস্থাপন করা সমূহ আবশ্যক হইয়াছে। একার্য্য শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দ যদি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির না করেন তবে কে আর তাহা করিবে? গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ যে আদর্শ নারীজাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন ইহা নারীজাতির পক্ষে এদেশে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শীঘ্র এ আদর্শ বিপর্য্যস্ত না হইলে এদেশীয় রমণীদিগের নিতান্ত অনিষ্ট হইবে। এ কথা কি শিক্ষিতা মহিলা এবং দেশ হিতৈষী পুরুষগণের অন্তঃকরণে অনুভূত হইতেছে? মহিলাধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করা অগ্রণী ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দুইটি প্রশ্ন।

মহিলাতে পড়িলাম—এক জায়গায় কেহ লিখিতেছেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কেবল প্রয়োজন নয়, তাহা নহে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে একান্ত যত্ন চেষ্টা করা অনিষ্ট কর ও পাস হওয়াও অশান্তিকর।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে বিদ্যালাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী তাহা আমার আলোচনার বিষয় নহে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় কোন প্রয়োজন নাই কিম্বা পাস হওয়া অশান্তিকর এ কথায় তো অন্ততঃ আমার মন সায় দেয় না।

যাঁরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন কিম্বা হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের কি কিছুই সুশিক্ষা হইতেছে না বলিতে হইবে? যদি না হয়ে

থাকে কিম্বা না হয়, তবে তাহা শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদের নিজেদের দোষ। অবশ্য এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও উপাধিধারিণীদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অনেক উন্নত, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও জ্ঞানী হওয়া যায়, সুশিক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া কি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিব যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাহিলে সুশিক্ষা হয় না, কিম্বা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন নাই?

যেমন দিন দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে খুব প্রয়োজন মনে হয়। ইহা তো অনেকে স্বীকার করেন যে মেয়েদের ও ছোট ছেলেদের শিক্ষার-ভার মেয়েদের উপর দেওয়াই প্রয়োজন? যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিরোধী, তাঁহাদের যখন শিক্ষয়িত্রী বাছিবার ভার দেওয়া হয় তাঁহারাই দেখি উপাধিধারিণীদের আগে বাছিয়া লন, তখন উপাধির আদর আগে করা হয় তাহার পর উপযুক্ততার। যদি তাঁহারা দুই চারিজন শিক্ষিতা বিন-উপাধিধারিণীদের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ভার দিয়া তাঁহাদের শিক্ষার সমাদর করিতেন, উৎসাহ দিতেন এবং এইরূপে তাঁহাদের কথার ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অভিভাবকেরা এবং ছাত্রীরাও তাহাদের প্রস্তাব বুঝিতে প্রয়াস ও যত্ন করিতেন।

ইহাঁদেরই আবার কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি "যাঁহারা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবেন স্থির করিয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষা দিন, সকলের দিবার কোন দরকার নাই।" কিন্তু আমরা যা হইব কল্পনা করিয়া রাখি আমাদের জীবন যে ঠিক সেই রকম ভাবে নিশ্চয় কাটিবে ইহা কি আশা করা যায়? প্রত্যেক জীবনকে কি এমন ভাবে গঠন করিবার চেষ্টা করা উচিত নয় যে, তাহাকে যে অবস্থায় পড়িতে হউক না কেন সে সব অবস্থায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যখন যে কাজ আসিবে করিতে সমর্থ হইবে?

পরীক্ষার ভিতর দিয়া যে কত শিক্ষা আসে তাহা কি যাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছেন তাঁহারা অস্বীকার করিবেন? মানুষের স্বভাবই এই যে বেশী চাপ না পড়লে কিছু করিতে চাহে না। অতি ভাগ্যবান তাঁহারা যাঁরা সহজে, ইচ্ছা করিয়া কেবল শিক্ষার জন্য বিদ্যা আলোচনা করেন। আমরা যদি স্রষ্টার প্রকাশ সৌন্দর্য্যের ভিতর সহজে সবাই দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবান মানবজীবনে এত পরীক্ষার আয়োজনই বা কেন করিতেন? ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষাও জীবনের একটা মহা পরীক্ষা। তাহার জন্যও অনেক সংযমী হইতে হয়। ছোটবেলা একজন একটী বড় সুন্দর কথা বলেছিলেন, সেটি এখনও খুব মনে হয়, "লেখা পড়াই এখন তোমার তপস্যা, এই তপস্যাই এখন সাধন কর।" অবশ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাহিলে এমন কতকগুলি বিষয় শিখিতে হয় যে, তার যে কি উপকারিতা তা ছাত্রীরা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, যাহা চাহি না শিখিতে তাহা কেবল জোর

করিয়া matriculation পর্য্যন্ত পড়িতে হয়; তার পর কলেজে তো নিজের ইচ্ছামত কি কি বিষয় পড়িব বাছিয়া লওয়া যায়। কি কার পক্ষে ঠিক তাহা বাছিয়া লইতেও যে সময় যায়। যে জিনিষ ভাল লাগিনা তাহা যখন করিতে যাই, তখন সেই করাটা কি বেশী করে সংযম এনে দেয় না? জীবনেও তো এমন অনেক ঘটনা হয় যার উপকারিতা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। জীবনে কিছুই বৃথ যায় না। অঙ্ক শাস্ত্র যাহা মেয়েদের কোনই দরকার মনে হয় না, তাহাও চঞ্চল মনকে স্থির করিবার, চিন্তা শক্তি বাড়াইবার একটি খুব ভাল উপায়। (অবশ্য কাহারও কাহারও চিন্তাশক্তি না বাড়িয়া বরং নাম শুনিলেই চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়)।

বর্ত্তমান অবস্থায় উপাধি-লাভাকিনী মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা যে ভয়ানক অনিষ্টকর তাহা অনেকেরই মনে হয়, কিন্তু সেটা কি কেবল পরীক্ষার দোষ? স্বাস্থ্যহানির কারণ ভাবিয়ে দেখিলে দেখা যায় (মেয়ে পুরুষ উভয়ের পক্ষেই) যে সেটা কেবল পড়ার চাপ নয়, সেটা আরও কিছু। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব কি পারিব না, এই ভাবনাই পরীক্ষায় প্রস্তুত হবার খাটুনীর চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক সময় স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হয়। অবশ্য মেয়েদের অন্য অনেক কারণ আছে, অবরোধ প্রথা তাহার একটি প্রধান কারণ। যদি মেয়েদের পড়ার চাপ হইতে শিক্ষয়িত্রীরা যত সাধ্য বাঁচাতে চেষ্টা করেন (অবশ্য সেই সঙ্গে ছাত্রীদেরও ফাঁকি দেবার অভ্যাস ছাড়িতে হইবে,) এবং মানসিক চালনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক চালনার ব্যবস্থা করা হয়, ও ছাত্রীরাও প্রত্যেকে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে একটা প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা মনে রাখিয়া তার সঙ্গে কেবল গুরুজনের অনুরোধে নয় কিন্তু ভালবাসিয়া নিজ হতেই পড়ায় অনুরাগিণী হন তাহা হইলে এতটা স্বাস্থ্যভঙ্গ বোধ হয় হয় না।

যে শিক্ষা কত সুন্দর সুন্দর জীবন গঠন করিয়া তুলিয়াছে সেই শিক্ষা যে আমাদের মানসিক অপকার করিবে অশান্তির কারণ হইবে ইহা বিশ্বাস করি না। যদি আমরা মন্দ হইয়া থাকি তাহা আগেই বলিয়াছি যে পুস্তকের দোষ নয়, যিনি পড়িতেছেন বা যিনি পড়াইতেছেন তাঁহার দোষ। আমাদের মধ্যে অনেক দোষ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু স্বাধীনতা দরকার সেটুকু বোধ হয় মেয়েদের দেওয়া হচ্ছে না। Those that trust us Educate us—George Eliot এর এই কথা খুব সত্য। কেহ যখন বিশ্বাস করিয়া আমাদের উপর কিছু কাজের ভার দেন, সেই বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাসের উপযুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে না কি? অশান্তির একটা কারণ হয়তো একেবারে স্বাধীনতা না দেওয়া। যে বিদ্যালয়ে যে পরিমাণে বিশ্বাস করা হয়েছে সেই বিদ্যালয়ে মনে হয় সেই

পরিমাণে উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রী তৈরী হয়েছে। অবশ্য ছাত্র ছাত্রীদের সে রকম স্থলে কতটা দায়িত্ব বাড়িয়া যায় তাহা তাহাদের স্বাধীনতা চাহিবার সময় খুব মনে রাখা উচিত। কি বিদ্যালয়ে কি গৃহে, সব জায়গায় সবাই সবাইকে সাহায্য না করিলে কথনই শান্তি থাকিতে পারে না। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, পুরুষ, শিক্ষক, ছাত্র, যদি পরস্পরের মনের ভাবকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে বোধ হয় এত অশান্তি হয় না।

শিক্ষা যে ঠিক রকম হচ্ছে না তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ততটা দায়ী নয় যতটা বাড়ীর লোকেরা বা মা বাপ ইত্যাদি গুরুজনেরা দায়ী। মা বাপেরা ছেলেমেয়েদের ভার শিক্ষকদের উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব যে শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করেন না। শিক্ষকেরা পিতা মাতাকে একটু সাহায্য মাত্র করিতে পারেন, তার চেয়ে যে বেশী কিছু সাধ্য হয় তা বড় মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন নাই, ইহা না বলিয়া যাঁরা পরীক্ষা দিবেন তাঁরা যেন অন্যান্য প্রয়োজন গুলি ভুলিয়া না যান ইহা মনে করিয়া দিলে কেমন হয়? যাঁরা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করিতেছেন কিম্বা চেষ্টা করিবেন, তাঁরা যেন তাঁদের শিক্ষা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইতি না করিয়া দেন, কিন্তু সেই শিক্ষা গুলিকে জীবনগত করেন। পাস করিয়াছি, অতএব আমি একটি মস্ত লোক এই ভাব অনিষ্টকর এবং পাস করিলেই যে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলাম আর আমার কাহারও কাছে কিছু জানিবার, বুঝিবার বা শিখিবার নাই ইহাই অনিষ্টকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কজন দিতেছেন? বিদ্যালয়ে শিক্ষাই বা কত মেয়ে পাইতেছেন? সবাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইবেন সে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের এত মেয়ের মধ্যে বৎসরে বৎসরে ৫০।৬০ জনের বেশী মেয়ে বোধ হয় পরীক্ষা দেন না। এখনও অনেক স্কুল শিক্ষয়িত্রী খুঁজিয়া পায় না। তবে আবার যাঁহারা শিক্ষা পাইতেছেন তাঁহাদের খুব সাবধান হইয়া যে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে এ কথাটা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আজকাল আমাদের কি অভাব হচ্ছে সেই প্রশ্ন গুলি আলোচনা করিলে কি ভাল হয় না? কি দরকার নাই আলোচনা না করে, আগে কি দরকার তাই আলোচনা করিলে কি ভাল হয় না?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পিতৃস্থানীয় ও ভ্রাতৃস্থানীয়দের কাছে—অবরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে আপনারা কি সাহায্য করিবেন? এ সংগ্রাম আমাদের মনে মনে অনেক দিন চলিতেছে, কিন্তু আমাদের দুঃখ কি আপনারা সকলে বোঝেন? মনে হয় না তো। আপনারা একদিন গৃহের বাহিরে না গেলে কি রকম বোধ হয়? আমরাও ঠিক সেই রকম

অনুভব করি, কিন্তু আমাদের সহানুভূতি করিবে কে? (অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমরা কেহ কেহ খুব সহানুভূতি পাইয়াছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, আমাদের কাহা-রও কাহারও এ সম্বন্ধে নালিশ করিবার কিছুই নাই, তবে এখানে মেয়েদের অবস্থা মোটের উপর কি তাহাই বলা হইতেছে।) যদি আজ বেড়িয়ে কাল আবার যাইতে চাই, তাহা হইলেই শুনিতে হইবে "মেয়ে-ছেলের আবার রোজ রোজ বেড়ান কি?"

এই অবরোধ প্রথা যে কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা লোকে কলিকাতায় আসিলে খুব বুঝিতে পারে। কি অনিষ্ট হইতেছে তা সকলেই খুব ভাল করিয়া জানেন, তাহা আবার লিখিবার প্রয়োজন দেখি না। অবরোধপ্রথা একেবারে এখনি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক তাহাও বলি না, এবং আমাদের দিন রাত বেড়াইতে দেওয়া হউক তাহাও বলি না, কেন না কলিকাতার ট্রামগাড়ীর ধাক্কা খাইয়া লোকের ঠেলাঠেলির ভেতর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া বড় সুখকর নয়; কিন্তু দরকারী কাজের সময় যেমন বাড়ী অদূর হইলে হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়া কিম্বা প্রতিবেশিনীদের অসুখ ইত্যাদি হইলে দেখিতে যাওয়া, কি মন্দিরে যাওয়া—প্রথমে এই সব সময় অবরোধ প্রথা উঠাইবার চেষ্টা করা খুব উচিত। একটা কথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে "কলিকাতায় কেউ কারুর খবর নেয় না"। কলিকাতারই বা দোষ কি! যদি এক টাকার কাছাকাছি না ফেলিলে একবার খবর লওয়া যায় না, সে অবস্থায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা মাসে একবার খবর লইতে পারেন? দায়ে পড়িয়া অনেকে সকল সম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দেন।

অবরোধপ্রথা বাপ ও ভাইদের সাহায্য না পেলে আমরা কখনও উঠাইতে পারি না। এই সব দরকারী কাজে যদি তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে করিয়া আমাদের লইয়া যান তাহা হইলে বোধ হয় বাহিরের লোকে বেশী কিছু বলিতে সাহস করেন না, প্রথম দু একদিন দু চারিটা কথা শুনিতে হবে বোধ হয়, কিন্তু সে বলাতে কিছু বড় আসে যায় না।

মেয়েরা—যাঁহারা বাহিরে বাহির হইবেন, তাঁহাদেরও মনে রাখা উচিত যে রাস্তায় হাঁটিতে হইলে সপ্রতিভ ও স্বাভাবিক ভাবে চলা উচিত; কাপড়ের পুঁটলীর মত জড়সড় হইয়া চলিলে, যিনি সঙ্গে লইয়া যান তাঁরও বিষম বিপদ হয়। তবে হয়তো না হাঁটিয়া হাঁটিয়া আমাদের অবস্থা এমন হইয়াছে, যদি ছোটবেলা হইতে হাঁটিবার অভ্যাস থাকিত, হয়তো এত জড়সড় মনে হইত না। এসব বিষয়ে বেশী লেখালেখী না করিয়া একেবারে কার্য্যে আরম্ভ করিলে কি ভাল হয় না? মেয়েদের রাত্রে হাঁটা কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, দিনে দরকার হলে হাঁটিতে লজ্জা কিসের? কিছু দোষ করছি না তো যে লুকিয়ে করিব।

সেনাপতি বৃথা।

সে আজ ২০ বৎসরের কথা। এক দিন শীতকালের কুয়াশাবৃত প্রত্যুষে

হাবড়া ষ্টেশনে বহু লোকের সমাগম। সকলেই উদ্‌গ্রীব, পঞ্জাব মেল কতক্ষণে আসে। যথাসময়ে সহস্র কণ্ঠের "হুরে' ধ্বনির সহিত ডাকগাড়ী সগর্ব্বে ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। প্রতিদিন শত শত যাত্রীকে ডাকগাড়ী বহন করিতেছে সেদিন যাঁহাকে আনিয়াছিল এমন যাত্রী কবে সে পাইয়াছে? যাঁর জন্য এত আশা, এত ব্যাকুলতা, অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন, অমনি সেই সহস্র কণ্ঠে পুনরায় "হুরে' ধ্বনি ষ্টেশন কাঁপাইয়া দিল।

এ কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যাঁর জন্য সেই শীতের ভোরে আরামশয্যা ত্যাগ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা হাবড়ায় ছুটিলাম? দেখিলাম উন্নত সে ললাটে বিশ্বাস এবং বিজয়ের জ্যোতি, প্রশস্ত সে বক্ষে "রক্ত এবং আগুন" * লেখা নয়নে যেন সেই ঈশার প্রেমদৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে যেন এক অপার্থিব মহত্ত্ব। এ পূত দৃশ্য দেখিবার বটে, মূর্ত্তিমান তীর্থ যেন। যাহা দেখিলাম, ২০ বৎসরেও তাহা ভুলিতে পারিলাম কই?

আর গত ১২ই ভাদ্রের ছবি? সেই বিজয়ী বীর মহাশয়নে শায়িত। যে ব্রহ্মাস্ত্র বলে তিনি সহস্র যুদ্ধে জয়ী আজ সেই বাইবেল পুস্তক যাঁর শবাধারের উপরে শোভিত, আর আশে পাশে ইংলণ্ড ও জর্ম্মানির সম্রাটপ্রেরিত পুষ্পোপহার। কি অপূর্ব্ব সে শোভাযাত্রা যাহার মধ্যে সম্রাটের ও সকল জাতির প্রতিনিধি ছিলেন, এবং যাহা সুদূরপ্রসারী মাইল পথ ব্যাপিয়া চলিয়াছিল! ৪০টি ব্যাণ্ড বাজাইয়া ৫০০০ বিশ্বাসী সেনা সেনাপতিকে শেষ সম্মান দিতে চলিয়াছেন, লণ্ডনের পথে লোক ধরে না, আর সমগ্র ইংরাজজাতি, সমগ্র পৃথিবী চক্ষের জলে ভাসিতেছে। এ কোন সম্রাট, যাঁর জন্য সম্রাট হইতে দীন দরিদ্রের চক্ষে জল, যাঁকে সম্মান দিবার জন্য সম্রাটের তৎপর? ইনি সেই দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, ক্ষুধার্ত্তের অন্নদাতা, পাপমগ্নদিগের ভেলাস্বরূপ সেনাপতি বুথ—যুগ যুগান্তর পূজিত হইবার যোগ্য নাম—সেনাপতি বুথ।

সেনাপতি, তাঁর জন্য এত সম্মান? আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে নরহত্যা করিতে তিনি সেনাপতি হন নাই, কিন্তু দুর্ব্বলকে বল দিতে, পতিতকে তুলিয়া ধরিতে, মুমূর্ষুকে নবজীবন দিতে, বাইবেলরূপী ব্রহ্মাস্ত্র ধরিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশার অসমাপ্ত কার্য্য তাই তিনি বহুদূর সমাপ্ত করিতে সফল হইয়াছেন। তাঁর শত্রু বা কে? এত সংগ্রামই বা কার সঙ্গে? প্রত্যেক নরনারীর যে শত্রু সেই তাঁর শত্রু, তাই তিনি দারিদ্র্য ও পাপের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁর যুদ্ধের মূলমন্ত্র তিনি কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছিলেন, "My religion is in four letters—L—O—V—E." ৪ অক্ষরে আমার ধর্ম্ম, ভা—ল—বা—সা। এ মহামন্ত্র কি অমোঘ শক্তি ধরে আজ তার সাক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীর দুঃস্থ নরনারী দিতেছে, আমাদের

* Blood and Fire—মুক্তিসেনার Motto।

ভারতের নিম্নতম শ্রেণীর অপরাধী জাতি-গুলি (criminal tribes) দিতেছে। রাজা যাহা শত বিচারালয়ে ও জেলখানায় পারেন নাই, সমাজ ও ধর্ম্ম যাদের শাসন এবং ভয় প্রদর্শনে পারেন নাই, ইনি সেই অব্যর্থ প্রেমমন্ত্রে অসম্ভব সম্ভব করিলেন।

"আগে পেট ঠাণ্ডা কর, পরে ধর্ম্মকথা বলিও' ইহা তাঁরই কথা। তিনি বলিয়াছেন, "তোমার সম্মুখে এই যে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত শ্রমজীবী দাঁড়ায়ে, তুমি তাকে লয়ে কি করিবে? সে কাজ চায়। ক্ষুধার্ত্তউদরে ও ছিন্নবস্ত্রেই সে এখনি কাজে লাগিতে প্রস্তুত। তার ভাল করিতে চাও ত এখনি তাকে কাজে লাগাও, কাজের ভিতর তাকে শিক্ষা দাও, সে জীবনের নূতন পথ নিশ্চয়ই ধরিবে এবং সমাজের অলঙ্কার হইয়া উঠিবে।" সেনাপতি উইলিয়ম বুথ যখনি দরিদ্র ও পাপ-মগ্ন দেখিয়াছেন, আগে তার দেহের আরাম বিধান করিয়াছেন, শ্রমজীবীকে শ্রমের উপায় দেখাইয়াছেন, পরে তাকে ধর্ম্মের পথে আনিতে পারিয়াছেন।

মেথডিষ্ট (methodist) সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন, দরিদ্রের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিতে-ছিল। তিনি দেখিলেন সমাজের দশম ভাগ লোক ঘোর দারিদ্র্যে ও পাপে মগ্ন। চার্চে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না, অথচ সভ্যতা ও উন্নতির পার্শ্বেই ঘোরতম দুর্দ্দশায় বাস করে। এই সকল লোক ধরিতে তিনি চার্চ ছাড়িলেন, মান সম্ভ্রম, সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিলেন, দারিদ্র্য উপবাস ও নির্য্যাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। পার্শ্বে তাঁর কে? ইনি বীরপতির যোগ্যা বীরপত্নী, মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা ও অগ্নিরূপিণী মুক্তি সেনার মাতা ক্যাথারিন বুথ। দুটি বীর হৃদয় এক সেই প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লণ্ডন সহরের জঘন্য পল্লী East End এ ছুটিলেন। মাতাল, দস্যু, ব্যভিচারী, ও অকথ্য অপরাধে অপরাধীদিগের বাড়ী বাড়ী যাইলেন, তাদের গৃহের অভাব দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধান, রোগচর্য্যা, কলহ ও অশান্তি নিবারণ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে সেবা করিতে লাগিলেন। পুরস্কার ও প্রচুর পাইলেন, কোথাও নির্দ্দয় প্রহার, কোথাও মুখে থুৎকার, কোথাও লাঞ্ছনা, কোথাও দূরী-ভবন। কিছুতে কি সে বীরহৃদয় দমিল না? ঈশার প্রেমমন্ত্র যাঁদের প্রাণে, ঈশার ক্রুশ যাঁদের অন্তরের অন্তরে, তাঁরা গিয়া-ছিলেন সহ্য করিতে, তাই সব সহিয়া সেই পল্লীতেই তাদের বিজয় নিশান প্রোথিত করিলেন। তার পরে হস্তী শিকারীরা যেমন পোষা হস্তী দ্বারা বন্য হস্তী ধরে সেইরূপ এই সব পরিবর্ত্তিত পাপীদের দ্বারা নূতন পাপী ধরিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁর কার্য্যক্ষেত্র East End ছাড়াইয়া দেশময় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল।

কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে ক্যাথারিন ও তাঁর স্বামী উই-লিয়মের হৃদয় হইতে এক অপূর্ব্ব সহানু-ভূতির ধারা বহিল, সেই অদ্ভুত পুস্তক "In Darkest England And The

Way Out" লিখিত হইল। পুস্তকের শেষ ফর্ম্মা যখন মুদিত হইতেছিল, এ লোকের নরসেবা হইতে উচ্চতর লোকে উচ্চতর সেবার জন্য বিধাতা ক্যাথারিনকে তুলিয়া লইলেন। উইলিয়ম সেই অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিতা নারীর পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া আরও অগ্নিময় হইয়া নরসেবায় মাতিয়া গেলেন। সে পুস্তকের সমগ্র ভাব ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কি দেওয়া যাইতে পারে? পুস্তকের প্রধানতঃ দুটি বিভাগ :—

১। অন্ধকার,

২। মুক্তি,

অন্ধকার :—সমাজের দশম ভাগ (submerged tenth) পাপ ও দারিদ্র্য সাগরে মগ্ন। গৃহহীন, কর্ম্মহীন শ্রমজীবী পাপের ও ক্ষুধার উত্তেজনায় আত্মঘাতী, ব্যভিচারী ও অপরাধী—এরা কি সমাজের অন্ধকারতম ছবি নয়? অন্ধকারতম ইংলণ্ডের কি ঘোর কালিমাময় চিত্র সেনাপতি আঁকিয়াছেন, পড়িলে রোমাঞ্চ হয়।

মুক্তি!—১। City Colony ;—নগরোপনিবেশ। নগরের ভিতর এদের জন্য বহু অনুষ্ঠান (Institutions) রচিত যেখানে এদের দেহ মনের সেবা হইতে পারে।

লণ্ডনের দারুণ শীতে দরিদ্র কাঁপিতেছে, গভীর রাত্রে মুক্তিসেনার কর্ম্মচারী-বর্গ লণ্ঠন ধরিয়া ধরিয়া তাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া আশ্রয় দিতেছে। জেলখানা হইতে কয়েদী খালাস পাইয়েছে, সেখানে মুক্তিসেনার কর্ম্মচারী তাকে সাদরে লইয়া আসিতেছে। ঘোর ব্যভিচারী মদ্যপায়ী নরনারী মোহ ও আসক্তিতে ডুবিয়া রহিয়াছে, এই Blood and Fire মটো যুক্ত লালজামা পরিহিত মুক্তিসেনার কর্ম্মচারী তাকে ধরিয়া তুলিতেছে, আশ্রয় ও কর্ম্ম জুটাইয়া দিতেছে, তার দেহ ও মনের সেবা করিয়া সৎপথে ধর্ম্মপথে আনিতেছে। ধন্য এ প্রেমব্রত, ধন্য এ নরসেবা!

২। Farm Colony :—কৃষি উপনিবেশ। এঁরা নগরের নিকট সহস্র সহস্র একার (acre) জমি লইয়া এই সব দুর্ব্বৃত্তদিগকে কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া জীবন ফিরাইতে পারিয়াছেন। যাহারা নগরের বহু জনতার মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করিয়া দেহ মনের ক্ষয় করিতেছিল, তাহাদের জন্য কৃষিক্ষেত্রের মুক্তবায়ু কত প্রয়োজন, কত কল্যাণের আকর। এখানে অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, নগরের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করা, উদ্যানজাত শাকসব্জি ও ফল মূলাদি উৎপাদন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করন এবং পশু পক্ষী পালন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানেও মূলমন্ত্র সেই বাধ্যতা। বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা দেখেন যাহাতে পরস্পরে সেবা ও সাহায্যে, কুশলে ও স্বচ্ছন্দে, নীতিতে ও ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। এখানে মদ্য প্রবেশ নিষেধ।

৩। Oversea Colony :—সমুদ্রের পরপারের উপনিবেশ। দেশের বহু জনতা সকল উন্নতির পরিপন্থী। এই জন্য যে সব দেশে প্রচুর পতিত জমি

আছে সেই সব দেশে সেই সব ভূমি চাষের জন্য এই সব লোককে লাগাইয়া এঁরা সে দেশের কল্যাণ, এই সব লোকেরও কল্যাণ করিয়াছেন। এখানকার কার্য্যপ্রণালী কৃষি উপনিবেশের অনুরূপ। সেই পরস্পর সাহায্য ও সেবা, সেই শিল্পজাত ও কৃষিদ্রব্যাদি উৎপাদন, সেই আদর্শ পল্লী ও পরিবারগঠন, সেই বাধ্যতা ও নীতির দ্বারা ঈশার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়।

তাঁদের পরিবারের কথা কি বলিব? সে পরিবার নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়;—৪টি ছেলে, ৩টি মেয়ে; আশ্চর্য্য কথা এই সব কয়টিই মুক্তিসেনার কর্ম্মচারী, সব কয়টিই ধর্ম্মপথে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। মাতা ক্যাথারিন সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান দিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন:—"বরং বিনষ্ট হইও তবু নিজের জন্য কখনও অর্থোপার্জ্জন করিও না।" এই মহাশিক্ষার ফলে পরিবারটি ধর্ম্মের পরিবার, ত্যাগী পরিবার হইয়াছে। পৃথিবীর কোন মহাজনের এ সৌভাগ্য হইয়াছে?

বৈরাগ্য ব্রতধারী এই দল ভারতে আসিতেছেন শুনিয়া ১৮৮২ সালে আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন "আমাদের ·দের চিহ্নিত ব'লে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত ব'লে মানিতে হইবে।" "এবার আমাদের গুরু শিক্ষক আসিবে।" যখন এইদল বোম্বাই সহরের পথে সঙ্কীর্ত্তন করার অপরাধে খ্রীষ্টান গভর্ণমেণ্টের দ্বারা কারারুদ্ধ হন, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কি ব্যথা পাইয়া কি আন্দোলন করিয়াছিলেন, ইঁহারাও তাহা জানেন আমরাও তাহা জানি। মহৎই মহৎকে চিনে, মহত্তের সম্মান জানে।

সেনাপতি বুথ ও তাঁর সহধর্ম্মিণী এ যুগের মহাদৃষ্টান্ত। এঁরা ঈশার উপযুক্ত শিষ্য। নরসেবার জন্য এঁদের নিকট আমাদের নব দীক্ষা লইতে হইবে। মানুষ যে মানুষ, সে যে আমার ভাই বোন। আমি কে যে তাকে তুচ্ছ করি? তার ভিতরে যে ব্রহ্ম পুত্র ঈশা বাস করেন। বাহিরে একটা আবরণ বইত নয়। একটু সেবা ও সহানুভূতি, একটু হাতখানা বাড়ায়ে দেওয়া, একটু পথ দেখায়ে দেওয়া, একটু ভালবাসা ঢেলে দেওয়া আর অমনি সেই ব্রহ্ম পুত্রের প্রকাশ। এই মহা সঙ্কেত বুথ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আমরা কি এই প্রত্যানিই জীবনের এ মহা শিক্ষা ভুলিতে পারিব? বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন এ জীবন যেন আমাদের মধ্যে সুফল প্রসব করে।

গড়নের সময়।

এখন গড়নের সময়—হাতে কলমে গড়নের সময়। উপদেশ দান বা সংহিতা পাঠের সময় অতীত যুগের ব্যাপার। উপদেশ পাইয়াছ, সংহিতা পাঠ করিয়াছ, এখন গড়িতে থাক। যাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে, যাঁহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে, এখন কেবল তাঁহাদিগকে লইয়া চলিলে হইবে না। এখন সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা

পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এখন সমাজ বলিতে বিস্তৃত মানব সমাজকে বুঝিতে হইবে; সমাজের জন্য কিছু করিতে হইলে, অতি ক্ষুদ্রতমকেও গণনার মধ্যে রাখিতে হইবে। এই জন্যই এখন উপদেশ দান বা সংহিতা পাঠের সময় নয়—গড়নের সময়। প্রতিজনকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া নূতন মানব সমাজ গড়িতে হইবে। এই গড়নের কার্য্যে যেমন পুরুষের তেমনি মহিলাদিগেরও রক্ত মাংস দান করিতে হইবে।

প্রভুর কন্যা, তুমি এক ভগ্নীর বাড়ীতে যাইয়া দেখিলে ঘরটী ভয়ানক নোঙ্‌রা—আবর্জ্জনায় পূর্ণ, এদিক ওদিকে জিনিস পত্রগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বাড়ী আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য ভগ্নীদিগকে কিম্বা অন্যকে বলিয়া সেই ভগ্নীর দোষ কীর্ত্তন করিলে, মনে রাখিও এযুগে ওরূপ বলায় তোমার মহা অপরাধ হইল। তুমি যদি সেই ভগ্নীকে তাহার ঘরের কোথায় কি করিতে হইবে উপদেশ দিয়া আস, তাহা হইলেও তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইল না। তোমাকে ঝাঁটা হাতে লইয়া ভগ্নীর সে ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে, যেখানে যে জিনিস রাখিলে ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়ে, পছন্দমত হয়, সেখানে সে জিনিসটি তোমাকে নিজ হাতে রাখিতে হইবে। সে ভগ্নীকে তোমার সাহায্যকারিণী পাইলেতো উত্তম কাজ হইল। তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম হইল, কর্ম্মও হইল, দুর্ব্বলা ভগ্নীকে হাতে ধরিয়া উঠাইলে। অপর কোন ভগ্নীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার ছেলে মেয়েদিগকে নোঙ্‌রা দেখিয়া ঘৃণা ও দুঃখ করিলে চলিবে না। উপদেশ দিয়া আসিলেও তোমার কর্ত্তব্য হইল না। নিজহাতে গামছা বা তোয়ালে লইয়া তোমাকে সে ছেলে মেয়েগুলিকে দিব্য ফুলের মত করিয়া দিয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম হইল, ভগ্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনও হইল এবং হাতে কলমে উপদেশও হইল।

এখন বোধ হয়, গড়নের কথাটা বুঝতে পেরেছ। আর একটী উদাহরণ দিই—কোন ভগ্নীকে বড় অবসন্না ও বিষণ্ণা দেখিলে। তোমার মনে হলো তাহার বিষাদ ও অবসাদ লইয়া থাকা অন্যায়। তুমি সে বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিয়া তাহার দুঃখ কষ্ট বাড়াইও না। উপদেশ দিলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইবে, দুঃখ যন্ত্রণার বোঝাটা আরো বাড়িবে। তুমি তাহার নিকটে বসিয়া ভগবানের দয়ার কথা বল, মধুর সঙ্গীত কর, সরল ভাবে প্রার্থনা কর। তোমার সে দুঃস্থা ভগ্নী শান্তি ও আরাম লাভ করিবেন।

যে ভগ্নীর বাড়ীতে যাইয়া যে অভাব ত্রুটী দেখিবে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শোভা সৌন্দর্য্য, শান্তি আনন্দ ও আরাম সে ভগ্নীর পরিবারে ছড়াইয়া আসিবে। এই গড়নের যুগে তোমাকে সব গড়িয়া দিয়া আসিতে হইবে। কেবল উপদেশ বা ব্যবস্থা দিয়া আসিলে কিছুই হইল না। বরং সেরূপ

করিলে তোমার মনেও অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে।

এই যুগ গড়নের যুগ। এই যুগের ধর্ম্মবীর সকল স্বর্গরাজ্য গড়িবেন। সব প্রতিবেশীদিগকে ফুলের মত সুন্দর করিয়া তুলিবেন। তোমার দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া লও, ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা কর। তুমি যত কেন সামান্য ও ক্ষুদ্র না হও, তোমার সে সামান্য শক্তিটুকুও যদি স্বর্গরাজ্য গড়নে ভগবান্ ব্যবহার করেন, সে তোমার পরম সৌভাগ্য।

কিরূপে এই গড়নের ব্যাপার ভগবান্ সম্পাদন করিতে দেন, মুক্তিফৌজের কার্য্যে তাহা অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। মুক্তিফৌজের নেতা জেনারেল বুথ দলে বলে ৩০ বৎসর এই গড়নের কার্য্য করিয়া ৮৪ বৎসর বয়সে সেদিন পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এই মুক্তিফৌজের দল গঠন করিয়া গিয়াছেন। চোর ডাকাত মদ্যপায়ী ব্যভিচারীদিগকে ভদ্রসমাজের লোক করা, অজ্ঞানী অলস অকর্ম্মণ্যদিগকে সমাজের শক্তি করিয়া দণ্ডায়মান করা, সর্ব্বথা সমাজের পতিত ও অকর্ম্মণ্য অংশে জীবন সঞ্চার করিয়া মানবসমাজকে উন্নত করা ইঁহাদের জীবনের ব্রত। ইঁহারা স্বহস্তে ও নিজের অর্থে এই গড়নের কার্য্য করিতেছেন। কত লক্ষ লক্ষ লোককে ইঁহারা ভাল করিয়া মানবসমাজের অবসন্ন অঙ্গকে সবল করিয়াছেন। ইঁহারা পতিত ও দুঃখীদিগকে বড় ভালবাসেন, তাই তাঁহাদের দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন না। রাজশাসনে যাহা পারে নাই, ইঁহারা ভালবাসিয়া তাহা করিয়াছেন। মানবসমাজকে ভাল করিবেন এই তাঁহাদের পণ। ইঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম, অর্থব্যয় সর্ব্বোপরি ভালবাসা জগতে নূতন সমাজ, পবিত্র সমাজ, গঠন করিতেছে।

যে ভালবাসা পৃথিবীকে নূতন পৃথিবী করিতে বসিয়াছে, জেনেরাল বুথের সেই ভালবাসায় একবার জীবন ঢালিয়া দাও, তোমার সর্ব্বপ্রকার হৃদয়ের ভার দূর হইবে। তুমিও এই গড়নের কার্য্যে অন্ততঃ ২।৪টী ধূলিকণা দান করিয়া সুখী হইতে পারিবে। জেনেরাল বুথের ভালবাসা ও কার্য্যশক্তি, তিনি আপনিই বলিয়াছেন, যিশুর রক্ত মাংসের অংশ। যিশুর রক্ত মাংস যিনি রচনা করিয়াছেন, জগতের সেই পিতা মাতার ভালবাসা কত—প্রত্যেক পুত্র কন্যার উদ্ধারের জন্য তাঁহার যত্ন চেষ্টা কত! একবার তদ্গতভাবে বুঝিয়া লও। সেই পতিতপাবনের ভালবাসার এক কণিকা পান করিয়া তাঁহার গড়নের কার্য্যে লাগিয়া যাও। তুমিও সেই মুক্তিফৌজের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গৌরব করিবে, এবং মানবসমাজকে উন্নত করিবার জন্য ভগবানের কত ব্যস্ততা বুঝিতে পারিবে। এই গড়নের সময়ে কেবল দোষ ত্রুটী দেখাইয়া, কেবল উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়া তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন হইবে না, তোমাকে কিছু না কিছু গড়িয়া দেখাইতে হইবে। ধর্ম্মে নীতিতে চরিত্রে গৃহে পরিবারে সমাজে

কিছু কিছু গড়িয়া সকলকে যাইতে হইবে। এইজন্য এই যুগ বা সময় গড়নের সময়।

এক এক যুগে এক একটা নতন তত্ত্ব আসে। উপদেশের ও ব্যবস্থার যুগ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সেই যুগে সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম ছিল। এই যুগের নূতন তত্ত্ব হাতে কলমে সকলকে শিখাইয়া নূতন পৃথিবী করিতে হইবে। এখন অজ্ঞানীকে জ্ঞানী ও অসাধকে সাধু করিতেই হইবে। এইজন্য দায়িত্ব ভার লইয়া প্রত্যেককে আপন আপন কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ভগবানের পূজা, সাধু-সেবার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল ভাই বোনদিগকে হাতে ধরিয়া তোলা এই যুগের পরম ধর্ম্ম। বরং ভগবানের পূজা ও সাধুসেবা পণ্ড হইবে, যদি তুমি দুর্ব্বল-দিগকে ধরিয়া তুলিতে আপনার শরীর মন ও অর্থ বিনিয়োগ করিয়া না থাক। এই যুগের ইহাই যুগধর্ম্ম।

নিবেদন।

যদি ও হে দেব! জানিছ সকলি
নাহি কিছু কহিবার,
তবু সাধ যায় নিবেদিতে কত
ও চরণে অনিবার।
দাও প্রভো! দাও টুটিয়া আমার
মোহের বাঁধন চয়,
হৃদয় মাঝারে অসার কামনা
যেন নাথ! নাহি রয়।
এ ভবের ঘোর প্রলোভন ফাঁদে
করোনা মুগধ চিত,
দুরবল হিয়া চলিতে সংসারে
পদে পদে সদা ভীত।
কোটি ঝঞ্ঝাবাতে রহিয়া নির্ভীক
অটল হিমাদ্রি হেন,
বিষাদ বেদনা সহিতে ধরার
পাই গো শকতি যেন।
প্রতিদান যশে না হয়ে প্রয়াসী
যেন হে কুসুম প্রায়,
নীরবে সাধিয়া সাধনা আপন
বিজনে জীবন যায়।
আর এই নাথ! কর আশীর্ব্বাদ
জীবনে মরণে আমি,
তিলেক কখনো হারায়ে তোমারে
না রহি—যেন গো স্বামী।

চট্টগ্রাম শ্রী হেমন্ত বালা দত্ত

নারীর কার্য্য।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

ভারতের সর্ব্বত্রই নারীদিগের মধ্যে উদ্দীপনার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ১০ বৎসর পূর্ব্বে নারীশক্তি গৃহকার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত। নারীগণ আপনার ও আপনার আত্মীয় স্বজনের সেবা ভিন্ন পরহিতৈষণার চিন্তা করিতে পারিতেন না। আজ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কলিকাতার মহিলা শিল্পসমিতি, মহিলা পরিষদ, ভারত মহিলা সমিতি, সঙ্গীত সঙ্ঘ, সঙ্গীত সম্মিলনী, ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়, অনিন্দ সভা প্রভৃতি

কেবল মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। আমরা নারীদের এই সকল সৎকার্য্যের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব অদ্য ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বি, এ, 'ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে একটী নারী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রী জাতির স্থায়ী উন্নতি সাধন ইহার উদ্দেশ্য। এই কয় বৎসরে ভারতবর্ষের অনেক প্রধান প্রধান সহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছে। লাহোর, করাচী, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, মেদিনীপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাহোর, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে অন্তঃপুর শিক্ষার কাজ চলিতেছে, আর অসহায়া বিধবাদের দ্বারা নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পুরনারী নির্ব্বাহ-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে।

গত ২০এ শ্রাবণ কলিকাতায় মেরী কার্পেণ্টার হলে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতির ষাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৪০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার অনেক হিন্দু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা উহাতে যোগ দিয়াছিলেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কারণ পূর্ব্বে যে সকল সভাসমিতি হইত, তাহাতে শিক্ষিতা ও ব্রাহ্ম মহিলারাই অধিকাংশ স্থলে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্যে অনেক হিন্দু মহিলাও উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন। কলিকাতার শাখা সমিতি এই দেড় বৎসর মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই প্রায় ৬০০ জন মেম্বর হইয়াছেন। সাধারণ মেম্বরদের বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা মাত্র; মুখ্য মেম্বরদের বার্ষিক চাঁদা ১০৲ দশ টাকা। কলিকাতায় প্রথমে ৬জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১৮টী বয়স্থা অন্তঃপুরবাসিনীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, এখন এই সমিতি হইতে ২০ জন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ৭০টী পরিবারের ১২৫টী বয়স্থা বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় স্ত্রীজাতির সমবেত চেষ্টার কাজ এই প্রথম, ইহার এত দ্রুত উন্নতি দেখিয়া আমরা আশাতীত আনন্দিত হইয়াছি। এই ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের উদ্যোগে বহুবাজারে ১৪নং শ্রীনাথ দাসের লেনস্থ ভবনে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহাতে উপস্থিত এখন ৩০টী বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।

এতদিন দেশে অনেক শিক্ষিতা মহিলা থাকিলেও তাঁহারা নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগের সুবিধা বা ক্ষেত্র পান নাই; এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল তাঁহাদের সেই অন্তর্নিহিত শক্তি একত্র করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন ও দেশের কল্যাণ সাধন করিবে, এই আমাদের আশা ও প্রার্থনা।

সঞ্জীবনী।

৺স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের
অনুগামী, নববিধানে এস্‌লামধর্ম্মের
ব্যাখ্যাতা পরলোকগত
গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের
মৃত্যু-দিন উপলক্ষে লিখিত।

দেব! ১

শ্রাবণের শেষ দিনে ঘন বরষায়
ধরা হতে চিরতরে নিয়েছ বিদায়
একে একে দিনগুলি
ধীরে ধীরে গেলচলি
বরষ ফিরিয়া এবে এল পুনরায়
তব স্মৃতি হৃদি মাঝে জাগিছে সদায়

২

ত্যজিয়া সংসার তুমি নবীন যৌবনে
জীবন সঁপিয়া দিলে বিভুর চরণে
ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী হয়ে
প্রেমভক্তি ফুল দিয়ে
বিবেক বৈরাগ্য সূত্রে গাঁথি সযতনে
মনোরম প্রীতিমাল্য পরিলে আপনে

৩

সাধিতে আপন কাজ করুণা করিয়া
দয়াময় হরি তোমা দিল পাঠাইয়া
তাঁর কাজ শেষ করি
নরদেহ পরিহরি
প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, হৃদি মাঝে নিয়া
সে অমর ধামে তুমি গেলে গো চলিয়া।

৪

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে প্রচার
কেশবে পাঠালে হরি ধরার মাঝার
প্রেম ভক্তি পুণ্য দিয়ে
পবিত্রতা মিশাইয়ে
প্রেমানন্দ মহানীরে ডুবি নিরন্তর
কেশব চন্দ্রের হল নির্ম্মল অন্তর

৫

কেশবের অনুগামী যত সাধুজন
নব বিধানে তাদের হইল মিলন
তুমিও তথায় যেয়ে
মনোমত সাথী পেয়ে
অঘোর প্রতাপ আদি মহাজনগণ
হইলে গো একেবারে পুলকে মগন।

৬

ব্রহ্মানন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম করিতে প্রচার
অঘোর নাথেরে দিল সে কাজের ভার
প্রেরিত প্রতাপ পতি
আদেশিল মহামতি
ব্যাখ্যানিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম ধরার উপর
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে সত্বর

৭

আর্য্য ধর্ম্মের মহত্ব করিতে ব্যাখ্যান
দিলেন কেশব গৌরে অনুমতি দান
গীতা ভাগবত হতে
নানাবিধ যতনেতে
মথিয়া ধর্ম্মের সার করি সযতন
প্রচার করিলা তিনি শ্রীনব বিধান

তোমায় এসলাম ধর্ম্ম করিতে ব্যাখ্যান
করিলেন ব্রহ্মানন্দ আদেশ প্রদান
সাধিতে আপন কাজ
কিছু না করিয়া ব্যাজ
মনের আনন্দে তুমি খাটি অহর্নিশ
লিখিলে তাপসমালা কোরাণ হদিস

৯

মোসলমান ধর্ম্ম তুমি করিয়া জ্ঞাপন
সাধিলে জগতে এক অশেষ কল্যাণ
ভারতের হিন্দুজাতি
যে ধর্ম্মের গূঢ় নীতি
না জানি আঁধারে মগ্ন ছিল নিশিদিন
তুমিই করিলে তায় আলোক প্রদান

১০

পরহিতে চিরদিন যাপিয়া জীবন
সাধিলে বিশেষ রূপে নারীর কল্যাণ
তাদের হিতের তরে
কতই যতন করে
লিখেছ প্রবন্ধ কত মধুর বচন
ভুলিবনা তব বাণী জীবনে কখন

১১

আর্য্য ঋষিদের ন্যায় যাপিয়া জীবন
যোগে মগ্ন হয়ে স্বর্গে করিলে গমন
তব কাজ শেষ করি
এই দেহ পরিহরি
গিয়েছ অমর লোকে ত্যজিয়া ভুবন
(চিরদিন) তোমাহৃদে রাখি দেব করিব পূজন

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

পূর্ব্বেরন্যায় গ্রীষ্মের ছুটীর পরও ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের মহিলাদের জন্য প্রতিশনিবার একটি করিয়া বক্তৃতা হইতেছে। শ্রদ্ধেয় প্রমথ লাল সেন "দ্বিতীয় বারের বিলাত যাত্রা" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি সেখানে মেয়েরা কি রকম কাজ করিতেছেন, এবং মেয়েরা বড় বড় কাজে যোগ দিয়া কেমন সুন্দর রূপে কাজ চালাইতেছেন সেই সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। আমাদের দেশে একটু একটু আরম্ভ হয়েছে, যেমন স্কুল ইত্যাদি ; কিন্তু আরও অনেক কাজ আছে যাহা এখন মেয়েদের নিজেদের করা উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র বসু মহাশয় Kindergarten সম্বন্ধে ছুটির আগে তিনটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ছুটীর পর আরও তিনটী দিয়াছেন সেই বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত সার এই—(ক) কিণ্ডার গার্টেনের ইতিহাস ; ফ্রোবেলের জীবনী এবং তাঁহার শিক্ষার মত ও প্রণালী।

(খ) খেলারছলে শিক্ষা—

(গ) গৃহে শিশুশিক্ষা কেমন করিয়া আরম্ভ করিতে হয়

(ঘ) কেমন করিয়া শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হয়

(ঙ) শিশুর মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ ও তাহার প্রণালী—

(চ) শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ১২-বৎসর পর্য্যন্ত তথায় কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত জননী-গণের এই সময়ে কিরূপ সাহায্য করা প্রয়োজন।

আগষ্ট মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় "আমরা কি খাই" (ঐতিহাসিক) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

বক্তারা তাঁহাদের অন্যান্য অনেক কাজ সত্ত্বেও স্কুলের জন্য যত্ন পরিশ্রম করিয়া থাকেন, মেয়েরা যদি আগ্রহ করিয়া শুনিয়া সেই মত কাজ করতে আরম্ভ করেন তাহা

হইলে তাহাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। দুঃখের বিষয় এত সুযোগ থাকিতেও অনেকেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন না। অবশ্য বিকাল বেলা একেবারে ৩ ঘণ্টা বাহিরে থাকিতে অনেকের সুবিধা হয় না। বক্তৃতা এক ঘণ্টা হইলেও আসিতে যাইতে সময় সময় ৩ ঘণ্টার উপরও হইয়া যায়। কিন্তু সপ্তায় একটী দিন ইচ্ছা করিলে কি সংসারের ব্যবস্থা করিয়া বাহির হওয়া যায় না, বাহির হওয়া কি খুব দরকার নয়? আর একটি নিবেদন মহিলাদের কাছে যে তাঁহারা যেন গাড়ী অনেকক্ষণ করিয়া দাঁড় করাইয়া না রাখেন তাহাতে অন্যান্য সকলেরই ক্ষতি হয়। যাঁহাদের বাড়ীতে গাড়ী আছে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজেরা আসিলে তো তাঁহাদের সময় বাঁচে এবং স্কুলেরও উপকার হয়। যেমন করিয়াই হোক শিখিবার এই সুযোগগুলি যেন বৃথায় না যায় তাহার চেষ্টা সকলেরই করিলে ভাল হয় না কি?

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্য সকলের অন্তর্গত ওয়াশিংটন নগরে এক ব্যক্তি একটি ডাকবহন যন্ত্র (পেটেন্ট) একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এই যন্ত্রের যোগে ইস্পাত নির্ম্মিত চাকাশূন্য গাড়ী বায়ুপথে ঘণ্টায় পাঁচশত মাইল যাইতে পারিবে। চুম্বকের আকর্ষণ পরীক্ষা করিতে যে তদ্বিপরীত একটী শক্তির প্রকাশ হয় তাহার যথাযথ ব্যবহার দ্বারাই এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে। নিউইয়র্কের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়র এমেল বেকেলেট এই যন্ত্রের আবিষ্কারক। পরীক্ষার সফলতা প্রদর্শনের জন্য একটি ক্ষুদ্র আকারের যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই নমুনা যন্ত্রটি সহজে সকলেই বুঝিতে পারে। ইহা দ্বারা ডাকের চিঠিপত্র ঘণ্টায় তিনশত মাইল যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গাড়ী চালাইলে বায়ুপথে চলিবে, অন্যথা স্থির হইয়া বায়ুতে ভাসিয়া থাকিবে। কখনও ভূমিতে পড়িয়া যাইবে না। ইঞ্জিনিয়ার বেকেলেট তাড়িত ও চুম্বক আকর্ষণের কার্য্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইতেন যে যদিও প্রায় সমস্ত ধাতু চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এলিউমিনিয়ম ধাতু চুম্বকের শক্তি দ্বারা দূরে নিক্ষেপিত হয়। বেকেলেট পরীক্ষার জন্য ৬ইঞ্চ লম্বা ৬ইঞ্চ চওড়া ও অৰ্দ্ধ ইঞ্চ পুরু একখানি এলিউমিনিয়াম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা চুম্বকশক্তিপূর্ণ কতকগুলি জড়ান তারের উপর স্থাপন করেন তাহাতে গুরুভার ধাতুখণ্ড তৎক্ষণাৎ কতক দূর উর্দ্ধে উঠে এবং সেখানেই থাকিয়া যায়। চুম্বকশক্তি যত বাড়ান হয়, ধাতু খণ্ড তত উর্দ্ধে উঠে এবং চুম্বকশক্তি বন্ধ করিয়া দিলে, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ভূপতিত হয়। এই দ্রব্যগুণের জ্ঞান লাভ করিয়া বেকেলেট উপরি উক্ত যন্ত্রটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩১৯। অক্টোবর, ১৯১২। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে আনন্দময়ী জননী, তুমি সকল মঙ্গলাশীর্ব্বাদ লইয়া প্রত্যেক নর নারীর সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছ এবং প্রত্যেক পরিবারে বিরাজ করিতেছ, একথা তোমার সাধু ভক্ত সন্তানগণ জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন এবং তুমি বিশেষ কৃপা করিয়া আমাদের মত পাপী অধম সন্তানকেও নিজমুখে বলিয়াছ। আমরা তাই বলিতে শিখিয়াছি, আমরা আমাদের পরম জননীর ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিয়া এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। কিন্তু দেখ, সর্ব্বদর্শী দেবতা, আমরা এখনও মোহ মায়া, স্বার্থ ও অহঙ্কার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, আমাদের জীবনে ও পরিবারে তোমাকে স্থান দান করি নাই, ও বিপদ পরীক্ষার সময় তোমার মঙ্গলপ্রদ অভয় চরণ স্পর্শ করিতে পারি না। আমরা এখন বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিতেছি যে আমরা যত বড় বড় কথা বলি না কেন, আমাদের প্রকৃত অবস্থা অতি হীন; আমরা সপরিবারে তোমার পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম বিশ্বাস করি, একথা কেবল মুখের কথা মাত্র— ইহাতে আমাদের কোন উপকার হইতেছে না, জগতের ও উপকার হইতেছে না। তুমি কৃপা করিয়া যে বিশ্বাসধনের সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছ তাহা এখন না পাইলে আমাদের কিছুতেই চলে না। প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ জীবনে ও পরিবারে কত নিশ্চিন্তভাব, কত শান্তি, কত সুখ, তাহা চিন্তা করিয়া তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি তুমি তোমার প্রত্যেক কন্যাকে ও প্রত্যেক পুত্রকে আত্মপরিচয় দেও, এবং তোমার অনুগত করিয়া লও যে তাঁহারা তোমার মঙ্গল ক্রোড়স্পর্শ অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে করিতে তোমার আনন্দরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। হে

কৃপাময়, তুমি নিজ কৃপায় তোমার কন্যাগণকে ও পুত্রগণকে যে ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বাভাস দান করিয়াছ, কৃপা করিয়া এখন সকলকে সেই রাজ্যে লইয়া যাইয়া কৃতার্থ কর এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

বঙ্গদেশে নারীজাতির অবস্থা।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে মহিলাকুলে দুই প্রকার মহিলা দৃষ্টিপথে পতিত হন। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের আদর্শানুসারে বি এ, এম এ, এবং ইণ্টারমিডিয়েট ও এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহারা মাইনর ছাত্রবৃত্তি কি তন্নিম্নবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন প্রৌঢ়াবস্থা, যুবতী ও বালিকার সহিত অনেক সময়ে সাক্ষাৎ হয়। আবার ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অদ্যাপি অক্ষরজ্ঞানশূন্য রমণীর লোপ পায় নাই। এরূপ বিদ্যাশূন্য নারীগণের অনেকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধারণ জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, সূপকারের কার্য্যে নিপুণতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য ও মনের তেজ দেখিয়া তেমন্ পণ্ডিত লোকও তাঁহাদিগের নিকট নতশির হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে উক্ত দুই শ্রেণী ভিন্ন আরও এক শ্রেণীর রমণী আছেন যাঁহারা আত্মচেষ্টাতে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া সর্ব্বদা অবসরকাল গ্রন্থপাঠে যাপন করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও পাঠানুরাগ যেমন অদ্ভুত, স্মৃতিশক্তিও তেমনি আশ্চর্য্য। তাঁহারা কিছু লেখা পড়া জানেন বলিয়া প্রায় কেহ জানে না; অথচ তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে বুঝিতে হয় যে তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের প্রচারিত জ্ঞানের অনেক তত্ত্ব হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেরই প্রশংসাস্পদ এবং শ্রদ্ধাস্পদ। জ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানতৃষ্ণার দ্বারা সার্থকতা প্রাপ্ত হয়, তবে উহাঁদের জীবনে তাহা সফল হইয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ অতি সুন্দর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহবা সুন্দর সুন্দর কবিতাও রচনা করিয়া থাকেন।

রীতিমত যে সকল ললনা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করেন, বলিতে দুঃখ হয় যে, তাঁহাদের অনেকে অধ্যয়ন বা সচ্চিন্তায় তেমন অনুরাগ প্রকাশ করেন না। এমন শিক্ষিতা জননীও দেখা যায় যিনি আপন সন্তানের সুশিক্ষা বিধানে অল্পমাত্র আয়াসও স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের সন্তানগণও শিক্ষার প্রতি তেমন অনুরাগী নহে। মাতা শিক্ষিতা হইলেই সন্তান যে সুশিক্ষিতা হইবে একথা ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া কে স্বীকার করিবে? অথচ অক্ষর জ্ঞানশূন্য মূর্খ অথচ কর্ম্মদক্ষ তেজস্বিনী অনেক বঙ্গমহিলার সন্তানগণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে নাগরিক জীবনে অনেকের স্পৃহা লক্ষিত হইত না। ব্যবসায়ীলোকদিগের অনেকে নগরে বাস করিত। যাঁহারা বিত্তশালী

সারী, তাঁহাদের বাস গ্রামে ছিল। গ্রাম্য জীবন তাঁহারা পছন্দ করিতেন। গ্রামস্থ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি ছিল। নানা বিষয়ে পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। গ্রামবাসিনী অনেক সন্তানহীন বিধবা নানারূপে অপরের সেবা করিয়া সুখী হইত। অনেক বিধবা এইরূপে সেবাব্রতে জীবন সফল করিত। যে উৎকৃষ্ট পাচিকা সে নানাবাড়ীতে পাককর্ম্মে শরীর খাটাইয়া যেমন অপরকে তেমন নিজেকে সুখী করিত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি একটী ভদ্রকুলের বিধবা মহিলা অকাতরে নিজে অনাহারে থাকিয়া ও রোগীর সেবা শুশ্রূষা সুন্দররূপে করিতে পারিতেন। যে কোন গৃহে যে কেহ কঠিন রোগগ্রস্ত হইত তিনি সংবাদ পাইবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইতেন এবং সুস্থতা লাভ পর্য্যন্ত সেই রোগীর সেবায় রত থাকিতেন।

কোন মহিলা স্বভাবতঃ ধাত্রীকার্য্যে পটুতা লাভ করিয়াছেন। আমরা ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে এরূপ মহিলা দেখিয়াছি। গ্রামে যে কোন গৃহে কোন প্রসূতির প্রসবকাল উপস্থিত হইত, তিনি সংবাদ পাইলে তথায় উপস্থিত হইয়া নিরাপদে প্রসব করাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নবতী হইতেন। অথচ ইহা তাঁহার ব্যবসায় নহে, অথবা ইহাদ্বারা তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতেন না। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ নিঃস্বার্থ সেবার লালসা যদি নরনারীগণের জীবনে আধিপত্য বিস্তার না করে তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক সফল হইল একথা কি বলা যায়?

ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ ক্লেশস্বীকারের গুণ বঙ্গদেশে রমণী সমাজেই বিশেষরূপে দেখা যাইত। অদ্যাবধি ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পরন্তু বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও আস্থা যদি বলবতী না থাকে তবে লোকে শিক্ষার প্রভাবকে নাস্তিকতার প্রভাববৎ বোধ করিবে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে Science advancing, God retreating অর্থাৎ বিজ্ঞানের যত উন্নতি ঈশ্বরের তত বিলুপ্তি, এদেশে কি নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠার বিলুপ্তি হইবে?

আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের সংযোগ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আমাদের দেশে রমণীসমাজে ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন মহিলাকুলের বিদ্যাহীনতার মধ্যে যেরূপ মহৎ গুণ সকল প্রকাশ পাইত, অধুনা বিদ্যালাভনিবন্ধন যদি তৎপ্রতি উপেক্ষা জন্য তাহা মহিলাচরিত্রে স্থান প্রাপ্ত না হয় তবে আমরা কি সমূহ ক্ষতি বোধ করিব না? কৃষক যখন আপনার ক্ষেত্রজ শস্যের সহিত ঘাসবৃদ্ধি দেখে তখন সাবধানে ঘাসরাশি উন্মূলিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে এবং শস্য বর্দ্ধিত হইতে দেয়। সেইরূপ উদয়ীমান নবীন মহিলাকুলে যাহা দোষ তাহা পরিহারপূর্ব্বক বিদ্যার সহিত সদ্গুণরাশি পরিবর্দ্ধিত হইতে দিতে হইবে। একারণে বর্ত্তমান বঙ্গীয় নারীসমাজে দোষ গুণের

আলোচনা এবং গুণের আদর করিতে হইবে। যে সকল গুণ ও সততা প্রাচীন মহিলাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইত সে সকল গুণ নবীনাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে যাহাতে উপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ যত্ন করা কি কর্ত্তব্য নহে?

জেনারেল বুথ।

আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জেনারেল বুথের জীবনালোক আমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অপসারিত হইয়াছে। সে জীবনের আলোক কত নিরাশ, ভগ্ন. আশ্রয়শূন্য জীবনতরীকে পথ দেখাইয়া মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছে! জেনারেল বুথের জীবনকাহিনী আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক বৃহৎ সংগ্রামের কাহিনী। সে সংগ্রামের প্রাচীন অস্ত্র প্রেম। তাঁহার বিশাল উদার বিশ্বাসী হৃদয় মানব সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত প্রেমের ধারায় বিগলিত হইয়া সকলকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছে। বার্দ্ধক্যেও তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই; গির্জ্জায়, পথে, গৃহের বারান্দায় যখনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে জনমণ্ডলীকে পরিত্রাণের সংবাদ দান করিয়াছেন ও আশ্চর্য্য শক্তিতে সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শুভ্র কেশ ও কুঞ্চিত ললাটের নিম্নে যৌবনের উৎসাহে দীপ্ত নয়নদ্বয় অন্তরের কি গভীর ভাবে প্রতিভাত হইত! তাঁহার দীর্ঘ দেহ বার্দ্ধক্যেও অন্তরের সরল বিশ্বাসে যুবকের ন্যায় সবল ও শক্তিশালী ছিল। জীবনের যে মহৎ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহার দেহ, মন, আত্মা, তিনই তাহার উপযোগী ছিল। যে পতিতোদ্ধার-ব্রত মুক্তিফৌজ (Salvation army) গ্রহণ করিয়াছিলেন জেনারেল বুথ তাহার স্বভাবতঃ মনোনীত নায়ক ছিলেন। যে প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া একদিন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তির তরঙ্গে ভাসাইয়াছিলেন, যে প্রেমের আবেগে তিনি অত্যাচার সহ্য করিয়া চলিয়াছিলেন, "মারবে মারবে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবনা?" সেই প্রেম জেনারেল বুথের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, ও প্রবাহের ন্যায় পতিতের উদ্ধারের নিমিত্ত বহিয়া গিয়াছিল। কত লাঞ্ছনা অত্যাচার সহিয়া তিনি অত্যাচারীদের নিকটে বার বার গিয়াছেন ও মুক্তির বার্ত্তা অক্লান্তভাবে শুনাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য তরুণ বয়সেই আরব্ধ হইয়াছিল। ১৮২৯ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৫ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাক্রান্ত দুই সমাজের উপাসনা প্রণালীর তুলনা করিয়া মেথডিষ্ট (Methodist) সম্প্রদায়ের প্রণালী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সেই দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়েই সাধারণ লোকদিগের নিকটে সরল ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। একজন বিখ্যাত এমেরিকান ধর্ম্মপ্রচারকের পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু সাধারণের

মধ্যে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগি-লেন। সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মের পথে আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। এবং দরিদ্র ও পীড়িতদিগের সাহায্য ও সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়েসলিয়েন (Wesleyan) সম্প্রদায় তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি কিছুদিন পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিলেন, পরে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সেই দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বুথ মেথডিষ্ট সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া তাঁহার অনুগতা সাধ্বী পত্নী ও চারিটি সন্তান লইয়া আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সত্যপ্রচারের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। এই সঙ্কটের অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বুথের বাক্যে ও কার্য্যে সাধারণের হৃদয় জাগ্রত হইয়া উঠিল। শত সহস্র লোক তাহা সাগ্রহে শুনিতে লাগিল। কিন্তু নানা স্থানে দুরাচার লোকদিগের নিকটে তাঁহাকে অত্যাচার ও দৈহিক আঘাতও সহ্য করিতে হইত! কত রজনী বুথপত্নী চিন্তাকুল হৃদয়ে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ভাবিয়াছেন বুঝি দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া দেহের কোনও অঙ্গ ভগ্ন করিয়া দিয়াছে তাই ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে, রাস্তায় সামান্য শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিতেছেন বুঝি আঘাতপ্রাপ্ত বুথকে লোকেরা বহিয়া ঘরে আনিতেছে। পরে কত অসংযতচিত্ত, মদ্যপায়ী, দস্যু তাঁহার বাক্যে পাপপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণ লোক ক্রমে দলে দলে আসিতে লাগিল। বুথ নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন। দ্বিপ্রহরের তাপে অথবা তীব্র শীতের রাত্রিতে যখন সকলে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছে, বুথ এবং তাঁহার দলের রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত স্ত্রী পুরুষ চিহ্নিত টুপি মস্তকে পরিয়া রক্তবর্ণ পতাকার চারিদিকে মণ্ডলাকার হইয়া দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে, প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিতেছে। এবং বিদ্রূপকারী ও দুষ্টলোকের তিরস্কার সহিয়া তাহাদিগকে সাদরে আশ্বাস জানাইতেছে ও পরিত্রাণের (salvation) বার্ত্তা শুনাইতেছে। তাহার ফলে কত মদ্যপায়ী মদ্যপান নিবারণের ভার গ্রহণ করিল, কত পতিতলোক পতিতোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইল, কত অনুতপ্ত স্ত্রীলোক হাঁটু পাতিয়া মণ্ডলীর সভার সমক্ষে নূতন ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইল। লণ্ডন সহরের নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন শত সহস্র লোক কলকারখানার মজুরশ্রেণী, আমেরিকার কানাডাবাসী অসংখ্য লোক, এবং পৃথিবীর ৫০টী দেশে যেখানে মুক্তিসৈন্যের কার্য্যস্থান প্রসারিত হইয়াছে প্রত্যেক স্থানেই জেনারেল বুথের কার্য্যের এবং তাঁহার মুক্তিফৌজের মুক্তির বার্ত্তা প্রচারের অলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেবল যে শত সহস্র লোক তাঁহার দলে

আসিয়াছে তাহা নয় কিন্তু তিনি আপনার বিশ্বাস তাহাদিগকে প্রদান করিয়া জীবনে ধর্ম্মসাধনের আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসী ব্যক্তিদলের মত তাহারা উন্নতির পথে নববিশ্বাসে চলিয়াছে।

ধর্ম্মের এই নবভাব যাহা বুথের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা পৃথিবীর একদেশে বদ্ধ হইয়া থাকিবার নয়। ইহার সার্ব্বভৌমিক ভাব জগতের নিকটে প্রচারের নিমিত্ত বুথ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে কোনও একদেশের লোক মনে করিতেন না; তিনি সকল দেশের ও সকল জাতির কার্য্যে আপনাকে দান করিয়াছিলেন। জীবনের সকল অবস্থায় তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর যাহার সহায় তার একাই সহস্রের শক্তি, এই বিশ্বাসে আপনাকে জগতের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং মুক্তিফৌজের দলকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সকল অবস্থায় প্রার্থনা তাঁহাকে বল প্রদান করিয়াছে, পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে।

এই কর্ম্মময় জীবনের কাহিনীর সহিত আর একটী জীবনের বৃত্তান্ত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; যে জীবনের গাঢ় আবেষ্টন ও সহায়তা ভিন্ন বুথের কার্য্য এত সফলতা লাভ করিতে পারিত না। সেটি তাঁহার পত্নী ক্যাথারিন। এই দুটী জীবনের মিলনকে একজন গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারায় পূর্ণ প্রবাহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এমন দুটী এক ভাবাপন্ন জীবনের দৃষ্টান্ত বিরল। সংসারে ধর্ম্মসাধনের আদর্শ ইঁহাদের জীবনে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। বুথের পত্নীর সম্বন্ধে না বলিলে জেনারেল বুথের জীবনের এক অংশ অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়।

এত অত্যাচার সহ্য করিয়া বুথ যে কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে মিসেস্ বুথের জীবনের শক্তি ও প্রভাব কার্য্য করিতেছিল। জেনারেল বুথের পত্নী, পতির সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি পরে মদ্যপায়ী, দুরাচার লোকদিগের নিকটে বুথের আদেশে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতার আকর্ষণী শক্তিতে ফল ফলিতে লাগিল। শত শত লোক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যে দিন বুথ Wesleyan সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন সেদিন তাঁহার পত্নীর প্রভাবই বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এই দুই জীবনের মিলনের ইতিহাস ও অতি আশ্চর্য্য ঘটনায় পূর্ণ। মিসেস্ বুথ বলিয়াছেন—"আমি আমার ভাবী স্বামীর একটী প্রতিকৃতি পূর্ব্বেই মনে মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি দেখিতে কিরূপ, কেমন লম্বা, কেমন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবেন, উলিয়ম নামের প্রতিও পূর্ব্বেই আমার আকর্ষণ ছিল।" মিষ্টার বুথ এ সকল বিষয়েই মিসেস্ বুথের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হইলেন; এবং পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত ও কার্য্যজনিত পরিচয় শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে পরিণত হইল। মিসেস্ বুথের বাল্যজীবনের একটী ঘটনা তাঁহাকে পরসময়ে সাধারণ লোকের জননীর পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বাভাস প্রদান করে। যখন ১২ বৎসর মাত্র বয়স

একদিবস বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া মিস্ ক্যাথারিন মামফোর্ড দেখিলেন—পুলিশ একটা মাতালকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে এবং একদল লোক তাহার পশ্চাতে তাহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়াছে সেই মাতালের নিরাশ্রয় এবং কাতর দৃষ্টি দেখিয়া সেই বালিকার হৃদয়ের মাতৃভাব জাগিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া তিনি মাতালের হাতে আপনার ছোট্ট হাতখানি সস্নেহে রাখিয়া তাহার সহিত থানায় চলিলেন; এবং তথায় গিয়া তাহার মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত সঙ্গে রহিলেন। সেই বালিকা-হৃদয় পরজীবনে সাধারণের প্রতি উদার-স্নেহে পূর্ণ হইয়া মুক্তিফৌজের জননীর পদে আপনাকে অভিষিক্তা করিয়াছিল। মিসেস্ বুথ লিখিয়াছেন, "আমি এক সময়ে একটী ভগ্ন কুটীরে জীর্ণকন্থায় শায়িতা একটী স্ত্রীলোক দুটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়া একা পড়িয়া আছে দেখিতে পাই শিশুসন্তান দুটীকে একটী ভগ্নপাত্রে স্নান করাইয়া দিতে দেখিয়া তাহাদের জননী ছিন্ন-কন্থার ভিতর হইতে আমাকে কি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আমি তাহা আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। মিষ্টার ও মিসেস্ বুথ এইরূপে সেবার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

মিসেস্ বুথ জেনারেল বুথের পূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেদিন জেনারেল বুথও ৮৪ বৎসর বয়সে দীর্ঘ-জীবনের কার্য্যের পরে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। বুথ গিয়াছেন, ইংলণ্ডে সেদিন রাজসম্মানে তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছে। ৫ হাজার মুক্তিসেনার দল শোকবাদ্য বাজাইয়া তাঁহার শবের পশ্চাতে পশ্চাতে কবরস্থানে গিয়াছিল। যে বুথ প্রথমে লণ্ডন সহরে একটী পুরাতন কবরস্থানে তাঁবু পাতিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সামান্য লোকদিগের নিকটে কত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ফিরেন নাই, আজ পৃথিবীতে তাঁর কি সুবৃহৎ দল। এই ভারতবর্ষেও দুই সহস্রের অধিক সংখ্যক নরনারী তাঁর দলভুক্ত। মুক্তিফৌজ সর্ব্বত্র মুক্তির বার্ত্তা বহিয়া লইয়া গিয়াছে। সামান্য সর্ষপ-কণার মত বিশ্বাস পর্ব্বতকে টলাইতে পারে ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

জেনারেল বুথ কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন নাই। একজন ইংরেজ বলিয়াছেন, কর্ম্মের মধ্যে যে বিশ্রাম তাহাই শান্তিপ্রদ —নিম্নে প্রকাণ্ড জলস্রোত গভীর গর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে, তীরস্থিত একটি বৃক্ষের শাখা সে জলস্রোতকে নত হইয়া যেখানে স্পর্শ করিতেছে তাহার উপরে একটি বিহঙ্গ নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। বুথের জীবনেও তেমনি, কর্ম্মের স্রোতের পার্শ্বেই তাঁহাকে বিশ্রাম লাভ করিতে হইয়াছে; এখন তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

সকল দেশে ও কালে ধর্ম্মের ও সামাজিক উন্নতির স্রোত যখন মন্দ হইয়া যায়, সেই সময়ে এক এক জন কর্ম্মী সে

স্রোতকে প্রবাহিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন। তাঁহাদিগের অন্তরের ভাব গভীর রহস্যে পূর্ণ। জেনারেল বুথ এইরূপ আন্তরিক প্রেরণায় পতিতোদ্ধার কার্য্যে এই সভ্যজগতের প্রধান সহর লণ্ডনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংসারে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আপনাকে সন্ন্যাসী করেন নাই। গৃহ পরিবারের মধ্যে সামান্য অবস্থার ভিতরে ধর্ম্মজীবন লাভের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে লোক প্রেরিত মহাপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গিয়া সাধারণ মানুষের ভিতরে ধর্ম্মের প্রাণ জীবন্তভাবে দেখিতে চায়। জেনারেল বুথ সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান সময়ে পরিবার ও সমাজের আদর্শ দেশের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। পরিবার ও সমাজ এই দুইয়ের সম্মিলিত কার্য্যস্রোতে মানব জীবনকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিতেছে। এক সময়ে সমাজ ও পরিবার ভিন্ন ভিন্ন পথে কার্য্য করিত; উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন গতিতে চলিত কিন্তু সভ্যদেশসমূহ, প্রাচীন গ্রীষের কাল হইতে ইহা বুঝিয়াছিল—"মানুষ সামাজিক জীব। তাহাকে কেবল পরিবারে শিক্ষিত করিলে তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করেনা, প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত তাহার জীবন শুধু সমাজের ও দেশের সেবার জন্য এপ্রাবধি বিক্রীতও হইতে পারেনা। যে মাতৃকোলে শিশু জন্মলাভ করে তাহাদের মধ্যে তাহার প্রথম জ্ঞান লাভ হয়, যাহাদের সম্বন্ধে সে জগতে আপনাকে পরিচিত করিতে পারে তাহাদের সহিত তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের প্রতি তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবনের উন্নতিসাধন, আদর্শজীবনলাভ, যাহা মানব সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে, সে জীবন কোথায় কিরূপে বিকশিত হইবে আজ এ প্রশ্ন চারিদিকে উঠিয়াছে।

আমরা অতীতের দিকে চাহিতেছি, ইতিহাস আলোচনা করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিসে জীবন উন্নত হয় কোথায় সে উন্নতির ভিত্তিভূমি? ধর্ম্মে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, স্বার্থত্যাগে, দেশচর্য্যা, পরসেবায় জীবনের ব্রত কিসে পালন হয়? পরিবারে, গৃহের প্রাঙ্গণে, সমাজে, বিদ্যালয়ে, সভা সমিতির মধ্যে ধর্ম্মমণ্ডলীতে, কোথায় জীবন কুসুম অনুকূল বায়ুতে ফুটিয়া উঠিবে? রাম মোহন কি বলিয়া গেলেন? ভারতের নব যুগের প্রভাতে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি বলিলেন? পশ্চিম গগনে তিনি সহসা অস্তমিত হইয়া গেলেন; শিক্ষা, সমাজ, পরিবার সম্বন্ধে কি বলিয়া গেলেন? পাশ্চাত্য জাতি ভারতবর্ষে নব আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, পাশ্চাত্য জ্ঞান দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে, বৈদেশিক সভ্যতার তরঙ্গ এদেশের সভ্যতার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, রাজা রামমোহন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

তিনি পরিবার, সমাজ ও দেশ নবযুগের পরিবর্ত্তনের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার কোন্ পথ দেখাইলেন? তিনি স্বহস্তে নবালোকের জন্য দ্বার খুলিয়া দিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক রশ্মি প্রাচ্য গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ লাভ করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া ডেভিড্ হেয়ারের সাহচর্য্যে নিযুক্ত হইলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে আপনার দারিদ্র লইয়া লইয়া দণ্ডায়মান হন নাই। এ দেশের জ্ঞানগরিমা লইয়া তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিখারীর বেশে তিনি স্বদেশকে অন্যের কাছে তুলিয়া ধরেন নাই, কিন্তু ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও শাস্ত্র জ্ঞানের বিনিময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশকে আদর্শ দান করিয়া গেলেন, কিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সাধিত হইবে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তিনি খ্রীষ্ট জীবনের মাহাত্ম্যে স্বীকার করিয়াছেন. কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীর সহিত তাঁহাদের কুসংস্কারাপন্ন মতসম্বন্ধে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার ফলে তিনি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়া কত লুপ্তরত্ন উদ্ধার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে সে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে আজিকার দিনে আমরা সমাজের অন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। ভারতের চিন্তা, সমাজসভ্যতার স্রোত যে রুদ্ধ হইয়া পড়িল হইয়া পড়ে নাই, রামমোহনের উদার চিন্তা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চেষ্টা দেশকে সে বিষয়ে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। পরে যাঁহারা সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারাও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে রাজা রামমোহনের চিন্তার অনুসরণ করিয়াছেন। মহাত্মা পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহান্দোলনে নিযুক্ত হইলেন, সে সম্বন্ধে ঘোর প্রতিবাদের মধ্যে আইন পাশ করাইলেন। প্রাচীন আদর্শ নিজজীবনে অনুসরণ করিয়াও তিনি সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন ও কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

একদিকে সামাজিক জীবনে নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল, অন্যদিকে পারিবারিক জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। গৃহেপরিবারে বৈদেশিক শিক্ষার তরঙ্গ স্পর্শ করিল। পরিবারিক জীবন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন গুলি তখন মীমাংসার বিষয় হইল। দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মের আন্দোলনের ঝড় বহিতে লাগিল। একদিকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বৈদেশিকের নব উৎসাহে ও উদ্যমে বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্রে স্বধর্ম্মের বীজ বপন করিতে প্রাণপণে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, অন্যদিকে নবজাগ্রত ভারতীয় ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ভাবে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, সকল সম্প্রদায় সে দ্বন্দ্বের আন্দোলনে আন্দোলিত। ইংরাজি শিক্ষা গৃহমধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; স্ত্রীশিক্ষা বৈদেশিকভাবে আরম্ভ হইয়াছে।

সেই সময়ে পারিবারিক জীবনের প্রশ্ন আচার্য্য কেশবচন্দ্র নূতন ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিবারের আদর্শকে সকলের সম্মুখে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরের জীবন, সামাজিক জীবন, যে উন্নত-জীবন-লাভের প্রকৃত স্থান নয় তাহা প্রদর্শন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, বৈদেশিক সভ্যতা দেশকে ভাসাইয়া নৈতিক অবনতির দিকে লইয়া চলিয়াছিল, কারণ পারিবারিক শিক্ষার তখন বিশেষ অভাব ছিল। বাহিরের সঙ্গে গৃহের অবস্থার অত্যন্ত প্রভেদ ঘটিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ত্রীজাতি আপনাদের প্রকৃত উন্নতি সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে পারেন না তাহাও কেশবচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত পারিবারিক দায়িত্ববোধে স্ত্রীশিক্ষা প্রধান অঙ্গ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিলেন। সুখী পরিবার গঠন ভিন্ন প্রকৃত জীবন গঠন হইতে পারে না, বাহিরের শত প্রশ্নের মীমাংসা গৃহেই সংসিদ্ধ হয় ও জীবনে গ্রহণের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। সামাজিক উন্নতি, গৃহের উন্নতি ভিন্ন সম্ভব নয় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের স্রোত বাহিরের জীবনকে স্পর্শ করিয়া গেল, কিন্তু জীবনে পরিবারে উদার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন প্রয়োজন হইয়াছিল। আজিও দেশে এই নূতন ও পুরাতনের মিলনে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই। প্রাচীন কোথায় স্থান পাইবে নূতনকে কতদূর গ্রহণ করিতে হইবে, পরিবারে সমাজ পদ্ধতিতে প্রাচীন সমাজের ভাব ও চিন্তা কতদূর গ্রহণীয় এবং নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার এ আলোক কতটুকু প্রয়োজন, জাতিভেদ কতদূর পর্য্যন্ত রক্ষা করা উচিত, বিভিন্ন ধর্ম্মকে কতদূর স্বীকার ও গ্রহণ করা উচিৎ, সমাজে ও দেশে সে সকল বিষয়ে শেষ মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, নব-চিন্তা দেশে জাগ্রত হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনের স্রোত চারিদিকে বহিতেছে। গৃহ, সমাজ সে স্রোতে ভাসমান। জীবনের উন্নতি, আদর্শ জীবন এ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিবে, সে বিষয়ে সকলের চিন্তা নিয়োজিত হইয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া এ দেশে গৃহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই গৃহের মাতৃমূর্ত্তিখানি এ দেশের নরনারীর নিকটে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের আকর স্বরূপা হইয়া রহিয়াছে। ধন, জন, জ্ঞান, ধর্ম্ম আর যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষিত সকলই এই পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। বিদুষী নারীগণ বিদ্যাকে বাহিরের কাজে যতই ব্যয় করুন, গৃহেই তাহার প্রকৃত ব্যয়ের স্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যে সকল শিক্ষিতা মহিলা এদেশে নানা ভাবে সাহিত্য ও শিক্ষার চর্চ্চা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার সুফললাভসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহারা

বাণীর গৃহে অশেষ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অতদূর লাভ করেন নাই তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে সাহিত্য ও শিল্পে আপনাদের চিন্তা ও ভাবের উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। "কাব্যকুসুমাঞ্জলী" রচয়িত্রী প্রভৃতি খ্যাতনামা অনেক নারী শিক্ষার প্রভাবে গৃহেও আপনাদিগের ভাবরাশির আশ্চর্য্য বিকাশ সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষার প্রভাব দেশে বিস্তৃত হইয়াছে ইহাই তাহার কারণ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রকৃত জীবনগঠনের উপযুক্ততালাভের চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে। শিশুর জীবনের ভিতরেই পূর্ণ বয়োপ্রাপ্ত মানবের ভবিষ্যৎ জীবন নিহিত থাকে। সে শিশুজীবন ভুবনবিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফালের অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির (Madonna) কোলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে মূর্ত্তিখানি আমাদের গৃহের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। সে স্নেহদৃষ্টি, সে পবিত্র মানবের জ্যোতির তুলনা কোথায়? আজিকার দিনের রাজনৈতিক অধিকারপ্রয়াসী উগ্রমূর্ত্তি সাফ্রাজিষ্টের সঙ্গে সে মূর্ত্তির তুলনা করিলে কোন্ দিকে শ্রেষ্ঠতা দান করিতে হয়? এই সামাজিক আন্দোলনের দিকে পরিবারের আদর্শের মধ্যে মাতৃমূর্ত্তিকে গৃহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নতুবা সমাজের ও দেশের কোনও চেষ্টা সফলতা লাভ করিবে না।

এই সামাজিকতার দিনে সমাজের অঙ্গে পুরুষ ও নারীর প্রকৃত স্থাননির্দ্দেশের চেষ্টা সকল দেশে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কাল হইতে একদল লোক নারীকে পুরুষের সহিত সমান ভাবে কার্য্য করিবার অধিকার গৃহের বাহিরেও দান করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা কি পরিবারে কি সমাজে কি দেশের সেবায় নারীকে সর্ব্বত্র পুরুষের সহিত সাহচর্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত, এবং তাহাদ্বারা অধিকতর উন্নতিলাভ হইবে মনে করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় নারী ও পুরুষের কার্য্যস্থান (Sphere) একই। এ অতি জটিল তর্ক। অধিকাংশ দেশ এ মত গ্রহণ করিতে পারে না। নারীসমাজ নানা বিষয়ে সে দেশে পুরুষের সহিত সমান ভাবে কার্য্য করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার সুদূর পরিণাম কে বলিতে পারে। তাঁহারাও পুরুষের ন্যায় বক্তৃতা করিতেছেন, মদ্যপান নিবারিণী সভার সভ্য হইয়া দেশ বিদেশে গমন করিতেছেন, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাগর পার হইয়া কতদেশে যাইতেছেন, আহত সৈন্যের সেবার নিমিত্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে ambulance লইয়া যাইতেছেন, শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনাতিপাত করিতে চাহিতেছেন। প্রাচ্য দেশসমূহ—অন্যদিকে স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চিরপ্রয়াসী। সামাজিক জীবনের কার্য্যে স্ত্রীজাতি কার্য্যতঃ বাহিরে কোনও উদ্যম করিতে অক্ষম, যাহা কিছু কার্য্য গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহারা পরোক্ষ-

তাকে পুরুষদিগের সাহায্যের নিমিত্ত করিতে পারেন, ইহাই এদেশের চিরন্তন ধারণা। ঐতিহাসিক যুগে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে শিক্ষা ও সমাজের কার্য্যে মহিলাদিগের মিলিত চেষ্টায় অনেক শুভ-ফল ফলিয়াছে, এ দেশেও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, শিল্পালোচনায় স্ত্রীজাতির চেষ্টা সফলতা লাভ করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সেবাব্রতধারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শও এদেশের সামাজিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ক্রিমিয়ার ভীষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত, মুমূর্ষু, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত, সৈন্যদিগের শান্তিদায়িনী, শুশ্রূষানিরতা, করুণারূপিণী, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সেবাব্রত কি আমাদের আদর্শকে নব আকারে গড়িয়া তুলিতেছে না?

গৃহে স্নেহরূপিণী জননী, বাহিরে সেবা-নিরতা মূর্ত্তিমতী শান্তি দুইই আদর্শ হইতে পারে। সমাজ, দেশ যত অগ্রসর হইবে আমরা ততই, গৃহ ও বাহিরের সামঞ্জস্যসাধনে সমর্থ হইব। আমাদের ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের আশাদৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যতের আলোকহস্তে জননীমূর্ত্তি গৃহে ও সমাজে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

বেদনা।

আজিকে আমার হৃদয় মাঝারে
বহিছে প্রবল বেদনা,
নিজে সামালিতে না পারি কিছুতে
হারাইয়ে ফেলি চেতনা।
সেই মুখচ্ছবি হৃদয়েতে জাগি
দিতেছে অসীম যাতনা,
চারিদিকে যাই কোথা তারে পাই
কোথা গেলে পাই সান্ত্বনা?
নিঠুর এ ধ্বনি হৃদয়েতে শুনি
প্রাণ যে থাকিতে চাহে না,
তবু দেখি হায় জীবন না যায়
অবিরত সহে যাতনা।
করেছি যে পাপ তারি এত তাপ
দিতেছে জীবনে বেদনা,
পতিত পাবন দিয়া দরশন
ফিরাও আমার চেতনা;
তুমি না চাহিলে কে চাহিবে মোরে
কে দিবে আর সান্ত্বনা।

স—

সান্ত্বনা।

বড় আশা করে এ মরত ভূমে
বেঁধেছিনু ঘর হায়!
এমন সময় সে ঘর ভাঙ্গিয়া
কে মোরে ডাকিল আয়?
মোহে অচেতন ছিল যেই প্রাণ
না ছিল চেতন-আশা,
এমন সময় কে তুমি আসিয়া
হৃদয়ে বাঁধিলে বাসা?
সহস্র নয়ন খুলিল গো যেন
তব অমৃত পরশে,
কিসে মগ্ন ছিনু দেখালে হে মোরে
তব উজ্জ্বল দরশে।

তোমা ছাড়ি আমি মোহে বদ্ধ হয়ে
ডুবেছিনু নিশিদিন,
তুমি থাকিতে না পেরে এ হৃদয়ে এসে
বাজালে করুণ বীণ।
হৃদয়ে আঘাত লাগিল যখন
তখন দেখিনু চেয়ে,
তুমিই সকলি তোমারি ভিতর
রয়েছে সকলি ছেয়ে।
এমন করিয়া নয়ন খুলিয়া
যদি দেখাইলে পথ,
এই কর দেব যেন পথ ভুলি
পুন না যাই বিপথ।

স—

কিণ্ডারগার্টেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনে শিশুগণকে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লেখাপড়া ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রণালী বহুকাল হইতে জনসমাজে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতর শিক্ষাপ্রণালীর আবশ্যকতা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধারণ লোকে অন্ধভাবে প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিয়া চলে, কিন্তু প্রতিভাশালী মহাপুরুষ তাহাতে তৃপ্ত হন না।

সুইজরলণ্ড দেশে পেষ্টলট্‌সি নামে একজন প্রতিভাশালী শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শিশু-শিক্ষার পুরাতন প্রণালী ছাড়িয়া, এক নূতন প্রণালীর সৃষ্টি করেন। পেষ্টলট্‌সি এই প্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও মহাত্মা ফ্রোবেলই উহার গূঢ় তাৎপর্য্য ও উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তিনিই উক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিয়া, আর তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফ্রোবেল তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর নাম দিয়াছেন "কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী।" জার্ম্মাণ ভাষায়, "কিণ্ড্" শব্দের অর্থ শিশু, তাহার বহুবচনে কিণ্ডার হয়; গার্টেন শব্দ ইংরাজি গার্ডেন শব্দের সমার্থবাচক, ইহার অর্থ উদ্যান। অতএব "কিণ্ডারগার্টেন" শব্দের অর্থ শিশুগণের উদ্যান বা শিশূদ্যান। উদ্যানে যেমন বীজ হইতে গাছগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিয়া ফুলফলে সুশোভিত হয়, শিশুও তেমনি গৃহে ও বিদ্যালয়ে, স্বাভাবিক নিয়মে স্বচ্ছন্দভাবে জ্ঞান, নীতি ও কর্ম্ম শিক্ষা করিতে করিতে যথাসময়ে আপনা আপনি আসল মানুষটী হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মূলমন্ত্র।

শিশু-বিদ্যালয়ের সহিত একটি ফলপুষ্পের উদ্যান সংলগ্ন থাকিবে ইহাই ফ্রোবেলের অভিমত ছিল, এবং তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংস্রবেও এরূপ উদ্যান ছিল। সেই অর্থে তিনি আংশিকরূপে "কিণ্ডারগার্টেন" শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। সহৃদয় শিশু-প্রকৃতিদর্শী ফ্রোবেল স্বপ্রবর্ত্তিত শিশু-বিদ্যালয়কে যেমন পূর্ব্বপ্রচলিত কঠোর শিক্ষাপ্রণালীর

সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করত, তন্মধ্যে একটী কোমল, স্বচ্ছন্দ নূতন শিক্ষানীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি স্কুলনামের বিভীষিকাময়ী স্মৃতি হইতেও ইহাকে মুক্ত করিয়া, শিশু-প্রকৃতির উপযোগী কোমল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ফ্রোবেল বৃক্ষ-জীবনের সহিত শিশু-জীবনের তুলনা করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্‌গত হয়, সেই অঙ্কুর সূর্য্যকিরণ, জল, বায়ু প্রভৃতি শোষণ করত, পত্রাবলী-শোভিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকার ধারণ করে, এবং সেই বৃক্ষ-শিশুই স্বীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ করত ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, ফল ফুলে পরিশোভিত হইয়া অবশেষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। মানব-শিশুও আপনার অভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের বীজ লইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। বাহ্য-জগতের সংস্পর্শে সেই বীজ হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুর উদ্‌গত হয়। জনক জননীর স্নেহের মৃদু মধুর পবনহিল্লোলে, সোদর সোদরার আদর যত্নের শীতল বারিসিঞ্চনে, আত্মীয় স্বজনের শুভাকাঙ্ক্ষার সুস্নিগ্ধ আলোকে সেই মনুষ্যত্বের অঙ্কুর স্বীয় অভ্যন্তরস্থ শক্তি বিকাশ করত ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সুশিক্ষার গুণে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সুশোভিত হইয়া পরিণত জীবনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে। বৃক্ষ-শিশু উদ্যান মধ্যে সযত্নে লালিত পালিত হয়! কোমল প্রকৃতি মানব-শিশু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিবে, সেই বিদ্যালয়ে ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী শিশুর আভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল হইবে, ইহাই ফ্রোবেলের অভিমত। এই জন্যই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত শিশু-বিদ্যালয়কে "কিণ্ডারগার্টেন" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুবিদ্যালয়ে তিনি যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতেন, তাহাই পাশ্চাত্য জগতে "কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী" নামে সুবিদিত। পেষ্টালট্‌সি অথবা ফ্রোবেলের মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথমতঃ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমবিকাশই শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যে উপায়ে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও প্রকৃতিগত বৃত্তিগুলি একই সময়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ প্রণালী। যে শিক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা শিশুর এই ত্রিবিধ অঙ্গই একত্রে, একই সময়ে বিকশিত হয় না, অর্থাৎ যাহা দ্বারা একটী বা দুইটী মাত্র অঙ্গের বিকাশ হয়, সে শিক্ষাপদ্ধতি উক্ত মহাত্মাগণের মতে অসম্পূর্ণ এবং এজন্য অগ্রাহ্য। মন, শরীর ও আত্মা এই তিনের কোনটীই বাদ দিবার নহে। যাহাতে এই তিনটীরই এক সঙ্গে উন্নতি হয়, ফ্রোবেলের শিক্ষাপদ্ধতির তাহাই মূলমন্ত্র।

মানুষের শরীর আছে, মন আছে, নৈতিক বৃত্তি আছে ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে। ইহার কোনটীকে বাদ দিলে মানুষ অসম্

মানুষ হয় না। সবগুলি এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিলে তবে পূর্ণ মানুষটি দাঁড়ায়। এই ফুটিয়া উঠার নামই বিকাশ। মানুষের শরীর বিকশিত হইবে, মন বিকশিত হইবে, নীতি বিকশিত হইবে, ধর্ম্ম বিকশিত হইবে। এই সবগুলি এক সঙ্গে বিকাশিত হওয়ার নাম সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ। এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই মনুষ্যত্ব। যাহার প্রতিভা যতটুকু তাহার বিকাশ ততটুকুই হইবে। কিন্তু বিকাশটী সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। অনুশীলনেই এইরূপ বিকাশ সংসাধিত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ চালনার নাম অনুশীলন। শরীরের অনুশীলন করিলে, শরীরের বিকাশ হয়। বুদ্ধির অনুশীলন করিলে বুদ্ধির বিকাশ হয়, হৃদয়ের অনুশীলন করিলে প্রেম, ভক্তি ও সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ হয়, সত্য, ন্যায়, সংযম ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুশীলন করিলে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হয়, পরহিতের অনুশীলন করিলে সামাজিক জীবন বিকাশ লাভ করে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলন করিলে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হয়। এই সবগুলি এক সঙ্গে অনুশীলন করিলে সকল গুলিই একত্রে বিকশিত হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব, সম্পূর্ণ মানবজীবনের সৃষ্টি করে। আমরা যদি তাহার কোনটীকে বাদ দিয়া কোনটীর অনুশীলন করি, তবে পূরা মানুষটী আসল মানুষটী পাইব না—আধখানা সিকিখানা, অথবা তাহারও কম মানুষ পাইব। কিন্তু সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বই আমাদের উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের জন্যই আমাদিগকে অনুশীলন করিতে হইবে। এই সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ববিকাশই ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য। যাহাতে মানবের একাধারে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক সর্ব্ববিধ বৃত্তিরই স্বতন্ত্র এবং সমঞ্জসীভূত অনুশীলন দ্বারা পরিণামে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত করিতে পারে, শিশুকালে তাহার সূত্রপাত করাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর তত্ত্ব অতি গভীর, শিশুপ্রকৃতির নিগূঢ়স্থানে তাহার মূল প্রোথিত এবং ইহার শাখাও বহু বিস্তৃত। ইহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, চিন্তা এবং শিশুর স্বভাব আচরণের নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। শিশুর মন সাদা কাগজের ন্যায় নহে যে, তাহাতে যাহা খুসি লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং তাহাই তাহাতে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অথবা ইহা কাদার তালের ন্যায় নহে যে তাহাকে যেমন ইচ্ছা আকার প্রদান করা যাইবে। শিশুর শরীর সজীব ও মন চেতন, ভিতর হইতে আপন নিগূঢ় শক্তিতে ইহারা বাড়িয়া উঠে। বৃক্ষটী বীজ হইতে যেমন ধীরে ধীরে উদ্গত হয় ও বাড়িয়া উঠে, শিশুর ক্ষুদ্র দেহ মনও তেমনি ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া পরিণামে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র দেহ ও মনের বৃত্তিগুলি কি কি নিয়মে বিকশিত হয় তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার মধ্যে শিশুকে স্থাপিত করিলেই সে আপনা আপনি জ্ঞানলাভ করে, বললাভ করে ও কর্ম্মশীল হইয়া উঠে।

শিশু-জীবনে প্রথমাবধি কর্ম্মশীলতার প্রকাশ দেখা যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি সে হাত পা ছুড়িয়া শরীর চালনা করে এবং হাসিয়া কাঁদিয়া ইঙ্গিতে ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া বুদ্ধি, মনোভাব ও ইচ্ছার পরিচয় প্রদান করে। ক্রমে তাহার চোখে, মুখে, নাক কান ফোটে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তির উন্মেষ হয় এবং অন্তরেও বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, অনুসন্ধিৎসা, সুখ দুঃখে, দয়া কৃতজ্ঞতা বিকাশ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাশক্তিও বিকশিত হইয়া উঠে এবং তাহার ক্ষুদ্র হাত দুখানি নানা বস্তু ধরিতে থাকে। ইন্দ্রিয়বোধ ও মনোবিকাশ কর্ম্মশীলতার সহিত গাঁথা। কর্ম্মকে পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয়বোধ ও মনোবৃত্তির উন্মেষ হয় না।

শিশু স্বভাবের সন্তান। প্রথম হইতেই সে প্রকৃতির কোড়ে লালিত পালিত হয় ও শিক্ষালাভ করে। যেখানে ফুলটি ফোটে, পাখীটি ডাকে, বিড়াল ছানাটী খেলা করে, শিশু সেইখানেই ছুটিয়া যায়। যেখানে জলে মাছ ভাসিয়া উঠে, হাঁস সাঁতার দেয়, গুগলি শামুক ধীরে ধীরে মুখ খোলে শিশু সেইখানে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া যায়। যেখানে নীলাকাশে চাঁদ উঠে, নক্ষত্র ফোটে, ছায়াপথ প্রকাশিত হয়, শিশুর নবীন চক্ষু আনন্দে ও বিস্ময়ে সেখানে চাহিয়া থাকে। এই চিরসুন্দর, চিরনবীন, চিরসজীব বিশ্বরাজ্যের সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান শিশুর নূতন, নির্ম্মল, মুগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে যেরূপ প্রতিভাত হয়, সংসারচিন্তাক্লিষ্ট জ্যোতিহীন চক্ষে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। প্রকৃতির মধ্যে বসিয়া আমরা যেখানে কেবল শাক, বেগুণ, লাউ দেখি, শিশু সেখানে প্রাণ দেখে, সৌন্দর্য্য দেখে, অনন্তকে অনুভব করে। এই বিশ্ব শিশুর নিকট প্রাণ ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। অতএব যখন শিশুর দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবার জন্য কেবল কর্ম্মশীলতা চাহে তখন তাহাকে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার দাও এবং অবাধে ছুটাছুটী, লাফালাফি ও চীৎকার করিয়া খেলা করিতে দাও— দেখিবে তাহার শরীর আপনা আপনি কেমন সুন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। জগতের বিচিত্র রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার ইন্দ্রিয়বোধকে উন্মেষিত কর ও হৃদয়ে বিমল আনন্দের সঞ্চার করিয়া দাও। নানা বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে সে যখন সরল ও স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে থাকিবে, তখন অতি সহজ ভাষায় সেই সকল প্রশ্নের সঙ্গত ও সত্য উত্তর দাও, কেবল তাহাই নহে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে নিজে হইতে সেই সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া লইবার সুযোগ দাও। আর ঐ মৌমাছিটি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করিতেছে, তেমনি তাহাকে জগতের প্রত্যেক সুন্দর ও সজীব পদার্থের সৌন্দর্য্য পান করিতে দাও, ঐ প্রজাপতিটীর মত আনন্দে বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে নীলাকাশের তলে, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে, মুক্ত বায়ুতে নাচিয়া বেড়াইতে দাও। শিশুর মুগ্ধ

দের জড়, উদ্ভিদ্ বা প্রাণিজগতের যে কোন বস্তুর প্রতি পতিত হয় তাহারই স্বভাবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দাও। বিশাল ধরণীবক্ষে দাঁড়াইয়া শিশু অনুভব করুক নীলাকাশে প্রাণ আছে, জলতরঙ্গে প্রাণ লুকাইয়া আছে, ইতরজীবের মধ্যে তাহারই ন্যায় প্রাণ সাড়া দিতেছে। খরগোসটীকে পুষিয়া, গাভীর গায়ে হাত বুলাইয়া, ফুলগাছে জলসেচন করিয়া, পাতা, লতা, ফুল ফল, পাখীর পালক, কড়ি, ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, বাগানে বাগানে বেড়াইয়া শিশুকে জ্ঞান, প্রীতি, আনন্দ ও কর্ম্মের সাধনা করিতে দাও। তারপর গৃহমধ্যে ও বিদ্যালয়ে তাহার হাতের কাছে এমন সকল কাজ আনিয়া দাও যাহা করিয়া সে মানব-জীবন ও মানব-সমাজের দায়িত্ব ও মহত্ত্ব বুঝিতে শেখে এবং ক্রমশঃ কর্ম্ম ও সংযমসাধনায়, নীতি ও ধর্ম্মের সাধনায় সুন্দর, দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যৌবন লাভ করে। প্রকৃতির মধ্য দিয়া শিশুকে ঈশ্বরসমীপে উপনীত করিয়া দেওয়া এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহাকে বিশাল মানব-সমাজের পথ দেখাইয়া দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর সারমর্ম্ম।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক মহাত্মা ফ্রেডরিক ফ্রোবেল শিশু-প্রকৃতির একটী নিগূঢ় তথ্য, শিশু-জীবন বিকাশের একটী মূলসূত্র নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। উহা শিশুর স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতা। স্প্রীংএর শক্তিতে যেমন ঘড়ীর সকল চাকাগুলি ঘোরে, এই স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতার প্রভাবে তেমনি শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম-বৃত্তিগুলি একযোগে বিকাশলাভ করে। এইরূপ সম্পূর্ণ, অখণ্ড মানুষটীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সুন্দর আয়োজন করিয়া শৈশবেই মানবের কর্ম্মশীলতাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। এই কর্ম্মশীলতাকে শৈশবে সংরুদ্ধ বা বিকৃত করিয়া ফেলিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের কি কর্ত্তব্য।

জগতে যতই জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হইতেছে ততই লোকের শিক্ষার পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সকলেরই প্রাণে উন্নতির আশা জাগিতেছে। এমনকি গরীব দুঃখীরা পর্য্যন্ত আজকাল অশিক্ষিত থাকিতে চায় না কিন্তু অর্থাভাবে, কিম্বা অন্যকোন বাধা বশতঃ শিক্ষালাভ করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা কি করিতে পারি? আমরা মনে করি আমরা কিছুই জানি না। আমরা আবার পরকে কি শিক্ষা দিব? কিন্তু এই চিন্তা করিয়া যদি আমরা আমাদের সামান্য জ্ঞানটুকুও হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে কোন ফল হয় না। যার যে টুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছে তার সেই টুকুই জগতে বিলাইয়া দিতে

উৎসুক হওয়া প্রয়োজন। কোন একটা কাজে অগ্রসর হইবার সময় চারিদিক হইতে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন আসিবেই, কারণ বিপদ্ প্রলোভন ভিন্ন কোন কাজ সম্পন্নহয় না। বিপদ্ আসিবে বলিয়াই যদি আমরা দুর্ব্বল হইয়া ফিরিয়া যাই, এবং লোক-নিন্দা ভয়ে কিম্বা পরিশ্রম-সাধ্য বলিয়া যদি পশ্চাৎপদ হই তাহা হইলে আমাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার হইবে না। আবার আমরা সকলেই সহজ জ্ঞানেই জানিতে পারি যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান যত প্রাণী সৃজন করিয়াছেন সকলেই সকলের উপকারের জন্য! সামান্য পিপীলিকা পর্য্যন্ত জগতের উপকার করিতেছে, আর আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হইয়া যদি সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বলিয়া পরস্পরের উপকার হইতে বিরত হই তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর নাই। সাংসারিক প্রত্যেক কাজে কত রকম শিক্ষা লাভ হয়, সেই সব শিক্ষা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। প্রতি পাদবিক্ষেপে আমরা কত রকম শিক্ষা পাই সেই সব শিক্ষা নিজের জীবনের কার্য্যে পরিণত করিয়া পরে অপরকে শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই স্বাধীন হবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। কেন মানুষ স্বাধীন হইতে চায়? স্বাধীন হইলে ইচ্ছামত পরস্পরের ব্রতে ব্রতী হইতে পারিবে বলিয়া কেহ কেহ স্বাধীন হইতে চায়। সংসারে বিশেষতঃ আমাদের দেশে নারীজাতি অত্যন্ত পরাধীন, কোন কাজ ইচ্ছামত করিতে পারে না, এই জন্য অনেক সময় অত্যন্ত কুফল হয়, কিন্তু অনেক উপকারও হয়। নারীজাতি যে পরাধীন, ইহার মধ্যেও কি ভগবানের কোন মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত নাই? একেবারে স্বাধীন হইলে হয়তো মতি স্থির থাকিত না কিম্বা সৎ ইচ্ছা সকল চলিয়া গিয়া আপনার মধ্যে "আপনি" বড় হইয়া উঠিত, হৃদয়ে পরের জন্য স্থান থাকিত না। আর অধীন বলিয়া সেই সকল পরোপকারের ইচ্ছা সুদৃঢ় ও উৎসুক হয়। আমরা যে এই নবযুগে নব ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ইহা আমাদের কত সৌভাগ্য, কিন্তু ইহার উপযুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমাদের কত সুযোগ বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার সৎ ব্যবহার করিতে পারি না বলিয়া আমাদের এই দুর্গতি। আমরা প্রতিনিয়ত কত উপদেশ পাইতেছি, কত প্রার্থনা শুনিতেছি, কিন্তু তাহা পাথর জায়গায় বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখন আর তাহা হইলে চলিবে না। যাহা শুনিব তাহা অন্তরে আঁকিয়া রাখিতে হইবে, এবং গভীর চিন্তা দ্বারা তাহা হইতে সত্যকে ধারণ করিয়া তাহা জগতে বিলাইতে হইবে। প্রতিদিন ভোরের আলোকে যেই চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে, এবং চারিদিক হইতে পাখীরা তাহাদের সুমধুর তানে গান গাহিতে গাহিতে নব-উৎসাহে নব আনন্দে তাহাদের নিজের নিজের কার্য্যে ধাবিত হয় এবং সূর্য্য-

তাহার অনন্ত জ্যোতিতে জগৎকে জাগাইয়া তোলে তখন মনে কেবল এই ভাবই আসে যেন এই সকল বিশ্ব প্রকৃতির সৃজনকর্ত্তা প্রকৃতিকে কার্য্যে রত করাইয়া মানব জাতিকে বলিয়া দিতেছেন "ওরে তোদেরও কাজ আছে আর বসে থাকবার সময় নেই ; সকল মোহ ত্যাগ করে একবার তোর নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখ্. কত অপূর্ণতা এখনও তোর প্রাণে বিরাজ কচ্ছে, কত কর্ত্তব্য এখনও তোর পড়ে রয়েছে"। এই বাণী যদি প্রত্যেক মানবের প্রাণে প্রতিদিন বীণার ঝঙ্কারের মত বাজিয়া উঠে, আর সকলেই যদি সেই আহ্বানে জেগে ওঠে তাহলে জগতের আর এদুর্দ্দশা থাকিবে না। এখনও প্রতি ঘরে ঘরে কত শিক্ষার অভাব কত জ্ঞানের অভাব, হায়! কে তাহা মোচন করিবে? তাই মনে হয় যিনি যতটুকু হৃদয়ে জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, তিনি সেইটুকু দান করিবার জন্য উৎসুক হউন। আর ঘুমাইবার সময় নাই, এখন কেবল কাজ করিতে হইবে। কিন্তু সব প্রধান কর্ত্তব্য, সর্ব্ব প্রথমে নিজের মনকে শুদ্ধ পবিত্র স্থির সংযমী করা, পরে অন্যকে শিক্ষা দিতে যাওয়া। কারণ যে ব্যক্তি নিজে তত মার্জ্জিত নয় সে যদি অপরকে উপদেশ দিতে যায় তাহা হইলে তাহার সে উপদেশে কোন ফল হয় না। অতএব বর্ত্তমান কালে আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য, নিজের নিজের জীবনকে শুদ্ধ করিয়া পরের সাহায্য করা। আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই। জাগ! জাগ ভাই ভগ্নীগণ এবং পরোপকারে রত হও। ও জগতের জন্য চিন্তা করিতে শেখ। আর আপনাকে নিয়ে থাকিলে চলিবে না। আপনাকে ভুলে গিয়ে জগতের উপকারে রত হও। যতদিন আপনার মধ্যে আপনাকে সঙ্কিত রাখিবে, জানিও জীবনের কোন উন্নতি হইবে না। অতএব আপনাকে ভুলে যাও।

অকুলে ভরসা।

(১)

চারিদিকে ছেয়ে গেছে নিবিড় আঁধার,
ওগো জ্যোতির্ম্ময়!
দেখাও তোমার আলো!
বলে দাও পথ ভালো
যে পথে যাইলে পাব মঙ্গল অক্ষয়।
আঁধারে ঘিরিছে দিক্
কোথা যাব নাই ঠিক
কোন্ পথে যেতে হবে নাহি পরিচয়।
তুমি মোর হাত ধরে
লয়ে চল দয়া ক'রে
স্থান দাও কোলে তব অনন্ত নির্ভয়।

(২)

তমোময় সংসারের মাঝে জ্বলিতেছ,
তুমি ধ্রুব তারা!
সুধা স্নিগ্ধ জ্যোতি তার
দেহ মোরে অনিবার
যে আলো করিবে আলো মরুময় কারা
সঙ্গী নাই সাথী নাই
অকূল সংসারে তাই
চলিয়াছি পান্থ আমি একা লক্ষ্য হারা।

বিপথ হইতে নাথ
টেনে তোল ধরে হাত
সাথে লও ভ্রান্ত আমি পথ খুঁজে সারা।

(৩)

সংসার সমুদ্রবক্ষে নাহি হেরি কূল
পারের কাণ্ডারী!
অসীম এ বারিরাশি
কোথায় যাইব ভাসি
কোথায় তরঙ্গ ঘায় পড়িব আছাড়ি।
উঠেছে তুফান ঘোর
কর্ণহীন তরী মোর
অতলে ডুবিবে কিগো এ জীবন তরী!
মোরে লয়ে চল তীরে
তরণী বাহিয়ে ধীরে
নিখিল-শরণ তব চরণ ভিখারী।

(৪)

চারিদিকে ধূ ধূ করে শুধু মরুভূমি
ওহে ভগবান্!
তৃষায় কাতর হিয়া
কোথায় জুড়াবে গিয়া
দেখাইয়া দাও কোথা আছে মরুদ্যান।
তপ্ত বালুকার রাশি
রয়েছে পৃথিবী গ্রাসি
না জানি কোথায় গেলে জুড়াবে পরাণ?
তুমি এসো দয়াময়
স্নিগ্ধ কর এ হৃদয়
তোমা ছাড়া পাব কোথা জুড়াবার স্থান।

শ্রী ইন্দুপ্রভা দেবী।
বাঁকিপুর।

রাণী।

নরনারী দুই মিলিয়া সংসার। দুইয়ের মিলিত চেষ্টায় ইহার সাফল্য। নর যুঝেন, নারী শক্তিসঞ্চার করেন, নর আনেন, নারী রাখেন। পুরুষের ক্ষেত্র বহির্দ্বারে, নারীর ক্ষেত্র অন্তঃপুরে। যত বড় বীর হউন না কেন, তাঁর সকল বীরত্ব এখানে পরাস্ত। এ যে নারীর একাধিপত্য; এখানে যে নারী রাণী। অতএব হে শক্তিরূপিণী নারী, তোমায় প্রণাম করি।

এ যে রাজভবন; তুমি আমি যেমন তেমন করিয়া রাখিব, ইহার শোভা নষ্ট করিব, ইহার শান্তিভঙ্গ করিব, তাহা হইবে কেন? রাণীর হুকুম—"সব পরিপাটি, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকিবে।" তুমি কে যে ইহার প্রতিবাদ কর? মাথা পাতিয়া আজ্ঞা পালন কর। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত, বাধ্যতা ও বিনয়ের সহিত এ পুরে প্রবেশ কর। একটি কুটাও স্থানভ্রষ্ট করিও না, একটু কণিকাও শ্রীভ্রষ্ট করিও না, অতএব হে পরিপাটিরূপিণী রাণী, তোমায় প্রণাম করি।

রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, পাপ তাপে মলিন, বিষাদে শ্রীহীন কোথায় তুমি একটু আরামের প্রত্যাশা করিবে? সে ত এই স্থান, যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ সেবিকারূপে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি কি সেই স্নেহস্পর্শের মূল্য দিতে পার? তুমি কি সেই সমবেদনার প্রতিদান করিতে পার? বাহুর

যে পলকে পরিবর্ত্তিত হয় সে ত এই সেবার গুণে। তার রোগ যায়, শোক যায়, পাপ যায়, বিষাদ যায়, সে ত এই সহানুভূতির গুণে। অতএব হে সেবা-রূপিণী দেবী, তোমায় প্রণাম করি।

পুরুষ কোথায় একটু জীবনকে তুচ্ছ করিয়া পরের জন্য আত্মদান করিল, সংবাদ পত্রে ও জগংময় কত ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, কিন্তু ঘরে ঘরে নারী যে নীরবে কত আত্মদান করিয়া যাইতেছেন তার সংখ্যা কেহ কখন রাখিতে পারিবে কি? প্রকাশের জয় পৃথিবীময় বটে, কিন্তু অপ্রকাশের জয় গৃহে গৃহে। এ লোকে ইহার সংবাদ কেহ না রাখিলেও আর এক লোকে ইহার প্রত্যেকটির হিসাব ও পুরস্কার আছেই আছে। অতএব হে আত্মদানকারিণী, তোমায় প্রণাম করি।

মুখর ও বাচাল পুরুষ সদাই আত্ম-গুণগান আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার তরে প্রাণপণ করেছেন; লজ্জাবতী নারীর মুখে কবে তা শুনেছেন? নারী জানেন মুখখানি বুজিতে, অভি-যোগ ভুলিতে, অত্যাচার সহিতে, নীরবে চক্ষের জলে ভাসিতে। স্বর্গে ও মর্ত্তে এর অপেক্ষা মহত্তর ছবি দেখা যায় কি? নারীপ্রকৃতি, সে যে কেবল আত্মগোপন আর আত্মগোপন। তোমার নির্ম্মম সমালোচনা সংযত কর, এই দুরবগাহ হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই অদ্ভুত সহশক্তি অনুভব করিতে চেষ্টা কর তোমার জানু নত হইবে, ত্রুটি কর। অঞ্জলীবদ্ধ হইবে, আর লেখকের মত তুমিও বলিবে, হে সহরূপিণী, তোমায় প্রণাম করি।

এত যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর, হে পুরুষ, তোমার সে ধর্ম্মের মূল্য কি যদি নারী তার রক্ষক না হন? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কত কত বৈরনির্য্যাতন সহিয়া, এই যে প্রকাণ্ড হিন্দুধর্ম্ম আজও জগতের নিকট আপন অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ঘোষণা করিতেছেন, এ কি কেবল ঋষিদের সাধ-নার গুণে, কেবল কতকগুলি শাস্ত্রবিধির প্রভাবে? আমাদের গৃহদেবীদের নিষ্ঠা ভক্তি না থাকিলে এ সব কোথায় থাকিত? ধর্ম্মের অগ্নি কে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, এই নারী অগ্নিহোত্রীরা নন? কঠোর ধ্যান চিন্তায়, তর্ক আলো-চনায় ঋষিরা সত্যলাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু এ সত্য পালন করে কে? ধর্ম্মের কঠোর বিধি নিয়মাদি জীবনে পরিণত করে কে? ধর্ম্মকে অঙ্গের ভূষণ, জীবনের মেরুদণ্ড, ভবপথের সম্বল, পরলোকের এক লক্ষ্য করে কে? সে কি এই নারী নন? আর এই নববিধান, যাহা নারীকে উপেক্ষা না করিয়া তাঁর উচ্চবেদীতে তাঁকে বসাইয়া বরণ করিতে চাহিতেছেন, এই নববিধান কি কখনও পূর্ণ হইবে নারীকে ছাড়িয়া? নরনারী এক হৃদয় হউন। এবার এক হইয়া একের পূজা হউক, তবে পূজা সার্থক হইবে। অত-এব হে ধর্ম্মরক্ষয়িত্রী রাণী, তোমায় প্রণাম করি।

সময়ের উক্তি।

বাজায়ে করুণ বেণু হৃদয় মন্দিরে
সময় কাতরে কাঁদি কয়,
পদ্মপত্রে বারিধারা সদৃশ ধরায়
এ জীবন চিরস্থায়ী নয়।
যে কোন মহান কাজ করিবে আশায়
কর নাই আজো সমাপন,
অচিরে সমাধ তাহা পরিহরি হেলা
কোরোনাক গৌণ কদাচন।
লইলে বিদায় আমি আসিনাক ফিরে
জগতের শত সাধনায়,
নীরবে সাধিয়া চলি কর্ত্তব্য আপন
রহিনাক কারো প্রতীক্ষায়।
না করে উপেক্ষা মোরে বিচক্ষণ জন
সময়ে সাধন করে কাজ,
করিব করিব আশে যাপিলে সময়
পরে সে যে পায় দুখ, লাজ।
কত পুণ্যফলে লভি দুর্লভ জীবন
বৃথা হায় ফুরাবে এমন?
ছোট বড় কত কাজ রহে বসুধায়
কর শেষ যা পার যেমন।
এ ক্ষণভঙ্গুর ভবে সবি হবে শেষ
না রবে কিছুই বর্ত্তমান,
কার্য্য শুধু অবিনাশী নাহি কভু লয়
রহিবে তাহাই গরীয়ান্।
ফলাফল অরপিয়ে ভগবান্ পদে
আপন কর্ত্তব্য কর শেষ,
বিফলে নিরাশে ভগ্ন না হবে তা হলে
কদাপিও ও মরম-দেশ।
না হবে কাঁদিতে ভবে জীবন ফুরালে
"অসম্পূর্ণ হায়" বলি আর,
লভিবে পরমানন্দে পরম আশ্রয়
দেবতা চরণে আপনার।

শ্রী হেমন্তবালা দত্ত।
চট্টগ্রাম।

মীরাবাই।

(১)

[ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই—রাখাল বালকগণের আবেগপূর্ণ সঙ্গীতে, যুবকদিগের সান্ধ্যমজলিসে অথবা ধনিগণের বিলাস-কক্ষে প্রতিধ্বনিত গীতবাদ্যের মধ্যে একটি পরিচিত নাম সর্ব্বদাই শ্রুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের ইতিহাসে উল্লিখিত মীরাবাই। আজ আমরা ইঁহার পবিত্র জীবনের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা সংযোজিত করিয়া কাহিনীরূপে উপস্থিত করিতেছি। বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট তাহা অনাদৃত হইবে না।]

রাজপুতানার অন্তর্গত 'নিরতা' একটি ক্ষুদ্র মনোরম গ্রাম। গ্রামটির চারিপার্শ্বেই ছোট ছোট পাহাড়, সেই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া সঙ্কীর্ণ কয়েকটি নদী এঁকে বেঁকে গ্রামটির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতি কত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই স্থানেই আমাদের সুনামধন্যা ধর্ম্মপরায়ণা সতীলক্ষ্মী মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী

তৎকালে রাজপুতানায় আর কেহই ছিল না, তাই তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজপুতানার অধিবাসিগণ তাঁহাকে 'জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া আখ্যাত করিত।

অতি বাল্যকাল হইতেই রমণীসুলভ যাবতীয় গুণ—দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। দেবতার প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ও ঐকান্তিক বিশ্বাস তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও উন্নীত করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি এমন সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন যে তাহা শুনিলে বালক বৃদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিত, এত অল্প বয়সে ইনি এ সকল বিষয় কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন। শ্রীমৎভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাহা ছোট ছোট ছড়া করিয়া যখন সুললিত স্বরে গাহিতে থাকিতেন তখন কত বৃদ্ধেরও চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িত। ভগবানে এমন আত্মনির্ভর জগতে দুর্লভ। কৃষ্ণলীলা গাহিতে গাহিতে মীরা কত দিন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন, আবার জ্ঞানলাভেও অনেক সময়ে আপনার আরাধ্য দেবতাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন।

বাল্যকাল কাটিয়া ক্রমে যৌবন আসিল। চিতোরের মহারাণা কুম্ভসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। মহারাণাও বাল্য হইতে কবিতাপ্রিয় ছিলেন। নববিবাহিত বধূর সহিত দিন-কতক বেশ একরূপ সুখে কাটিল। কিন্তু চিরকাল সমান যায় না।

মীরা প্রায় সর্ব্বদাই সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানে বিভোরা। কখন বা কোন সখীকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া স্বয়ং রাধিকা হইয়া তাহার বামে দাঁড়াইতে-ছেন, আবার কখন বা নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতীর মানভঞ্জনের পালা অভি-নয় করিতেন। মহারাণা প্রথম প্রথম বেশ আনন্দ পাইলেও শেষে আর এসব ভাল লাগিত না। তিনি যেটুকু চান সেটুকু যেন মীরার নিকট হইতে পান না—এই তাঁর আক্ষেপ। তরুণ বয়সে যাহা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মীরার পক্ষে তাহা যেন মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক।

(২)

দিল্লীর রত্নসিংহাসনে বসিয়া মোগল সম্রাট্ আকবর সা মীরাদেবীর সঙ্গীতের প্রশংসা শুনিলেন। আকবর সা চির-দিনই গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। এই সহৃদয়তা গুণেই তিনি একদিন বিস্তৃত মোগল-সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মেঃ, টী পালিত (শ্রীযুক্ত তারক নাথ পালিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে এই সর্ত্তে সাতলক্ষের অধিক টাকা দিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ টাকা দ্বারা বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার আর একটি সর্ত্ত এই আছে যে এই উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের অধ্যাপকগণ ভারতবাসী হইবেন। ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় আছে যে যদি ভারতবাসিগণের মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাপক না পাওয়া যায় তাহা হইলে যোগ্য ভারতবাসীকে বৃত্তিদান করিয়া উপযুক্ত করিয়া লইয়া অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে। এই আশ্বিন মাসের নূতন সংবাদ এই যে পালিত মহাশয় আরও প্রায় আট লক্ষ টাকা সেই কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। ভারতে এরূপ দান নাই বলিলেই হয়। কত ধনী মহাধনী আছেন, কিন্তু সাধারণের মঙ্গলের জন্য, দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য কে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন। এখন হইতে পালিত মহাশয়ের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিল। স্বদেশের উন্নতিকল্পে উদারমতি পালিত মহাশয় যাহা করিয়া গেলেন আমরা আশা করি ইহাতে দেশের সকল ধনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তহস্তে দান করার সংবাদ আমরা সর্ব্বদাই শুনিয়া আনন্দিত হইব। শুনিতে পাই পালিত মহাশয়ের রোগের অবস্থা অতি কঠিন। তিনি হৃদ্রোগে পীড়িত,কখন জীবন শেষ হয় বলা যায় না—এরূপ অবস্থায় যদি কলিকাতার সকল শিক্ষিত নরনারী মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাসূচক পত্র প্রেরণ করেন, তাহা হইলে একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হয়।

স্বর্গগতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাণী যে সময়ের কার্য্য ঠিক সেই সময়ে করিতেন, কখনও কোথাও উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিতেন না। এক দিন তাঁহার একটি সভায় যাইবার সময় স্থির আছে, কেবল তাঁহার একজন সম্মানিতা সঙ্গিনী উপস্থিত নাই। তাঁহাকে না লইয়া যাওয়া ভাল হয় না, কিন্তু সময় হইল তথাপি সেই সঙ্গিনী আসিলেন না, ভিক্টোরিয়া অগত্যা গাড়ীতে উঠিলেন, এমন সময়ে সেই উচ্চ পদস্থা মহিলা অতি ব্যস্ত হইয়া কি বলিতে বলিতে গাড়ীতে মহারাণীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মহারাণী আর কিছু না বলিয়া আপনার একটী হীরার হারের সহিত গ্রথিত একটী নূতন ঘড়ী তাঁহার গলদেশে ঝুলাইয়া দিলেন।

শারদীয় উৎসবোপলক্ষে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন বন্ধ হইয়াছে। ১৪ই অক্টোবর সোমবার হইতে ১০ই নবেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আগামী ১১ই নবেম্বর সোমবার পুনরায় স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। মহিলাবিভাগের বক্তৃতাও ঐ সময়ে আরম্ভ হইবে। স্কুলের বোর্ডিংএর কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। যে সকল অভিভাবক স্কুলে বা বোর্ডিংএ বালিকাগণকে ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২০নং বীডন ষ্ট্রীট স্কুলের সম্পাদকের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইবেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১৯। নবেম্বর, ১৯১২। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দরূপিণি জননি, তোমার কৃপায় তোমার কন্যাগণ অল্প অল্প জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করিয়া উন্নতিলাভ করিতে যত্ন করিতেছেন, তোমার অনেক কন্যাগণের গৃহে সুরুচি, সুশৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণে কত সুখ হয়। তুমি তাঁহাদের গৃহে বিরাজ করিতেছ প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই আনন্দ হয়। তুমি তাঁহাদের গৃহে রহিয়াছ, কিন্তু যাঁহাদের গৃহে থাকিয়া ধনধান্য লক্ষ্মীশ্রী শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য দান করিতেছ, দেখিতে পাই তাঁহারা তোমাকে অবতীর্ণরূপে দর্শন করিয়া তোমার প্রতি ভক্তি প্রেমে মত্ত হইয়া পুণ্যে ও আনন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেছেন না। তোমার চরণে তাই বিনীত প্রার্থনা করি, তুমি তোমার কন্যাগণের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়া যদি এত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলে, তবে আপনাকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে চিরসুখী কর। এই প্রার্থনা করিয়া তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মরুপ্লাবন।

এক সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, "অসম্ভব" কথাটী কেবল মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোনও বিষয় আমরা অসম্ভব মনে করিতে পারি না। বাস্তবিক মানবজাতির শক্তি উত্তরোত্তর যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে ঐ মহাপুরুষের কথার সত্যতা যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে। মানুষ সর্ব্বদাই নূতন শক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, যাহা সাধ্যাতীত তাহা সাধ্যায়ত্ত করিবার জন্য সতত চেষ্টাশীল। সত্য কথা বলিতে গেলে এখন "অসম্ভব" বলিয়া কোনও বিষয় স্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে।

এবং অসাধ্যসাধন এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিজ্ঞানের উন্নতি যদিও প্রধানতঃ আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত জড়িত, তথাপি অন্যান্য বিষয়েও ক্রমাগতই প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের আকার পরিবর্ত্তন বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। প্রয়োজনানুসারে মহাদেশ এবং মহাসমুদ্রের উপরে হস্তক্ষেপ করা যেন জ্ঞানান্ধতা মনে হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা হইতেও বিরত হন নাই। এবিষয়ে ফরাসী দেশের পণ্ডিতগণ অগ্রগণ্য। এক সময়ে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। ইহাতে বাণিজ্যের বহু অসুবিধা হওয়ায় আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ ভূভাগ সুয়েজ প্রণালীদ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ডি লেসেপ্ বাণিজ্যপথ বহুপরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন। ভূপৃষ্ঠের আকার পরিবর্ত্তনে মানুষের বোধ হয় এই প্রথম হস্তক্ষেপ। মহাদেশ দ্বি-খণ্ডিত করিবার চেষ্টা সম্প্রতি আর একটি হইতেছে। মানচিত্রে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা অতি সংকীর্ণ একটী ভূমিখণ্ডের দ্বারা যুক্ত; ভূগোলে এই ভূমিখণ্ডের নাম পানামা যোজক। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণের পরামর্শে এই যোজক দ্বিখণ্ডিত করিয়া আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসগরদ্বয়কে যুক্ত করা হইবে, এবং এই পানামা ক্যানালের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দেখা যায় মানুষ সন্তুষ্ট হয় নাই; নূতন সমুদ্র এবং নূতন দেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে মানুষ বুঝি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না। ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক এশেগোয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ প্রণালী দ্বারা আনীত সমুদ্রজল দিয়া সাহারা মরুভূমি প্লাবিত করা হউক। সাহারা মরুভূমি বর্ত্তমান অবস্থায় যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা মানুষের উপকারে আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এই অনুর্ব্বরা ভূমিকে অনর্থক পড়িয়া থাকিতে না দিয়া ইহাকে সমুদ্র জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া উর্ব্বরা করা হউক, তাহা হইলে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আরও বিস্তৃত হইবে। এই প্রস্তাবে সমস্ত সভ্যজগৎ চমৎকৃত হইয়াছে এবং ইহা সম্ভব কি না এবং ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ইহার ফলাফল কি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে এখন সকলে ব্যস্ত।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, এবং তাহার দক্ষিণে আফ্রিকা মহাদেশ। আফ্রিকার প্রায় সমস্ত উত্তরার্দ্ধ অধিকার করিয়া সাহারা মরুভূমি বিস্তৃত। পৃথিবীর মধ্যে সাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি এবং আয়তনে ভারতবর্ষের দ্বিগুণ; ইহার বহু অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত এবং এই ভয়ানক স্থানের গভীরতম প্রদেশে কি বিকট রহস্য লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও সভ্যজগতের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সাহারা দৈর্ঘ্যে দুই সহস্র মাইল এবং প্রস্থে প্রায় এক সহস্র মাইল হইবে। এই মহাবিস্তৃত মরুভূমি বালুকারাশিতে পূর্ণ।

সমুদ্রের সহিত অনেকাংশে ইহার সাদৃশ্য আছে, বাস্তবিক ইহা বালুকারাশির সমুদ্র-বিশেষ। সমুদ্রেরই ন্যায় ইহা ভয়াবহ, অথচ সুমহান এবং বিস্ময়জনক; যতদূর চক্ষু যায় কেবল বালুকারাশির স্তূপ এবং সমতলভূমি দৃষ্টিগোচর হয়।

সাহারা মরুর কয়েকটী অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই যে মরুভূমির সীমারেখা অতি সুস্পষ্ট এক এক স্থানে যেন কেহ রেখা দিয়া উর্ব্বরা এবং অনুর্ব্বরা ভূমি পৃথক করিয়াছে মনে হয়। এইজন্য সমুদ্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আরও অধিক, যেন বালুকারাশির তরঙ্গ তাহার উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়া আর আসিতে পারে না। কিন্তু এই বালুকাবৃত ভূমি সমতল নহে, বরং কোথাও অনুচ্চ পর্ব্বত, কোথাও শুষ্ক মৃত্তিকার উচ্চভূমি, কোথাও বা শিলাখণ্ডপরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা লবণাক্তজলপূর্ণ জলাভূমি এবং কোথাও বা শুষ্ক কণ্টকবৃক্ষের সমষ্টি দেখা যায়। কোনও কোনও স্থানে বালুকণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে পথিকের চক্ষে তাহা প্রবেশ করে, এবং যখন এই বালুকার তুফান উত্থিত হয় তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস অসম্ভব হইয়া উঠে। অনেক স্থানে সমুদ্রের পর্ব্বতসমান তরঙ্গের ন্যায় সাহারাতেও বালুকার অতি উচ্চ তরঙ্গশ্রেণী দেখা যায়; সামান্য ঝড় হইলেই এই অদ্ভুত তরঙ্গশ্রেণী আকার পরিবর্ত্তন করে।

সাধারণতঃ সাহারার অধিকাংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চ, কিন্তু এমন অনেক স্থানও আছে যাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক নিম্নে। অধ্যাপক [illegible] এই নিম্ন ভূমি সকল সমুদ্রজলে প্লাবিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জলের অভাবেই সাহারা প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; ভূমির কোনও দোষ নাই, সুতরাং ইহারা স্থির করিয়াছেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে জল পাইলেই মরুভূমি উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইবে। ইহা করিতে হইলে আফ্রিকার উত্তরভাগে একটি সুদীর্ঘ প্রণালী বা ক্যানাল প্রস্তুত করিতে হইবে, এই প্রণালী দ্বারা ভূমধ্য সাগরের বারিরাশি মরুভূমির বক্ষে আনয়ন করিলে উত্তপ্ত কঠিন স্থান সকল নূতন সরস জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে যে প্রকাণ্ড একটী হ্রদের সৃষ্টি হইবে তাহা নহে, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে সাহারার অনেক স্থান যথেষ্ট উচ্চ, সুতরাং এই সকল স্থান প্লাবিত হইবে না, বরং দ্বীপ-পুঞ্জে পরিণত হইবে। এই প্রস্তাব যদি সফল হয় তাহা হইলে কবিগণ "মরুভূমিতে বারিসিঞ্চন" একটি অসম্ভব ব্যাপার বলিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

সাহারা মরুভূমির অধিকাংশ ফরাসী শাসনের অধীন, এবং যে অংশে বারি-সিঞ্চন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাও ফরাসীদিগের আয়ত্তে, সুতরাং এই হ্রদ এবং দ্বীপ-পুঞ্জ সৃষ্ট হইলে ফরাসীদিগের যে সর্ব্ববিধ উন্নতি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে,

এই উত্তপ্ত মরুভূমির জন্য ইউরোপের উত্তরাংশ কিছু পরিমাণে শীত হইতে রক্ষা পায়; সুতরাং যদি এই উত্তাপ নষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশ এত শীতল হইবে যে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইবে; কিন্তু অন্যপক্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে এরূপ ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। সাহারা হ্রদের গুণে আফ্রিকাদেশের অনেক স্থান অবশ্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইবে, কিন্তু ইউরোপের কোন দেশে তাহার কোনও কুফল অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই।

পুনরায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এত অধিক পরিমাণে জল স্থানপরিবর্ত্তন করিলে পৃথিবীর ভারের সামঞ্জস্য নষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলে তাহার মেরুরেখার দিক্ পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত হইবে, ফলে ইহাতে নূতন কোনও অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। অনুমান করা গিয়াছে যে এই নূতন হ্রদে ৯৭৫,৭৭৪,০০০,০০০,০০০ মণ জল আসিতে পারে। এই জল প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগর হইতে সাহারা হ্রদে আসিলে আটলান্টিকের জল ভূমধ্যসাগরে আসিয়া প্রবেশ করিবে। ইহাতে পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, পৃথিবীর ভারসামঞ্জস্য অধিক কিছু পরিবর্ত্তিত করিবে না, কারণ প্রতিদিন সমুদ্রে যে জোয়ারভাটা হয় তাহাতে কত লক্ষ লক্ষ মণ জল স্থানপরিবর্ত্তন করে, এবং তাহাতে যদি কোনও ভয় না থাকে তাহা হইলে ইহাতেও কোনও ভয় নাই। এই সকল আপত্তি যে ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে ইহাতে মনে হয় যে এই অদ্ভুত কার্য্যে শীঘ্রই ফরাসীগণ হস্তক্ষেপ করিবেন। মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতই অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়া উঠিতেছে। তাহার ইচ্ছানুসারে সমুদ্র বহিষ্কৃত ও গৃহীত হইতেছে. ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত কি হইতে পারে? হলাণ্ড দেশ হইতে সমুদ্রকে বহিষ্কৃত করিয়া সে দেশ মনুষ্যবাসোপযোগী করা হইয়াছে; আর সাহারাতে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া মরুভূমিকে মনুষ্যের আবাসভূমি করিবার চেষ্টা হইতেছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

নীতি যেমন ধর্ম্মের দৃঢ়তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তেমনি সংসারের শোভা। যাহারা ধর্ম্মপালনে দৃঢ় হইয়া ছোট ছোট নীতিপালনে উদাসীন, তাহাদের জীবন সুখজনক বা সুদৃশ্য হয় না। যাহারা গৃহী হইয়া পুত্রকন্যা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যদি অন্তর কিংবা বাহ্য সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অমনোযোগী হয়, তাহাদেরও গৃহকার্য্য সুখকর হয় না, বরং তাহাদের গৃহ কদাকার ধারণ করে।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রে নীতিবিষয়ে শাসন এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে উপদেশ আছে। তথাপি অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে শাস্ত্রের সেই শাসন এবং উপদেশ কার্য্যকর হয় নাই। ভারতবর্ষ এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ ভূভাগে কতপ্রকার বিভিন্নজাতি, কতপ্রকার বিভিন্ন

ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টানই প্রধান। বৌদ্ধ প্রায় নাই। দুই একটি বৌদ্ধ গ্রাম কোন কোন স্থানে বিদ্যমান। বঙ্গে প্রদেশে অল্পসংখ্যক পারসীক সম্প্রদায় রহিয়াছে। তাহাদের গণনা কে করে?

হিন্দুদের পতিত অবস্থা হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে হিন্দু অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা হীন নহে। হিন্দুজাতির মধ্যে আর একটি আশ্চর্য্যব্যাপার এই যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী। ঘর বাড়ী বাসনপত্র পরিষ্কার রাখা বিষয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু বরং উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে।

মুসলমানগণ এবিষয়ে অতি হীনদশাপন্ন। অনেক ধনী মুসলমানের পরিধেয় বস্ত্রাদি বেশ পরিষ্কার। কিন্তু তুমি যদি তাহার অন্দর মহলে বা বাসগৃহে প্রবেশ কর, তবে নিতান্ত ঘৃণাকারজনক দৃশ্য দেখিয়া কষ্টবোধ করিবে। জাতীয় দৃষ্টান্তের প্রভাবই ইহার মূলীভূত কারণ। শাস্ত্রস্থ শাসনবাক্য এবং উপদেশে কিছুমাত্র ফল হয় না। নিম্নশ্রেণীর একটি হিন্দু পল্লী এবং মুসলমানপল্লী যদি দেখিয়া থাক, তবে উভয়দের বিভিন্নতাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে খ্রীষ্টান পল্লীও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর খ্রীষ্টানপল্লী অপেক্ষা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে হিন্দুপল্লী এখনও শ্রেষ্ঠ রহিয়াছে।

পাদ্রী সাহেবগণ হিন্দুর ধর্ম্ম ও নীতির যত কেন নিন্দা করুন না, এবং যত উৎসাহের সহিত কেন হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্থাপনে যত্নবান্ হউন না, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ নীতি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যে তথাকথিত খ্রীষ্টধর্ম্মাশ্রিতদিগ হইতে অনেক উন্নত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

যে জাতিতে বা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কুলকামিনীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি অনবহিত, সে জাতি বা সে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গৃহধর্ম্মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। নারীগণ অলস এবং কর্ম্মে শিথিল হইলে সে গৃহে অপরিচ্ছন্নতা সত্বর প্রবিষ্ট হইবে। মুসলমান রমণীগণ বিলাসবাসনায় অন্য সম্প্রদায়ের রমণীগণ অপেক্ষা প্রধান; কিন্তু বিলাসের বাসনা হইতে তাহাদের শরীর মনে ঘোর আলস্যের সঞ্চার হয়। অলস লোকের গৃহ বা দেহ অচিরাৎ অতি মলিনমূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গৃহের রমণীগণ অলস, তাঁহাদের গৃহের কোণে আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। বাড়ীর এদিক ওদিক হইতে দুর্গন্ধ ছুটিয়া নাসিকা রোধ করে। তাঁহাদের বেশ কেশ সকলই মালিন্যপূর্ণ হইয়া থাকে।

রমণী গৃহলক্ষ্মী। রমণী গৃহের ভূষণ। কিন্তু রমণী যখন আলস্যে ও ঔদাস্যে পূর্ণ হয়, তখন সেই রমণীই গৃহের লক্ষ্মী ছাড়াইয়া থাকে; এবং রমণীই গৃহে শ্রীহীনতা আনয়ন করে। মাজা ঘষা, ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা গৃহিণীগণেরই কার্য্য। অল-

সতার সেবিকা হইলে ওসব কে করিবে? মুসলমান জাতির মধ্যে অনেক নারী ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন ক্রমে কোরাণ পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোরাণ বা পারসী ও আরবী পড়িয়া বিদুষী হইলেও স্বভাবগত কিংবা জাতিগত দৃষ্টান্তের প্রভাব হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে রমণীদিগকে বাল্যাবধি বিশেষরূপে অভ্যাস ও শিক্ষা করান অতি আবশ্যক। বাল্যাবধি যাহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত, যৌবনে বা জীবনে তাহারা সে অভ্যাসের প্রভাব দূর করিতে পারে না। কোন কোন গৃহে খাদ্য ও পানীয় এত অপরিষ্কার ভাবে ও অযত্নে রক্ষা করা হয় যে সে সকল গৃহে আহার বা জল পান করা অনেকে ক্লেশজনক বোধ করেন। এগুলিও মহিলাগণের অনবধান প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল বিষয়ে ধনী নির্ধন, বিদ্বান মূর্খ, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকল রমণীরই বিশেষ সতর্ক হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল পুরনারী বা বালিকা মহিলা পত্র গ্রহণ বা অধ্যয়ন করেন আমরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করি, তাঁহারা গৃহধর্ম্মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করিবার জন্য যেন বিশেষ যত্নশীলা হয়েন। গৃহের বাহদৃশ্য ও আঙ্গিনা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সকলেই পারেন। এখন সহরে অনেকে আঙ্গিনা পরিষ্কার কার্য্যে মেথর ও চাকরের উপরে নির্ভর করেন। কিন্তু তাহা হইলেও গৃহস্থ মেয়েদের দৃষ্টি ও শাসন যদি না থাকে, মেথরের দ্বারা যথাযথ কার্য্য হয় না। চাকরেরাও ফাঁকি দেয়। পানীয় জল ও দুগ্ধ, আহার্য্য সামগ্রী পরিষ্কার রাখা ও আবৃত রাখা এবং যত্নের সহিত নষ্ট হইতে না দেওয়া বিষয়ে গৃহবাসিনী নারীগণেরই প্রধান কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়ে বাল্যাবধি নজর রাখিতে শিক্ষা করাও প্রয়োজন। কেবল গ্রন্থ অধ্যয়নে জীবন যাপনের উপযুক্ত শিক্ষা হয় না। গ্রন্থপাঠ আবশ্যক বটে, কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহ এবং সুন্দররূপে মানব জীবন এ পৃথিবীতে যাপন করিতে হইলে অশন বসন গৃহ ও গার্হস্থ্য সামগ্রী সকল যত্নসহকারে রক্ষা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাও নিত্য নৈমিত্তিক অত্যাবশ্যক কার্য্য। একার্য্য যাহারা বাল্যবধি রীতিমত শিক্ষা ও অভ্যাস না করে, তাহারা নিজেকে সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করিতে বা অন্যের সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে অপারক হয়। যাঁহারা সুগৃহিণী ও যাঁহারা গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষিতা, তাঁহারা আমাদের এ প্রস্তাব যে অপ্রাসঙ্গিক নহে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

স্মৃতি।*

দেব,

শ্রাবণের শেষ দিনে ঘন বরষায়
ধরাহতে চিরতরে নিয়েছ বিদায়,

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ কর্তৃক লিখিত।

একে একে দিনগুলি
ধীরে ধীরে গেল চলি,
বরষ ফিরিয়া এবে এল পুনরায়,
তবস্মৃতি হৃদিমাঝে জাগিছে নবায় ।

২

ত্যজিয়া সংসার তুমি নবীন যৌবনে
জীবন সঁপিয়া দিলে বিভুর চরণে ;
ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী হয়ে
প্রেমভক্তি ফুল দিয়ে,
বিবেক বৈরাগ্য সূত্রে গাথি সযতনে,
মনোরম প্রীতিমাল্য পরিলে আপনে ।

৩

সাধিতে আপন কাজ করুণ করিয়া
দয়াময় হরি তোমা দিল পাঠাইয়া ;
তাঁর কাজ শেষ করি
নরদেহ পরিহরি,
প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি হৃদিমাঝে নিয়ে,
সে অমরধামে তুমি গেলে গো চলিয়ে ।

৪

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে প্রচার.
কেশবে পাঠালে হরি ধরার মাঝার ;
প্রেমভক্তি পুণ্য দিয়ে
পবিত্রতা মিশাইয়ে,
প্রেমানন্দমহানীরে তুমি নিরন্তর,
ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে হলে অগ্রসর ।

৫

কেশবের অনুগামী যত সাধুজন,
নববিধানে তাঁদের হইল মিলন ;
তুমিও সেথায় যেয়ে
মনোমত সঙ্গী পেয়ে—
অঘোর প্রতাপাদি মহাজনগণ,
হইলে গো একেবারে পুলকে মগন ।

৬

ব্রহ্মানন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম করিতে প্রচার,
অঘোরনাথেরে দিল সে কাজের ভার ;
প্রতাপচন্দ্রের প্রতি
আদেশিল মহামতি,
ব্যাখানিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম ধরার উপর,
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিতে সত্বর ।

৭

তোমায় এছলামধর্ম্ম করিতে ব্যাখান,
করিলেন ব্রহ্মানন্দ আদেশ প্রদান ;
সাধিতে আপন কাজ
কিছু না করিলে ব্যাজ,
মনের আনন্দে তুমি খাট অহর্নিশ,
লিখিলে তাপসমালা কোরাণ দ্বাদশ ।

৮

মোসলমানধর্ম্ম তুমি করিয়া ব্যাখান,
সাধিলে জগতে এক অশেষ কল্যাণ ;
ভারতের হিন্দু জাতি
যে ধর্ম্মের গূঢ়নীতি,
না জানি আঁধারে মগ্ন ছিল চির দিন,
তুমিই করিলে তায় আলোক প্রদান ।

৯

পরহিতে চির দিন যাপিয়া জীবন,
সাধিলে বিশেষ রূপে নারীর কল্যাণ ;
নারীর হিতের তরে
কতই যতন করে,
লিখেছ প্রবন্ধ কত মধুর বচন,
ভুলিবনা তব বাণী জীবনে কখন ।

১০

আর্য্য ঋষিদের ন্যায় যাপিয়া জীবন,
যোগময় হয়ে স্বর্গে করিলে গমন ;

তব কাজ শেষ করি
এই দেহ পরিহরি,
গিয়াছ অমরলোকে ত্যজিয়া ভুবন ;
(চিরদিন) তোমাস্মৃতে রাখিদেব করিব পূজন॥

শিলচর। শ্রীমতী সৌদামিনী সেনগুপ্তা।

কিণ্ডারগার্টেন।
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

ফ্রোবেল তাঁহার অভিনব শিশুশিক্ষা প্রণালীটি শিশু-প্রকৃতির কতকগুলি মূল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিশু প্রকৃতির বিশিষ্ট পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনাদ্বারা তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার শিক্ষানীতির মূল সূত্র। যথাক্রমে সেই মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। শিশুর শরীর ও শ্রমপ্রবণতা—শিশু সুকোমল দেহ লইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি জননীর স্তন্যপান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন ও বিবিধ কার্য্যক্রীড়ার মধ্য দিয়া এই শ্রমপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে স্বকীয় জীবন ধারণ ও সামাজিক কল্যাণ সাধনোপযোগী শ্রমশীলতায় অভ্যস্ত হইয়া পরিণত বয়সে পূর্ণ শারীরিক বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

২। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি একটীর সহিত অন্যটী অপরিহার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। শারীর বৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ মনোবৃত্তি বিকাশের অপরিহার্য্য উপায়। আবার মনোবৃত্তি নিচয়ের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও তজ্জনিত আনন্দ না হইলে, শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য সংকুন্ন হইয়া পড়ে।

৩। ইন্দ্রিয় বিকাশ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাহ্য জগতস্থ বিচিত্র পদার্থের সংস্রবে শিশুর ইন্দ্রিয়বিকাশ আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন স্ফুটতর হইতে থাকে; এবং তাহার ফলে, সে জড়জগৎ সম্বন্ধে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। মনোবৃত্তি নিচয় ইন্দ্রিয়পথে বাহ্য জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের জ্ঞান লাভ করিয়া বিকশিত হইয়া থাকে।

৪। সৌন্দর্য্যবোধ—শিশুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের শক্তি বিকশিত হইলে সে যেন এক সজীব, সুন্দর, আনন্দোচ্ছ্বসিত, রহস্যপরিপূর্ণ জগতে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় বৃক্ষ লতার বিচিত্র সজ্জা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের বিচিত্র গঠনভঙ্গী ও ভাবগতি, চন্দ্রতারকার অপূর্ব্ব শোভা, ফলসমূহের বিভিন্ন রস ও বিবিধ বর্ণ, পুষ্পরাজীর বিচিত্র গন্ধ তাহার সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধকে জাগরিত করিয়া দেয়, এবং তাহার বিস্ময়বিমুগ্ধ অস্ফুট মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে।

৫। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা—শিশু যাহাতে স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বনে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় অন্তরোত্থিত প্রশ্নাবলীর প্রকৃত উত্তর লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রকৃতি তাহার অন্তরে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে নীরবে আপনাআপনি বিবিধ বস্তুর স্বরূপ ও বিবিধ ঘটনার প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে।

৬। কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা—সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত হইলে, তাহা শিশুর মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। সে তখন মনে মনে আত্মীয় স্বজনকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ধারণার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব ও যাবতীয় ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকে। একটী হইতে আর একটী, তাহা হইতে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে করিতে বস্তু বা ঘটনার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্ণয় করিতে থাকে।

৭। কর্ম্মপ্রবণতা ও ক্রীড়াশীলতা।—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা শিশু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র প্রকৃতি তাহার সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করিতে থাকেন। সে তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে অনবরত ক্রীড়ার আকারে কার্য্যে পরিণত করিতে থাকে। তাহার অন্তর-মধ্যে ক্রিয়াশীলতায়, সজীবতায়, উদ্যম-শীলতায় এক উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। তাহা হইতে অবিশ্রান্ত প্রবাহে শক্তি নিঃসৃত হইয়া শিশুজীবনে বিচিত্র ক্রীড়ার সৃষ্টি করিতে থাকে। শিশুর যে অন্তর্নিহিত কর্ম্মপ্রবণতা এইরূপে উপমার ক্রীড়ানিচয়ের সৃষ্টি করে, তাহাই পরিণামে বিভিন্ন শ্রম-বিভাগে বিবিধ শিল্পজাত, চিত্র বা স্থপতি-কার্য্যে বিবর্ত্তিত হইয়া বাল্যজীবনের ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়।

৮। নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তি—শিশুর অন্তরে দয়া, স্নেহ, ভক্তি, বাধ্যতা, বিনয়, সৌজন্য, সমবেদনা প্রভৃতি নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তিসমূহের বীজ নিহিত আছে। শিশু অন্ধ ভিখারীর কাতর কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য সজলনয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ক্ষুদ্র সরলা বালা বস্ত্রপ্রার্থী দীনদুঃখীকে স্বীয় ক্রীড়া-গৃহ হইতে পুত্তলিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র চীর-খণ্ড আনয়ন করিয়া সকরুণ নয়নে প্রদান করে। ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্ব্বল বালক সবল বালককর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে অন্যান্য বালকগণ দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন করত অত্যাচারীর তীব্র প্রতিবাদ করে। সম-পাঠীর রোগশয্যায় শিরোদেশে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষুদ্র বালক তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে শিশুগণের মুখশ্রী উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং সাধু-কার্য্যের জয় ও পুরস্কার, অসাধু আচরণের পরাজয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করত তাহারা পরম সন্তোষ প্রকাশ করে। এইসকল ঘটনা দ্বারা শিশুর স্বভাবজাত নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তিস্ফুরণের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি—শিশুর অন্তরে যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি নিহিত আছে, তৎপ্রণোদিত হইয়া সে জীবনের উষাকাল হইতেই বস্তু ও ঘটনাসমূহের নিয়ে সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বের অন্বেষণ করে। শিশু স্বীয় আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রবণতা হইতে প্রতিদিন

শিশুমনোচিত অসংখ্য কর্মের সৃষ্টি করিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ঐ সকল কর্মের স্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি করে। অতঃপর যখন তাহার মন ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উপর ছড়াইয়া পড়ে এবং বাহ্যজগতের বিশালতা তাহার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন তাহার বিশ্বাস হয় যে, এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর অন্তরালে একজন খুব প্রকাণ্ড বুদ্ধিমান ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিয়া ঐই সকল দৃশ্য ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিতেছেন।

১০। ঐক্য ও সামঞ্জস্যতত্ত্ব—তত্ত্বদর্শী ফ্রোবেল এই বিশাল বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ মধ্যে এক অনন্ত নিগূঢ় শক্তি এবং সৃষ্টিকার্য্য মধ্যে একই অটল নিয়ম দর্শন করিয়াছিলেন। ফ্রোবেল দেখাইয়াছেন যে, মানবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে, মানবের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে, বুদ্ধি, চিন্তা, হৃদয়বৃত্তি ও কার্য্যকরী শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। কলিকা যেরূপ পুষ্প ও পুষ্প ফলে পরিণত হয়, তদ্রূপ শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও পৌঢ়াবস্থা যথাক্রমে একটী আর একটীর পরিণতিমাত্র। ফ্রেবেল অন্তর্জ্জগতের সহিত বাহ্য জগতের অপরিহার্য্য ঐক্যবন্ধন এবং বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য নিগূঢ় যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাহিত্যে ও গণিতে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, শিল্পে ও বাণিজ্যে, কাব্যে ও অর্থনীতিতে, সমাজবিজ্ঞানে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন বিরোধ নাই। এজন্য তিনি শিশুর শিক্ষার জন্য এমন একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার মধ্যে শিল্প ও শ্রমিক শিক্ষা এবং সাহিত্য, কাব্য, গণিত, ইতিহাস, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির সামঞ্জস্য হইয়াছে। ফ্রোবেল মানবের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মধ্যে অপরিহার্য্য ঐক্য এবং সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য তিনি স্বপ্রবর্ত্তিত শিশুশিক্ষা প্রণালীটী এরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা শিশুগণের একাধারে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ ও কার্য্যকরী শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। মনোবিজ্ঞানের এই মূল সূত্রগুলির উপর, শিশুপ্রকৃতির এই মূল তত্ত্ব সমূহের উপর, প্রকৃতি ও মানবের এই চিরন্তন সম্বন্ধের উপর ফ্রোবেল তাঁহার সমগ্র শিক্ষাপ্রণালীটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফ্রোবেল দেখিয়াছিলেন যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সহিত সংযুক্ত না হইলে কোন প্রকার জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—পরোক্ষই থাকিয়া যায়। এই জন্য ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ কার্য্যগত। শিশুগণ আপনা আপনি শিক্ষা করিবে, আপনা আপনি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবে, কর্ম্ম শিক্ষা করিবে এবং তিনি কেবল পরিদর্শকরূপে প্রীতির সহিত তাহাদিগকে চালনা করিবেন, তাহাদিগকে সূত্র ধরাইয়া দিবেন, তাহাদিগের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিবেন এই তাঁহার শিক্ষারীতি ছিল। ফ্রোবেল শিশুগণের

প্রতি বৃত্তির স্বতন্ত্র অনুশীলন, পুনশ্চ সকল গুলির একযোগে অনুশীলন দ্বারা সেই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতেন। তিনি কার্য্যগত শিক্ষাদ্বারাই বৃত্তিসকলের বিকাশ-সাধন ও তাহাদিগের সামঞ্জস্য বিধান করিতেন। কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্য দিয়া ফ্রোবেল শিশুগণকে শিক্ষাদান করিতেন এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। ক্রীড়া—ফ্রোবেল শিশুর ক্রীড়া-প্রবণতাকে ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ফ্রোবেল ক্রীড়াকে তিন দিক দিয়া দর্শন করিতেন। (ক) শিশুগণের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলবিধানে ক্রীড়ার উপকারিতা। (খ) শিশুগণের মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনে ক্রীড়ার উপকারিতা। (গ) শিশুগণের নৈতিক শিক্ষায় ক্রীড়ার উপকারিতা। সজীব সতেজ ক্রীড়া দ্বারা শিশুগণের দৈহিক মাংসপেশী সমূহ স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয় এবং প্রতি অবয়বে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। ক্রীড়া শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত করে; শ্বাস-ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়ার স্বচ্ছন্দতা সাধন করে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে বলসঞ্চার করিয়া থাকে। ক্রীড়ার দ্বারা মনোযোগ, পর্য্যবেক্ষণ, বিচার, স্মৃতি, কল্পনা এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির অনুশীলন হইয়া থাকে। ক্রীড়ার দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তিসমূহেরও বিকাশ সাধন করিয়া থাকে এবং ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই শিশুগণের প্রথম ন্যায়ান্যায় বোধ জন্মিয়া থাকে। ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই তাহারা পরস্পরের ব্যবহার সমালোচনা করিতে শিখে, সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ করে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন এবং অসত্য ও অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে। তদ্দ্বারা তাহাদের নৈতিক বিচারশক্তির অনুশীলন হয়, নীতিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়, সহানুভূতি ও প্রীতি, সাহস ও উপযোগিতা জাগরিত হইয়া উঠে। ক্রীড়ার সহিত ড্রিলও কিণ্ডারগার্টেন-মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে শৃঙ্খলা ও শাসন, শিশুগণের সমবেত বশ্যতা ও শারীরিক ব্যায়ামশিক্ষা এবং তাহাদিগের সামাজিক বৃত্তিস্ফুরণের পক্ষে ড্রিল অত্যন্ত উপযোগী।

(ক্রমশঃ)

ব্রতগ্রহণ।

আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা নবসংহিতা পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন বিশ্বাসী গৃহস্থগৃহিণীর এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ বালকবালিকা-গণের ব্রতগ্রহণ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় সংহিতাতে নিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী গৃহস্থ পরিবারকে ধর্ম্মের দিকে প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও সদাচারের দিকে অগ্রসর করিবার পক্ষে এই ব্রতগ্রহণ ব্যাপারটি যে কিরূপ সহায় ও প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এদেশের আর্য্য ঋষিগণ ইহার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা যেরূপ উপ-

বৃদ্ধি করিয়াছিলেন মানব জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির ধর্ম্মনেতৃগণ তদ্রূপ করেন নাই। না করিবার কারণ, সেই সেই দেশের ও জাতির অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারত উষ্ণপ্রধান দেশ, ইহার ভূমি অতি উর্ব্বরা, এখানে অল্প পরিশ্রমে গৃহস্থের আহার পানের সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে ব্রতাদি গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মভাবসকল জাগ্রত এবং পরিবর্দ্ধিত না করিলে, শূন্য জীবনে ও মনে দুর্দ্দমভাবে পাপাসুর প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশ করিবার কথা। ঋষিগণপ্রতিষ্ঠিত ব্রতাদি নানা কারণে কালক্রমে বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে এবং কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানালোকে এদেশের অসংখ্য অসংখ্য নরনারী এই সকল শুষ্ক অনুষ্ঠান জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন ও দিন দিন আরও করিতেছেন, এবং করিবেন। নববিধানে পবিত্রাত্মা ভগবানের পবিত্র আলোকে এবং নির্দ্দেশে বর্ত্তমান যুগের এবং যুগধর্ম্মের আশ্রিত নরনারী ও সন্তানগণের অবস্থা ও আবশ্যকতা বুঝিয়া সংহিতাতে যে সকল ব্রতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যে প্রত্যেক বিশ্বাসী পরিবারের প্রকৃত কল্যাণজনক তাহা বলা বাহুল্য। বিশ্বাসী পরিবারের বালক বালিকা ও যুবক যুবতী দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব, ঈশ্বর বিশ্বাস, এবং প্রেম ভক্তি প্রবণতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে ব্রতাদি প্রদান এবং ব্রতাদি গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি যে এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করাতে ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে দিন দিন ধর্ম্মহীনতা, উপাসনার প্রতি ঔদাসীন্য, সুতরাং ধীরে ধীরে চরিত্রে এবং জীবনে নানা প্রকার হীনতা ও পাপ প্রবেশ করিতেছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম পরিবারে দিন দিন ইয়োরোপীয় ভাব প্রবল হইয়া জাতীয় ভাবকে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিতেছে। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম পরিবার না জাতীয় না বিজাতীয় কোনও সাধুভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে না। এক্ষণে দেশের এমনই দুরবস্থা যে ব্রতাদির নাম শুনিলেই, উহা কুসংস্কার বলিয়া সকলে উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিশ্বাসিগণ চিরদিনই ইহার আদর করিয়াছেন ও করিবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের জন্য এতই ব্যস্ত যে তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যদি এদেশে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে নবসংহিতার কোনও আবশ্যকতা না থাকিত, যদি প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবারের পিতা মাতা ও সন্তান সন্ততি সম্যক বুঝিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে নবসংহিতা প্রণয়নের আবশ্যক হইত না। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে নবসংহিতার একান্ত বিরোধী তাঁহারাও ইহা পাঠ করিয়া থাকেন এবং ইহা হইতে উপদেশ, নিয়ম ও শিক্ষা সকল আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা নববিধান বিশ্বাসী, যাঁহারা নবসংহিতাকে আদর করেন, শ্রদ্ধা করেন এবং মান্য করেন তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা

করিবেন যে ইহার ব্রত গ্রহণ অধ্যায়টীর প্রয়োজনীয়তা কত।

আর্য্য ঋষিগণ, অন্যান্য ব্রতাদির সঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য প্রতিপালন করিতেন। নব-বিধানের অভিনব আর্য্যবংশ কি সেই সকল একেবারে ভুলিয়া গিয়া অন্য দশ জনের সঙ্গে সময়ের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন? যাঁহারা এবিষয়ে দায়িত্ব বোধ না করেন তাঁহারা যে সময়ের স্রোতে পড়িয়া, আপনাদিগকে অপর দশজন গণ্য মান্য ও সুপরিচিত লোকদের মধ্যে পরি-গণিত হইতে দিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন তাহা আশ্চর্য্য কিছুই নহে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনও স্রোতেভাসিয়া যাইতেপারেন না। প্রস্তরখণ্ড জলে ভাসে না, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষাদিই ভাসিয়া যায়। বিশ্বাসিগণের দায়িত্ব বড় গুরুতর। তাঁহারা বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য অগ্রবর্ত্তী বিশ্বাসী পূর্ব্ব পুরুষ দিগের উপর দৃষ্টি করেন। আর পুণ্য, পবিত্রতা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি যাহাতে বৃদ্ধি হইতে পারে তজ্জন্য ভবিষ্যদ্ বংশীয়-দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং ভূত কালের অনুষ্ঠিত ব্রতাদির অনুরূপ সময়োপযোগী ব্রতানুষ্ঠান যে ভবিষ্যদ্ বংশীয়দের জন্য একান্ত প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি না করিয়া পারেন না। আমরা আশা করি আমাদের চিন্তাশীল ও চিন্তা-শীলা পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিবেন।

প্রণতি।

আসিল নবীন উষা
মৃদু হাসি অধরে;
কপালে সিন্দুর বিন্দু
জাগাইছে সবারে।
ফুটায়ে কুসুম কলি
কুসুমের বাগানে,
হাসিতেছে মৃদু হাসি
প্রাভাতিক পবনে।
ভানুপ্রিয়া সূর্য্যমুখী
হাসিতেছে নীরদে,
দাঁড়ায়ে বসুধা রাণী
পুষ্পাঞ্জলি করেতে।
অলস বসন টানি
চাঁদিমামা লাজেতে,
যাইতেছে ধীরে ধীরে,
নিরানন্দ মনেতে।
বিহঙ্গম মধুস্বরে
বিভুগুণ গাহিয়া,
তরুশাখে বসে আসি
প্রেমানন্দে ভাসিয়া।
জাগিছে সকলে এবে
আমিকি ঘুমায়ে রব?
অবশ পরাণ মোর
চেয়ে কেন আছে নভঃ।
হও আগুয়ান ভাই
হও সবে আগুয়ান,
সাধিব প্রভুর কাজ
বাঁধি নিজ নিজ প্রাণ।

রাঁচি:— শ্রীমতী প্রিয় বালা গুপ্তা।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল।

প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক একটি নারী সমিতি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ, ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক ও অবস্থাগত উন্নতি সাধন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে (১) ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রীজাতিকে একত্র করিবার জন্য ইহার সভ্যাদের মধ্যে সাময়িক মিটিং ডাকা হয়। (২) ভারতবর্ষীয় নারীদিগের চারদিকের অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। (৩) ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে ভারতমহিলাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি হয় ও সদ্‌গ্রন্থ সকল স্বল্পব্যয়ে ও সহজে তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারত বর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে "পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার" নামে ডিপো খোলা হইয়াছে। ঐরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণ পোষণের সুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই মহাসমিতির শাখা স্থাপিত করিয়া যাহাতে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য সকল প্রদেশে ও সকল নগরে সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার শাখা লাহোর, করাচী, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে খোলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সেক্রেটারীগণ উদ্যোগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাজ চালাইতেছেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল কলিকাতায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা স্থাপিত হইয়া স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৯১১ সালে শ্রীমতী সরলা দেবী কলিকাতায় আসিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে মিটিং ডাকিয়া বঙ্গ মহিলাদের নিকট এই মহা সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতা মহিলা সাগ্রহে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দেড় বৎসরের উপর কলিকাতায় অন্তঃপুর শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রথমে ৬ জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১৬টী বয়স্থা বালিকাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, এখন প্রায় ২০ জন শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে ১২০টী বিবাহিতা স্ত্রীলোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ছাড়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে সমিতি কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে একটী ছোট বালিকাদের জন্য স্কুল খুলিয়াছেন, ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা এখন ৫০ জন। ৩ জন শিক্ষয়িত্রী ইহার কাজ চালাইতেছেন।

নারী জাতির হিতকারী যত প্রকার কার্য্য এ পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে তার মধ্যে

নারীর সাহায্যে নারীজাতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা এই প্রথম। এই প্রথম প্রয়াসেই যেরূপ সফলতা লাভ করা যাইতেছে তাহাতে আশা হয়, অচিরে এই সমিতির দ্বারা দেশের একটী প্রধান অভাব দূর হইবে। আর ভারতের সমস্ত স্ত্রী-জাতি এক বাঁধনে বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের উন্নতির সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইবে।

কলিকাতার শাখা সমিতিতে প্রায় ৬০০ জন মেম্বর হয়েছেন। জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে যে কোন স্ত্রীলোক এই ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করিবেন তিনিই ইহার সভ্য হইতে পারেন। ইহার মেম্বরগণের প্রবেশিকা ফি ১৲ এক টাকা মাত্র, আর বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা। বৎসরে ১০ টাকা চাঁদা দিয়া প্রায় ৮০ জন মহিলা মুখ্য মেম্বর হয়েছেন।

অন্তঃপুরস্থ নারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে শিক্ষয়িত্রীদের পারিশ্রমিক লওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ সমিতির ফণ্ড বৃদ্ধি হইলে গৃহস্থ ও দরিদ্র পরিবারদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখন আশা করা যায়, ভারতের সমস্ত নারী উদ্যোগী হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্যকে স্থায়ী করিবেন। আর ইহা দ্বারা দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিনী দাস।

চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।

[১৯০৮ সনের কথা]

বিবাহের পর আমি যখন স্বামিসঙ্গে তাঁহার কার্য্যস্থল রাঁচি আসিতেছিলাম, তখন আমার পূজনীয় পিতৃদেব বলিয়া দিলেন, তুমিতো এখন মফঃসলে মফঃস্বলে ঘুরিবে, যদি পার গরিব দুঃখীদের জন্য কিছু সময় ও অর্থ প্রদান করিও।

মফঃস্বল আসার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট ঔষধ চাহিতে আরম্ভ করিল। দুই তিন গ্রামে এই রকম ঔষধ চাওয়াতে মনে হইল প্রভুর পুত্র কন্যাদের সেবা করিবার এই একটী মহা সুযোগ। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও একখানি পুস্তক আনাইলাম।

প্রথম চিকিৎসা।—একদিন প্রাতে বসে আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম ৩৪.৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন লোক, চলৎশক্তি প্রায় রহিত, ধীরে, অতি ধীরে, লাঠি ভর দিয়ে আমাদের তাঁবুর নিকটে আসিতেছে। আমি মনে করিলাম, জায়গা জমি সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বলিবার জন্য আমার স্বামীর নিকট আসিতেছে। আমি তাই ভেবে তাড়াতাড়ি আমার স্বামীকে ডাকিয়া দিলাম। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, এর ভারী অসুখ, ঔষধ দিতে হবে, ওর কাছে যেয়ে, ভাল করে জিজ্ঞাসা করে, ঔষধের ব্যবস্থা করে দাও। ঔষধ দিতে হবে শুনে তো ভয়ে আমার চক্ষুস্থির; চেহারা দেখে মনে হইতেছিল

বুঝি ২।৪ দিনের বেশী আর বাঁচিবে না। আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার স্বামী রাগ করে বলিলেন, বসে ভাবছ কি? ঔষধ দিতেই হইবে। ধীরে ধীরে "চিকিৎসাতত্ত্ব" হাতে করিয়া কাছে গেলাম, বেশী বলিবার শক্তি নাই, সঙ্গীরা বলিল, কয়দিন যাবৎ খুব জ্বর, ভয়ানক কাশি, বুকে পিঠে এত ব্যথা হইয়াছে যে, তজ্জন্য শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে বড়ই কষ্ট হয়; আর রাত্রিতে কাশির জন্য মোটেই ঘুম হয় না, এবং ব্যথার জন্য শুইতেও পারে না। বই দেখিয়া বুঝিলাম ভয়ানক ব্রঙ্কাইটিসে একেবারে জব্দ করিয়া ফেলিয়াছে। ঔষধ দিলাম, বুকে পিঠে মালিশ করিবার জন্য কিছু খাঁটি সর্ষপ তৈল, সর্ব্বদা মুখে রাখিবার জন্য কিছু মিছরী ও পথ্য করিতে সাগু দিলাম। দুদিন বড় কিছু উপকার বোঝা গেল না, তৃতীয় দিন হইতে রাত্রিতে ঘুম হইতে লাগিল এবং কাশির সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও কমিতে লাগিল। ২ মাইল ৪ মাইল দূরে যখন যেখানে কেম্প পড়িত সেখানেই লোক পাঠিয়ে দিয়ে নিয়মমত ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিল। ১৫।২০ দিন পরে তাহাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে অন্য গ্রামে যখন আমাদের কেম্প পড়িল তখন দেখি একদিন সে এক "চুকা" (দুধের ছোট ছোট হাড়িকে চুকা বলে) দুধ হাতে করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই খুব আমন্দ হইল। সে চেহারা আর নাই। এখন শরীরে একটু বল হইয়াছে, মুখও বেশ প্রসন্ন হইয়াছে। সে আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেলাম করিয়া কত আনন্দ, কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং ঔষধের কত প্রশংসা করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর। তাহাকে প্রণাম করিতে বলিয়া আমি নিজেও মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম "প্রভু! তুমি যাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহাকে কে বিনাশ করিতে পারে?" তাহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দুধ আমি উপযুক্ত দামে ক্রয় করিয়া রাখিলাম। এই গ্রামের মেয়েরা একদিন দলবদ্ধ হইয়া ঘণ্টা দুই বেশ নাচিয়া গেল। এই লোকটী ভাল হওয়াতে তাহাদের মনে খুব আনন্দ হইয়াছিল। এই কোল নাচ অনেকেই পছন্দ করেন, এমন কি সাহেব মেমেরা যখন রাঁচি কিম্বা মফঃস্বলে যান তাঁহারাও একবার এই নাচ দেখিয়া যান। এইরূপ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রভুর পুত্রকন্যাগণের সেবার কার্য্য চলিতে লাগিল। দিবসের সব সময়েই ঔষধ দেওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া প্রাতে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা ঔষধ বিতরণের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া লইলাম। এই সময় ৪।৫ মাইল দূর হইতেও লোকসকল ঔষধ লইয়া যাইত। শুধু যে গরিব কোলেরাই আসিত এমন নয়, জমিদার হিন্দুস্থানীগণও আসিত। কোন গ্রামেই একটা ডাক্তারখানা বা একজন ডাক্তার দেখিলাম না। তাই প্রাণের ব্যাকুলতায় লোক বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিত।

অনেক পুরাতন রোগীও আসিত। মধ্যে মধ্যে এমন রোগী আসিত যে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করা যাইত না। অনভিজ্ঞতার জন্য কঠিন কঠিন রোগীদিগকে শুধু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়াই বিদায় করিতাম। কি রোগ তাহার নাম পর্য্যন্ত জানি না, তাই ঔষধ দিতে বড়ই কষ্ট হইত। তবুও বই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখিতাম, যদি কিছু পাই।

একদিন একজন প্রৌঢ়া আসিয়া বলিল ৫ ক্রোশ দূর হইতে একজন জনানা ঔষধের জন্য আসিয়াছে, আজ ৪ মাস যাবৎ জ্বর, জ্বর এপর্য্যন্ত আর ছাড়ে নাই। বিছানা হইতে উঠে বসিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোথায়?' সে বলিল,"জনানা পর্দানসীন, বাহিরে আসিবে না। গ্রামের ভিতর তার মেয়ের বাড়ীতে আছে। তার মেয়েই ঔষধ খাওয়াবার জন্য তাহাকে এখানে আনিয়াছে।" এই প্রৌঢ়াটীর সঙ্গে ঐ বুড়ীর একটী ছোট ছেলে সামান্য জ্বরের ঔষধের জন্য আসিয়াছিল। আমি তাকে দুদিনের জন্য ঔষধ দিয়ে বলিলাম, "তুমি ওবেলা এসে তার ঔষধ নিয়ে যাইও। আমি এখন রান্না করিতেছি, অনেক দিনের জ্বর, একবার বইটা ভাল করে দেখে তারপর ঔষধ দিব।" প্রৌঢ়া অবস্থা ব'লে চলে গেল। তারপর দুদিন আর কারুর সঙ্গে দেখা নাই। কারুকে না দেখে, "তখনই ঔষধ দিলাম না কেন?' মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলাম। যাহা হউক, তৃতীয় দিনে সেই প্রৌঢ়াটীকে দেখিবামাত্রই বলিলাম, তুমি বলে গেলে, "আমি ঔষধ নিয়ে যাব'; আর এলে না কেন? সে বিনীত হয়ে বলিল, "আমি এখান হইতে গিয়েই কার্য্যান্তরে অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলাম, এই মাত্র এসেছি।' আমি বলিলাম, শিশি এনেছ ত? সে বলিল না, তুমি যে ঔষধ ঐ ছেলেটীকে দিয়েছিলে, ঐ বুড়ি সেই ঔষধ আপনিই খেয়ে ফেলেছে, আর একটু আরামও হইয়াছে, এখন আর জ্বর হয় না, বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেও পারে। আমরাতো শুনে হেঁসেই অস্থির, কার ঔষধ খেয়ে কে ভাল হয়ে গেল।

রাঁচিতে আজকাল হিন্দুস্থানীই বেশী হইয়াছে। এদেশের রাজা হিন্দুস্থানী। কোলজাতি আজকাল বড়ই গরিব। বহুপূর্ব্বে ইহাদের ধনধান্যের অভাব ছিল না। কিন্তু যে দিন হইতে উহারা "হাঁড়িয়া' ব'লে মদের মতন এক প্রকার নেশা করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই উহাদের অধঃপতন হইয়াছে। কি স্ত্রীলোক, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই উহা পান করে। পরিশ্রম ক'রে দু পয়সা পেলেই ভটিখানাতে দৌড়ে যায়। ঔষধ নেবার জন্য শিশি আনিতে বলিলে সেই বড় বড় মদের বোতল গুলিই লইয়া আসে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা খুব পরিশ্রমী। শিশু পিঠে বাঁধিয়া ইহারা সব কাজ করে। ইহারা খুব সঙ্গীত ও ফুলপ্রিয়। মেয়েরা, যুবক ও বালকেরাও খুব গয়না পরিতে ভালবাসে। বিয়ে উভয়েরই অল্প বয়সে হইয়া থাকে।

২০।২২ বৎসর বয়স্ক যুবককে যদি বলি, এত গয়না পরেছ কেন? হাসিতে হাসিতে বলে, আমার বৌ তাহা হইলে আমাকে খুব ভালবাসবে। ছেলেগুলিও পরে, মেয়েরা কেন দেখে আদর পছন্দ করে। এদেশে বিয়ে হয়ে গেলে, তারা আর কারুর হাতে খাবে না। খেতে বল্লে বলিবে, আমি সাদি করেছি, আর তোদের হাতে খাব না। গ্রামের মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া যেখান হইতে জল লইয়া যায়, সেখানে গিয়ে আমি উপস্থিত হইলে তাদের বড় ভয় হয়, যে পাছে কলসী ছোঁয়া যায়। তারা যে অত বড় হিন্দু আমি তাহা জানিতাম না। এরা গরুর মাংস খাবে, কুকুরের ছোঁয়া খাবে, কিন্তু মানুষের ছোঁয়া জলও খাবে না। খৃষ্টান প্রচারকেরা এদেশে খুব কাজ করিতেছেন। অনেক কোলই এখন খৃষ্টান হইয়াছে, নানদের স্কুলে কোল মেয়েতে ভরা। খৃষ্টান মেয়েগুলি বেশ সভ্যও হইয়াছে, তাদের গায়ে সর্ব্বদাই জ্যাকেট থাকে। মফঃস্বলের অনেক জায়গায় গির্জ্জা ঘর আছে এবং সেখানে কোন প্রচারকও আছে।

আর একটি ঘটনা লিখিয়া আমি আমার লেখা শেষ করিতেছি। একবার আমরা দুমাসের জন্য লোহার ডগায় গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফিরে এসে রাঁচি হইতে ১৫ মাইল দূরে মফঃস্বলে আমাদের ক্যাম্প পড়ে। লোহার ডগায় যাবার পূর্ব্বে আমরা এ এলাকায়ই থাকিতাম। একদিন বেলা ১১টার সময় সেই গ্রামের জমিদার (হিন্দু-স্থানী) একজন জোলার বড় ছেলেটির কলেরা হইয়াছে, তাকে ঔষধ দিতে বল। আমি জোলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ সময় হইতে দাস্ত আরম্ভ হইয়াছে ও ছেলের বয়স কত। জোলা বলিল, ভোর রাত্রি হইতে পায়খানা ও বমি হইতেছে; এই আমার বড়ছেলে, ইহার ৩।৪টী সন্তান হইয়াছে। পায়খানার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সে পায়খানার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবও বন্ধ বলিল। এখন অবস্থা কি রকম? তাতে বলিল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর পিপাসার বড় জোর। কলেরার যত শেষ লক্ষণ সমুদায়ই বলিতে লাগিল। বুঝিলাম মরিবার আর বেশী দেরী নাই। জোলার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই আমার স্বামী সকাল বেলায় কাছারী হইতে আসিলেন। তিনি আসিয়া ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আদ্যোপান্ত সব বলিয়া বলিলাম, এই অবস্থায় আমার ঔষধ দিতে ইচ্ছা হয় না। একে তো কিছুই জানি না, তারপর রোগীরও এই অবস্থা, মরিবে তো নিশ্চয়, শেষে বাপ, মার ও স্ত্রীর চিরদিনের অভিসম্পাতের পাত্রী হইয়া থাকিব, অন্য ডাক্তার ডাকিতে বল। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, দেখ, আমরা তো তেমন কিছু জানি না, বই পড়ে ঔষধ দিই, তোমার ছেলের একটু শক্ত ব্যারাম হইয়াছে, অন্য একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাও। তখন সে বলিল, বাবু আমরা তিনটি ভাই এক সঙ্গে থাকি, গত বৎসর কলেরাতে (সেই বৎসর রাঁচির সহর হইতে মফঃস্বলের প্রতি গৃহেই কলে-

গ্রামে ২।১ জন হইলেও লোক মরিয়াছে) আমাদের এক বাড়ীতেই ১০ দশটী ছেলে মারা গিয়াছে। গ্রামে কোন ডাক্তার বা কবিরাজ নাই, যদি দয়া করে ঔষধ দেন, তাহা হইলে পেটে একটু ঔষধ পড়িবে, তা না হলে অমনি থাকিবে। বাবু, এই আমার বড় ছেলে, এই বলেই বুড়ো কাঁদিতে লাগিল। তখন বাবু বলিলেন, যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা ভাল নয়, তাড়াতাড়ি বই খুলিয়া দুজনে মিলিয়া ঔষধ ঠিক করিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর খেতে দিলাম। আর পিপাসা লাগিলে একটু একটু করিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডাজলও দিতে বলিলাম। সারা দিন ঔষধ দেওয়ার পর বিকাল বেলা গা একটু গরম হইল, যাহা হউক সারা রাত্রিই আধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধও ব্যবস্থা করা হইল। মাঝে মাঝে লোক পাঠায়ে সংবাদ আনিয়া ঔষধ পরিবর্তনও করিলাম। সকাল বেলা রোগী আপনাকে অনেক সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে একটু সুস্থ বোধ করিল। ক্রমে যত সংবাদ পাইতে লাগিলাম, তাহাতে রোগী ক্রমশঃ আরামই পাইতেছে বুঝিতে পারিলাম। যখন যে ঔষধের আবশ্যক হইত, তখনই সেই ঔষধ দেওয়া হইত, তিন দিনের দিন একটু প্রস্রাব হইল। এই রোগীটার জন্য আমাদের যে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ হইয়াছিল তাহা এখন ভাষা দ্বারা বুঝান অসাধ্য, কারণ দায়িত্ব যখন মাথায় পড়ে, তখন আপন পর জ্ঞান থাকে না। কি রকম করে তাহাকে রক্ষা করা যায়, দিনরাত্রি কেবল দুজনে এই চিন্তাই করিতাম। যাহা হউক, ভগবানের অশেষ কৃপায় রোগী এ যাত্রা রক্ষা পাইল। আমরা এ গ্রামে প্রায় মাসাবধি ছিলাম। এ রোগী আরোগ্য হওয়াতে প্রতিদিনই ঔষধ লইবার লোক বাড়িতে আসিতে লাগিল। ঔষধের প্রতি প্রতিজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। একবার দুবার খেলেই বলে ভাল হয়ে গেছি, আর খাব না। আপনারা দূরে আছেন, আমি উপস্থিত থাকিয়াও অনেক সময় ওদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। মনে করিতাম বুঝি ফাঁকি দিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক ওরা সত্যই আরোগ্য লাভ করিত। একেতো কোন দিন ঔষধ খায় নাই তার উপরে বিশ্বাস, এই দুইই উহাদিগকে আরোগ্য করিত। মাঝে মাঝে মেয়েরা ছেলে হইবার ঔষধও চাহিতে আসিত।

দেব প্রসাদে খুব প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর আমার যে সমস্ত দোষ ও ক্রটী ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আমি অনুতপ্ত হইতেছি। প্রভু বলিয়াছেন, "যে আমার একজন সন্তান কেও ফিরাইবে, সে আমাকেই ফিরাইবে।" নিজের সুবিধার জন্য প্রভুর অনেক পুত্রকন্যার প্রাণে কষ্ট দিয়াছি, কখন ও বা কেহ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছে। রোগীর সব দোষ মার্জ্জনীয়, এই মহাবাক্য প্রায় অনেক সময়ই মনে রাখিতে পারিতাম না। সময় অসময় নাই, যখন যার ইচ্ছা সে তখনই আসিত, তাই সময় সময় বিরক্ত হইয়া যাইতাম। আজ সেজন্য প্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

তিনি আমাকে দোষ ত্রুটী দূর করিবার উপযুক্ত বল বিধান করুন।

৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯১০।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দিল্লীনগরে মহিলাদের মেডিকেল কলেজ:—দিল্লীদরবারের পর ভারতের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী কোটারাজ্যে গমন করেন, তদুপলক্ষে কোটার মহারাজা দিল্লীতে মহিলাদের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিতে এক লক্ষ টাকা দান করেন। মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিবেন, কেননা পুরুষদের সঙ্গে একত্র শিক্ষা লাভ করিতে হয় বলিয়া উপযুক্তসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলা এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন না। এই কারণে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট মহারাজার এই উদার দানকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়া দিল্লীতে মহিলাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট মেডিকেল কলেজ স্থাপনার্থ ভারতীয় রাজাদিগের নিকট হইতে যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের মনস্থ করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সংবাদ দৃষ্টে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, হায়দরাবাদের নিজাম, মহারাজা সিন্ধিয়া, মহারাজা হোলকার, বিকানীরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, আগা খাঁ, দারভাঙ্গার মহারাজা এবং অন্যান্য রাজাদিগের নিকট এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধেক টাকার স্বীকৃতি পাওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় ললনাগণের দুঃখ দূরীকরণ যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্যে সাহায্য দান করিতে দাক্ষিণাত্যের নৃপতিবৃন্দ তাঁহাদের ভ্রাতৃস্থানীয় পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের পশ্চাৎপদ হইবেন না। আমরা বিবেচনা করি, বর্ত্তমানে এই কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি তেমন দরকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এবিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজে ভারতীয় নারীবৃন্দের প্রকৃত ও স্থায়ী উপকারের উপাদান সকল নিহিত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, ভারত সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী দিল্লীনগরে এই বিদ্যালয়টি কোন অংশে হীন হইবে না।

বিবাহিত মহিলাগণের জন্য বিদ্যালয়:—সম্প্রতি লাহোর নগরে ভারতীয় ললনাদিগের কর্ত্তৃক মহিলা শিক্ষা বিষয়ে একটি বৃহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বর্ত্তমান ও অতীতের পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন। সেখানে অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহিত মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ বিষয়ে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়।

ভারতে লেডি ডাক্তারদের পৃথক্ সার্ভিস স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডে একটি আন্দোলন চলিতেছে। আমরা জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম, কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতে মহিলাদিগের মেডিকেল কলেজের বিধানই এইরূপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্ত্তী কারণ মনে করিতেছেন। লেডি হার্ডিং মহিলাদিগের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিয়া নৃপতিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। দিল্লীতে এরূপ একটি কলেজ দূরবর্ত্তী স্থানের মহিলাগণের অবাধ গন্তব্য হইবে কেন, ইহা জ্ঞাতব্য বিষয় বটে। কিন্তু যদি এই আন্দোলন সুপথে পরিচালিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে অন্যান্যেরা প্রাদেশিক কলেজ স্থাপন জন্য ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট যে কোন রূপেই হউক এরূপ একটি বিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ব্রহ্মদেশে বিবাহ প্রথা :—বিবাহের উমেদারি ও বিবাহ বিষয়ে ব্রহ্মদেশীয় কুমারী যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যান্য উন্নততর দেশের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর। গৃহকন্যার একমাত্র ব্যবহারের জন্য রাস্তামুখো করিয়া স্বতন্ত্র একটি কুঠরী নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন কোন কুমারী স্বামীপছন্দ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে প্রজ্বলিত প্রদীপ জানালাতে স্থাপন করে, এবং যে কোন যুবক আপনাকে নির্ব্বাচনের উপযুক্ত মনে করে, সে উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পারে। যদি সে কুমারী তাহার সঙ্গে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে আর একটী প্রদীপ প্রথম প্রদীপের পার্শ্বে স্থাপন করে। তখন সেই কুমারী সেই যুবকের পার্থিব সম্পত্তির তালিকা চাহিয়া বসে। যদি সেই সাক্ষাতের ফলে সেই কুমারী সন্তুষ্ট না হয়, তবে সেই যুবকের প্রস্থান করিবার চিহ্নস্বরূপ তৃতীয় প্রদীপ জানালায় স্থাপন করে। সে চলিয়া গেলে দুইটী প্রদীপ স্থানান্তরিত হয় এবং তৎপর অন্য প্রার্থী আগমন করে।

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম সকলে অত্যন্ত জলকষ্ট একথা সকলেই জানেন। যে সকল গ্রাম নদীতীরে স্থিত তাহাদিগের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন, কিন্তু সাধারণত গ্রাম মাত্রই জলের অভাব অনুভব করে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক স্থানে জলের এত অভাব হয় যে, যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়া দুরূহ হয় এবং যে জল পাওয়া যায় তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর। বঙ্গদেশের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এই বৎসরে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই অনেক জেলার সদর ষ্টেশন স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন এবং যে স্থানের যে বিশেষ অভাব তাহাও জ্ঞাত হইয়াছেন। ইহা অতি আশা ও আনন্দের কথা যে, মহামতি লর্ড কারমাইকেল সম্প্রতি দার্জিলিং বাস কালে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত এ বিষয়ে মন্ত্রণা করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা

করিয়া ও সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া সভা হইতে চলিয়া যান। তৎপর মাননীয় মেঃ সমসুলহুদা সভাপতি হইয়া মন্ত্রণা সভার কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সভায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ও সে সকল বিষয়ে সকলের মত গ্রহণ করা হয়। অপর এক দিনও এইরূপ সভা হইয়াছিল। এই মন্ত্রণাসভার আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিয়া অথবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া জলের অভাব মোচন করাই প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে খাল কাটিয়া অথবা যেসকল খাল মরিয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় গভীর করিয়া দিলে যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলাদেশে কূপের জলে বড় সুবিধা হয় না। ভূমিতে লোহার নল চালাইয়া যে কূপ প্রস্তুত হয়, তাহাদ্বারাও বড় সুফল হয় নাই। এজন্য পুষ্করিণীই অধিকাংশ স্থানের পক্ষে একমাত্র উপযোগী জলাশয়। কিন্তু পুষ্করিণীর জল অনেক স্থানে অপরিষ্কার করা হয়। মানুষের স্নান করা, কাপড় কাচা, পাট বা বাঁশ পচান, গো মহিষাদি ধোয়ান, অপরিষ্কার স্থানের জল পুষ্করিণীতে আসা, পচা পাতা ডাল পালা ইত্যাদি দ্বারা জল দূষিত হয়। কতকগুলি পুষ্করিণী রন্ধনও পানীয় জলের জন্য স্থির করিয়া রাখিলে ও নিকটে গাছপালা হইতে না দিলে ও অন্যরূপে অপরিষ্কার হইতে না দিলে অনেক পরিমাণে উত্তম জল পাওয়া যাইবে। আমরা আশা করি মহামতি গবর্ণর সাহেব যখন এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে আমার রাজত্ব কালে যদি এই অভাব কতক পরিমাণেও দূর করিতে পারি তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব, তখন অতি শীঘ্রই আমাদের পল্লীবাসিগণ জলকষ্ট হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইবেন। ভাল পানীয় জল যে কত প্রয়োজন ও তাহা পাওয়া যে কত সৌভাগ্য তাহা সকলে উত্তমরূপে বুঝিয়া অবশ্য জলকে পবিত্র রাখিবেন ও ভাল জলের সদ্ব্যবহার করিবেন।

সাধু মহাজনেরা যুগে যুগে শান্তি সংস্থাপনের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। নরজাতিহিতৈষিগণ, বিশ্বপ্রেমিকগণ, বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন যে পৃথিবীতে সমরানল আর প্রজ্বলিত না হয়। চিন্তাশীল ব্যবসায়ী লোকেরাও নানা উপায়ে যুদ্ধ বিগ্রহের নিবৃত্তি করিতে যত্নবান আছেন। ফলে সকল সৎলোকেই শান্তি ইচ্ছা করেন. কিন্তু পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরদিন চলিতেছে। এখনও কতকাল মানুষ মানুষের প্রাণ হরণ করিবে. এক দেশ অন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সংবাদপত্রে প্রায়ই মহা অশান্তির, যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইতিহাসে মহা মহা যুদ্ধের বিষয় ও সে সকল দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লবের ও সামাজিক অবস্থার মহাপরিবর্ত্তনের বিষয় অবগত হই, কিন্তু আমাদিগের জীবিতকাল মধ্যেও অনেক মহাযুদ্ধ ও তাহার মহাফল সকল আমরা দেখিতে

পাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ার সহিত তুরস্কের যুদ্ধ হওয়া কতকগুলি নূতন ক্ষুদ্র রাজ্য তুরস্কের শাসন হইতে কতক মুক্তি লাভ করিয়াছিল। এখন সেই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য প্রবল হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ইটালী জানি না কোন্ কারণে তুরস্কের অধীনস্থ ত্রিপলী রাজ্য লইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তুরস্ক কোন বাধা দিতে পারিল না। কার্য্যত সমস্ত রাজ্যটি ইটালীকে দিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইল। গত ১৫ই অক্টোবর ইটালীর সহিত তুরস্কের এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এদিকে তাহার পূর্ব্ব হইতেই তুরস্কের উত্তর এবং পশ্চিমসীমাস্থিত বুলগেরিয়া, সর্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও মেসিডেনিয়ার সহিত যুদ্ধ লাগিয়া উঠিয়াছে। অপর গ্রীসও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং ক্রীটও গ্রীসের সহিত যোগ দিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এদিকে তুরস্ক বহুদিন হইতে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া নূতন প্রণালীতে রাজ্য চালনা কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল সকল একে একে প্রাধান্য লাভ করিয়া আপনাদিগের শক্তি ও ইচ্ছামত রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের সংবাদে দিনদিন কত যুদ্ধের বর্ণনা প্রকাশ হইতেছে, ইহার প্রায় প্রত্যেকটিতে সুলতানের সৈন্যগণ পরাজিত ও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যেমন দেখা যায় তাহাতে যেন ইউরোপে মুসলমানরাজ্য আর থাকে না, যদিও থাকে হয়ত এক কনষ্টান্টিনোপল থাকিবে। এদিকে শুনা যায় খ্রীষ্টিয়ান রাজাগণ ভিতরে২ এরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া এই যুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন, ইহার নাকি কারণ এই যে তুর্কির সুলতানের রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাই খ্রীষ্টিয়ান, সুলতান নাকি ইহাদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। অপর শুনা যায় যে যখন মুসলমান সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া কোন স্থান হইতে পলায়ন করে, তখন সেস্থানের খৃষ্টিয়ানদিগকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আমরা বিশেষ অবগত আছি যে, যুদ্ধের সময়ে যেসকল সংবাদ প্রকাশ হয়, তাহার অনেকাংশ ঠিক নয়। এজন্য মুসলমান সৈন্য বা সুলতানের কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে যেসকল সংবাদ প্রকাশ হয় তাহার অনেক অংশ অতিরঞ্জিত হইতে পারে। যে কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য তুরস্কের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বুলগেরিয়ার সৈন্যগণই অধিক জয় লাভ করিয়াছে। তাহারা হয়ত শীঘ্রই তুরস্কের রাজধানী ইষ্টাম্বুল অথবা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া বসিবে। ইউরোপের মহাশক্তি সকল এখনও কোন সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহারা আপন আপন স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত আছেন। রাজধানী শত্রুর হস্তগত হইবার উপক্রম দেখিলে সুলতান এশিয়া মাইনরে পলায়ন করিবেন। তাহা হইলেই হয়ত ইউরোপ হইতে মুসলমানরাজত্ব উঠিয়া গেল। সময়ে সকল রাজ্যই যাইবে,

কিন্তু আমরা সামান্য মানব, একটা মহা শক্তির পতন দেখিলে মনে ক্লেশ হয়। অপর দিকে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, মুসলমান সৈন্যগণ স্থানে স্থানে জয়ী হইতেছে।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় (২০নং বীডন ষ্ট্রীট ভবনে)। পূজা উপলক্ষে ইহার সকল বিভাগেই প্রায় একমাস কাল বন্ধ ছিল, গত ২৭শে কার্ত্তিক, ১২ই নবেম্বর মঙ্গলবার বালিকাবিদ্যালয় ও ছাত্রী আবাসের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। মহিলাগণের সীবনশিক্ষাবিভাগের কার্য্য ও বিবিধ বিষয়ের বক্তৃতাবিভাগের কার্য্য শীঘ্রই পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবে। যে সকল পিতা মাতা, অভিভাবক বা অভিভাবিকা আপনাদিগের বালিকাগণকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিংবা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করিবেন। এই বিদ্যালয়ে ভদ্র মহিলাগণের জন্য প্রতি সপ্তাহে যে সকল বক্তৃতা হয় তাহা শ্রবণ করিতে যাঁহারা উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইলেই সাগ্রহে নিমন্ত্রিত হইবেন—যাঁহারা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ স্থানে বাস করেন তাঁহারা বিনাব্যয়ে বিদ্যালয়ের গাড়ীতে আসিতে পারেন।

নারীশিক্ষার পক্ষপাতী ও দেশের হিতকাঙ্ক্ষী ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণের এবং উদার গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি যে, ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের একটী প্রধান উদ্দেশ্য আজ পর্য্যন্ত কিছুই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশে এমন একটা হীনভাব আসিয়াছে যে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদ্যালাভ করা অতি দুর্লভ হইয়াছে। যুবকগণ সাধারণতঃ বিদ্যাকে উপাধি ও পদলাভের উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং উক্ত দুইটি বস্তু লাভ হইলেই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ শেষ করেন; বালিকাশিক্ষা বিষয়েও কার্য্যতঃ এই প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এখন কন্যার জন্য যোগ্য বর পাইবার অভিপ্রায়ে কন্যাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়—যদি বালিকা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারে তাহা হইলেই যেন উচ্চ পদস্থ বরের যোগ্যা হয়। অপর দুই একটা পাস হইলে উচ্চ বেতনে কর্ম্ম করিতে পারে, সে দিকে অনেকের দৃষ্টি; ইহাই কি মানসিক উন্নতিসাধনের লক্ষ্য! কি দুঃখের বিষয়।

কুমারীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার গুরুভার বহন করিয়া অনেক সময়ে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হারান। ফলতঃ যৌবনের প্রথমে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করাতে অনেক অনিষ্ট হয়, এজন্য কুমারীগণ যাহাতে সহজে সাধারণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, মানসিক বিকাশ ও উন্নতিলাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করা ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের অন্যতর উদ্দেশ্য। এখন এরূপ শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন উচ্চশ্রেণীর বালিকা কেবল সুশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে প্রস্তুত হন নাই, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরও সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেশের সকল চিন্তাশীল মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের নিকট অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে নিবেদন করি যে, তাঁহারা এদেশের নারীশিক্ষা বিষয়ে রুচির সংস্কার করিতে যত্নবান্ হউন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৮শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। ডিসেম্বর, ১৯১২। [৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বমঙ্গলময় পূর্ণ ব্রহ্ম, তুমি নরনারীকে শত শত স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করিয়াছ। তাঁহারা তোমার কৃপায় সৃষ্টির সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা তোমার চরণ পূজা করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তোমার ইচ্ছা জগতে ও জীবনে পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইবার অধিকার পাইয়াছেন. পৃথিবীর নরনারী তোমার কৃপায় যে উচ্চ অধিকার সময় সময় লাভ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া সমস্ত নরজাতি আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ধন্যবাদ দান করি যে,তুমি পৃথিবীর সামান্য নরনারীর ভিতরেও এমন ধন রাখিয়াছ যে তাঁহারা তোমার পথে চলিবার সময়ে সেই উচ্চ অধিকার লাভ করিবেন। ফলে যাঁহারা উচ্চ জ্ঞান, উচ্চ চরিত্র, মহদ্ভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে তোমার প্রেম পুণ্যের সৌগন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমরা সহস্র সহস্র ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া তোমার গুণানুবাদ করি। কিন্তু দেবতা, যদিও তুমি এমন অধিকার নরনারীকে দিয়াছ, একবার দেখ যে তোমার কত অধিক সংখ্যক পুত্রকন্যা তোমাকে ভুলিয়া সংসারে ডুবিয়া অতি দুর্দ্দশায় জীবন যাপন করিতেছেন। বিশেষ যখন আমরা তোমার এ দেশের কন্যাগণের কথা মনে করি, তখন যেন মনে হয় তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ নিয়তি ও অধিকারের বিষয় কিছুই জানেন না। হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহাতে যেন মনে হয় এদেশের তোমার প্রায় সকল কন্যাই কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন; তাঁহাদের জন্য তুমি যে সুন্দর নীতি, চরিত্র, প্রেম, জ্ঞান, সুখ, আনন্দ, শান্তি রাখিয়াছ, তাঁহারা একাগ্র হইয়া যত্ন ও প্রার্থনা করিলে সকল নীচতা, অজ্ঞা-

নতা, সংকীর্ণতা, অশুদ্ধতা ও শোক হইতে রক্ষা পাইতে পারেন একথা যেন তাঁহারা মনে স্থানও দেন না। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, বিধি নরনারীর মনে উন্নতির ইচ্ছা স্বাভাবিক করিয়া দিয়াছ, যদি পৃথিবীর নানা দেশের নারীগণ প্রকৃত উন্নতির জন্য যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তবে কৃপা করিয়া তোমার এদেশের কন্যাগণকে সকল প্রকার প্রকৃত উন্নতি লাভের জন্য ব্যাকুল কর।

নারীর সময় বৃথাব্যয়।

মানুষের জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সময় সেই সময়েরই নাম ইহজীবন। সুতরাং ইহলোকে থাকা পর্য্যন্ত সময় ও জীবনে কোন বিভিন্নতা নাই। সময় যাওয়াই জীবন শেষ হওয়া। এজন্য কথিত হয়, সময় বৃথা যাপন করিও না। ঈশ্বরের বিধানানুসারে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলে বাল্য যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য অবস্থা লাভ করে। বাল্যকাল এবং যৌবনেরও অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষার সময়। যৌবনের শেষ ভাগ, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যের প্রথম ভাগ সকলের পক্ষেই কার্য্যকাল। শরীরকে ঈশ্বর বাহ্য জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নিয়মাধীন করিয়াছেন। সেই নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি কেহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে তাহার শরীর নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অতএব কাহারই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যথাকালে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য-সমাপন, শ্রম, আহার, বিশ্রাম এবং নিদ্রামগ্ন হওয়া আবশ্যক। প্রতিদিন আহারাদিতে অধিকাংশ লোকের ১০ বার ঘণ্টা কাল যাপিত হয়। বার ঘণ্টার অধিক প্রায় কেহ শিক্ষায় বা কার্য্যে কালক্ষেপ করে না। নারীর শরীর স্বভাবতঃ কোমল ও দুর্ব্বল। এজন্য নারীজাতি সকল দেশেই পুরুষাপেক্ষা বিশ্রাম ও নিদ্রায় অধিক কালক্ষেপণ করিয়া থাকে। অনেক সমাজেই নারীজাতি পরিবারবর্গের সেবায় অধিক সময় কাটাইতে বাধ্য হয়। সকলকে সুখী ও আমোদিত করা নারীজাতিরই কর্ত্তব্য মধ্যে গণিত। এজন্য নারীজাতি আমোদপ্রিয়। ক্রীড়া, গীতবাদ্য, পরিহাস, রসিকতা নারী জাতির স্বভাবসিদ্ধ গুণ। নারীজাতিকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে ঐ সকল বিষয়েও বিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষা দেওয়া এবং উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। যদিও কলাবিদ্যাতে পুরুষই অদ্যাবধি পৃথিবীতে সুখ্যাতি লাভ করিতেছে, তথাপি ন্যায়ত বিচার করিয়া বলিতে হইবে যে কলাবিদ্যায় নারীজাতিই অধিকারিণী বটে।

ধর্ম্মরক্ষা, সংসাররক্ষা, আমোদ আহ্লাদ রক্ষা সকলই নারীর কার্য্য। অথচ নারীর জন্য বিশ্রাম, নিদ্রা, ক্রীড়া পুরুষাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। নারী পুরুষের পক্ষে পত্নী ও গৃহিণী; শিশু এবং বালকের পক্ষে আদর্শ ও জননী। এহেন নারীকে নারীর উপযোগী শিক্ষাদান যে অত্যন্ত গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। ধর্ম্ম যদি নারী-

দিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার শিরোমণি না হয়, তবে নারী আপন জীবনের উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন না। ধর্ম্মের ভয়ে নারীর শরীরমন কণ্টকিত থাকিবে, এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রফুল্ল কমল নারীহৃদয়ে সদা প্রস্ফুটিত থাকিবে। তবে নারীর জীবন পত্নীরূপে, জননীরূপে এবং ভগিনী ও সঙ্গিনীরূপে সকলকে সর্ব্বাবস্থায় পরিপোষণ ও পরিরক্ষণে সমর্থ হইবে। এই বিচিত্র কার্য্যে নারী ব্যাপৃত হইয়া বৃথা সময় যাপন করিতে পারেন না। আমাদের দেশে নারীগণ সামাজিক জীবনে সর্ব্বদা সঙ্গিনীরূপে বর্ত্তমান থাকেন না। অদ্যাবধি নারীদিগের শিক্ষাও সর্ব্ববিষয়ে সুন্দর রূপে আরম্ভ হয় নাই। প্রাচীন হিন্দুসমাজের মহিলাগণ আপনাদের মধ্যেই সামান্য রূপ শিল্পকলার চর্চ্চা করিতেন, আপনারাই কোন কোন সময়ে কোন প্রকারে সংগীতের রসাস্বাদন করিতেন। অবসরকালে আপনারাই কোন না কোন রূপ ক্রীড়ামোদ ভোগ করিতেন। পুরাকালে কোন কোন রমণী স্বভাবতঃ অতি সুন্দর পরিহাস রসিকতা দ্বারা অন্যকে আনন্দিত করিতেন। পাশ্চাত্য প্রণালীর জ্ঞান চর্চ্চা এদেশে পদার্পণ করিয়া সে সকল নির্ব্বাসিত করিয়াছে। অথচ উন্নত প্রণালীতে জ্ঞান শিক্ষার সহিত মহিলাসমাজে শিল্প কলাদির শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অনেকের মধ্যে অধুনা তাসখেলা এবং নাটক পড়ার আমোদ প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। কিন্তু যে ভাবে এই দুই ব্যাপার বঙ্গীয় মহিলাকুলে অধিকার বিস্তার করিয়াছে ইহা যে কামিনীগণের জীবন বা সময়নষ্টকারী এবং দূষণীয়, তাহা অল্পকাল মধ্যে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অথচ এবিষয়ে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রচলন ভিন্ন নিকৃষ্টের নিঃসরণ কি সম্ভব হইবে?

বঙ্গদেশে এখন অনেক শিক্ষিতা মহিলা স্বকীয় কুলের কল্যাণ চিন্তা করেন। ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলে এসকল বিষয়ে মহিলাগণ সমালোচনা ও উপযুক্ত বিধান স্থির করুন, আমাদের এই মাত্র নিবেদন। অনেক শিক্ষিতা ললনাই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভারতের ললনাকুল না জাগিলে ভারত জাগ্রত হইবে না। সুশিক্ষা-প্রভাবে ধর্ম্মগত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ত্যাগ করা স্বাভাবিক। শিক্ষার প্রভাবে যথাসময়ে উহা স্বতঃই ঘটিবে। কিন্তু সত্য ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি যাহাতে নারী হৃদয়ে স্থানলাভ করে, তৎসহ পরিবার ও সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতি সাধিকা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা যাহাতে নারীজাতির জীবনে বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হইবে। নারীগণ এবিষয়ে উদ্যোগিনী হইলে পুরুষগণ সমুদায় শক্তির সহিত সহায়তা করিবেন। নারীর জীবন, নারীর সময় যেন কোন মতেও বৃথা না হয় ইহাই প্রার্থনীয়। শিক্ষা-প্রভাবে ক্রমে দৃষ্ট হইবে যে, আমোদ আহ্লাদ খেলায় সময় যাপন বৃথা কালক্ষেপ নয়। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় কালযাপনও কোন মতেও বৃথা নহে; এমন কি গল্প ও পরিহাসে নারীগণ অন্যকে যে আনন্দদান করেন তাহাও বৃথা কালক্ষয় নহে।

মূল কথা এই যে, মানুষের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য যদি ধর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হয়, তবে কোন কিছুই নিরর্থক হইতে পারে না।

নিরন্তর অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা, নিরন্তর গৃহকার্য্যে তৎপরতা, নিরন্তর কঠোর কর্ত্তব্যে মগ্নতাও নারীর পক্ষে স্বাভাবিক নহে। উহা বৃথা; কেননা উহা অনুষ্ঠিত হইলে নারীপ্রকৃতি বিকৃত হয়। যে সকল কুলকামিনী অধুনা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সময়ের সম্যক্‌ভাগ ঐরূপে ব্যয় করিয়া কি সার্থকতা বোধ হয়? প্রকৃতির পরিতুষ্টি না হইলে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করা যায় না। ঈশ্বর নরনারীকে যে জন্য ঐহিক জীবন দান করিয়াছেন তাহার সকল দিকে দৃষ্টি না পড়িলে, সকল দিক বিকাশ না পাইলে সময় বা জীবন সফল হইল একথা কোন পুরুষ বা নারী সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। আমাদের জীবনের সময় কোন এক আদর্শ কোন বিষয়ে বৃথা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আবার অন্যরূপ আদর্শে তাহা বৃথা গণ্য হয় না। ক্রীড়া, বিশ্রাম, আরাম, আমোদ, সংগীত, কথোপকথন কিছুই বৃথা নহে। উদ্দেশ্যবিহীন হইলে সকলই বৃথা। সত্য ঈশ্বর এবং অন্তরস্থ বিবেকের অধীন হইয়া মহিলাবৃন্দ যাহা করেন, তাহাই সুফল প্রদান ও সময়কে সার্থক করিবে।

সঙ্গীত চর্চ্চা।

ভক্ত কবি গাইলেন "আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ, আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।" এই যে বাসনার অনুগামী হইয়া মনুষ্য সন্তান দুঃখ অনুভব করে, এ দুঃখও তাহার দূর করিবার জন্য যিনি বিশ্বসংসারকে আনন্দময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সঙ্গীতের ভিতরে শান্তি, আরাম এবং আনন্দ ঢালিয়া দিয়াছেন। এজন্য সঙ্গীত মানবজাতির সৃষ্টিকাল হইতেই যে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা যায়। কি সভ্য, কি অসভ্য বর্ব্বর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে সঙ্গীতের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সঙ্গীত যে মনুষ্যের স্বভাবের সহিত সংযুক্ত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু মনুষ্য কেন? সঙ্গীতের মাধুর্য্যে পশু, পক্ষী এবং সরীসৃপ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু দেখা যায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের স্বরাবলী পশু পক্ষীর স্বর হইতেই গৃহীত হইয়াছে। পাঠিকাগণের স্মরণার্থ এখানে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে। সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্তস্বরের নাম অনেকেই জানেন। ইহার বিশেষ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সা—ষড়জ—কেকারব, ময়ূরের শব্দ। (১) নাসা, (২) কণ্ঠ, (৩) মূর্দ্ধা, (৪) তালু, (৫) জিহ্বা, এবং (৬) দন্ত এই ছয়টী স্থান স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া উহাকে ষড়জ বলা হয়। সপ্তস্বরের প্রথম স্বর।

ঋ—ঋষভ, গো অথবা চাতকের স্বরের তুল্য স্বর। ইহার উৎপত্তি স্থান নাভিমূল। সপ্তস্বরের দ্বিতীয় স্বর।

গা—গান্ধার, ছাগস্বরতুল্য স্বর। নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া কণ্ঠ ও শীর্ষ আহত করিয়া গমন করে। সপ্তস্বরের তৃতীয় স্বর।

মা—মধ্যম, ক্রৌঞ্চস্বরতুল্য স্বর। উৎপত্তি স্থান বক্ষঃ। সপ্তস্বরের চতুর্থ স্বর।

পা—পঞ্চম, তন্ত্রী কল্পিত স্বর-বিশেষ। উচ্চারণ স্থান উরস্, গলা ও শির। সপ্তস্বরের পঞ্চম স্বর।

ধা—ধৈবত, নারদ মতে অশ্বস্বর-তুল্য। তানসেন মতে ভেকস্বরতুল্য। ইহার উচ্চারণ স্থান ললাট। সপ্তস্বরের ষষ্ঠ স্বর।

নি—নিষাদ, হস্তিস্বরতুল্য স্বর। উচ্চারণ স্থান ললাট। সপ্তস্বরের সপ্তমস্বর।

উল্লিখিত বিশেষ পরিচয় হইতে দেখা যায় যে ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, অশ্ব এবং হস্তী এই সকল পক্ষী ও পশুর স্বরাবলম্বনে সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এক মনুষ্যের স্বভাবে ইহার সমুদয়ই আছে এবং ইহাদের স্বাভাবিক যোজনাতে সঙ্গীত সমুৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের স্বভাবের সহিত স্বরের এবং সঙ্গীতের নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়াই পক্ষিগণের শব্দ সকলও গান নামে অভিহিত হইয়াছে। পাখীর শব্দে কোনও ভাষা নাই, সুতরাং 'বৌ কথা কও' বলিলেও যা, 'বৌ চরকা তোল' বলিলেও তা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এবং ভাষাতে এক পক্ষীর বা এক পশুর শব্দেরই বিভিন্ন নাম বা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্য নিজে কোনও স্বর প্রস্তুত করে নাই। স্বরশ্রবণে তাহার অন্তরে যে তদ্ভাবব্যঞ্জক ভাব উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ধরিয়াই সে স্বরের আখ্যা প্রদান করিয়াছে। চোখ্ গেল পাখী কখনই কাহাকেও চোখ্ গেল বলে না। কিন্তু তাহার শব্দে যখন মনে ঐ ভাব উৎপন্ন হইল তখনই মনুষ্য ঐ পক্ষীর অন্য নাম না জানিয়া উহাকে চোখ্ গেল পাখী নাম দিল। যাহা হউক আমরা সঙ্গীতের বা স্বরের স্বাভাবিকত্ব দেখাইতে যে কয়টী কথা বলিলাম, তাহাই বোধ হয় এস্থলে যথেষ্ট হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে যে আর্য্য-জাতির মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল, তাহা অনায়াসেই গন্ধর্ব্ব শব্দ হইতে প্রমাণিত হয়। গান করাই গন্ধর্ব্ব জাতির কার্য্য ছিল এবং এজন্য সঙ্গীত শাস্ত্রের অপর নাম গান্ধর্ব্ববিদ্যা। আর্য্যদিগের মধ্যে একটী জাতি সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া তদ্দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গন্ধর্ব্ব নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, আর্য্যগণ বিলক্ষণ রূপেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। সামবেদের শেষে গান্ধর্ব্ববেদ নামে একটী অধ্যায় আছে। উহাকে আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদের ন্যায় একটী উপবেদ বলা হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যজাতি সোপান পরম্পরায় সভ্যতার শিখরে আরোহণকালে সঙ্গীতচর্চ্চাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়া-ছিল। জাতীয় উত্থান পতনের সঙ্গে যে ঐ চর্চ্চারও উত্থান ও পতন ঘটিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজ-

তের সময় বিশেষতঃ মোগল সম্রাট-চূড়ামণি আকবরের সময় পুনরায় ভারতে সঙ্গীত-চর্চ্চা বিশেষভাবে আরব্ধ হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা যে আর্য্যঋষিগণের ভাবে নয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আমরা যখন অমরাবতীতে ইন্দ্রের সভায় পুরাণোক্ত গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধরী ও অপ্সরাদিগের গান ও নৃত্যাদির কথা স্মরণ করি, তখন দেখিতে পাই সঙ্গীতশাস্ত্র যেন কেবল বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সামবেদের শেষে গান্ধর্ব্ববেদ নামে যে একটী অধ্যায় আছে তাহার বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্মসাধনের একটী উপায়রূপে সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটী শাস্ত্রীয় বচনও এদেশে জন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। বচনটী যদিও অনেকের মুখেই শুনা গিয়া থাকে, তথাপি এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বচনটী এই :—"গানাৎ পরতরো নাস্তি"। অর্থাৎ সঙ্গীতের সহায়তায় যে ধর্ম্ম সাধন হয় অর্থাৎ পরমাত্মাতে আত্ম সমাধান করিবার সুযোগ হয়, তাহার তুল্য সহজ ও স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। আমরা শৈশব কাল হইতে ভক্ত রামপ্রসাদ, মুনসি রাম দুলাল প্রভৃতির নাম ও তাঁহাদের রচিত মাতৃবিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া আসিতেছি। তাঁহাদের সঙ্গীত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাধারণে প্রচারিতও হইয়াছে। আজ কাল শিক্ষিত সমাজে উহা প্রচলিত না থাকিলেও সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে তাহা বিলক্ষণ আদৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়কৃত সঙ্গীত সকল এক সময় শিক্ষিত সমাজে খুব প্রচলিত ছিল। শত শত শিক্ষার্থী যুবকের মনে রামমোহনকৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে। 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।' 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।'

এই সকল কথা যাঁহারা একটু স্থির-চিত্তে চিন্তা করেন তাঁহাদের যে মানব-জীবনের চঞ্চলত্ব ও পরলোকের সম্বল সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা যুগপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহনকৃত সঙ্গীতের আর পূর্ব্বের মত চর্চ্চা শিক্ষিত সমাজে নাই। বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে, রাজার সঙ্গীতের পরে সঙ্গীতপ্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কৃত সঙ্গীত অনেকে গাইতেন। এক্ষণে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও কোন কোন স্থলে রজনীকান্ত সেন কৃত সঙ্গীত সকলের শিক্ষিত সমাজে বাহুল্য-প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলিতে কি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বর্ত্তমান সময়ে যে এত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ তদীয় মিষ্ট সঙ্গীত।

এক্ষণে আমরা মূলতত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সঙ্গীত-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতির মধ্যে কিরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় তাহার বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। ভক্ত কবি বিহুদিরাজ দায়ূদ

যে সকল সামগান-সঙ্গীত রচনা করিয়া যিহুদিজাতিকে পৃথিবীর মহোচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পুরাতন বাইবেল শাস্ত্রের সহিত এক্ষণে পৃথিবীর সহস্র সহস্র ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সভ্য অসভ্য সকল জাতিকে ঈশ্বরোপাসনার সহায়তা প্রদান করিতেছে। এদেশেও আমরা দেখিতে পাই যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে দাউদের গীত উপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের ভিতর দিয়া ভারতে, তেমনি প্রাচীন যিহুদিজাতির ভিতর দিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে সঙ্গীত ঈশ্বরোপাসনার প্রধান সহায়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্গীত বিশুদ্ধ আমোদ লাভের এবং চিত্তবিনোদন করিবারও প্রধানতম উপায়। তবে এক্ষণে সঙ্গীতের ব্যবহার সম্বন্ধে দুইটী দিক পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে।

সঙ্গীত-চর্চ্চা-সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহা অনেকেই জানেন, নূতন কিছুই নহে। তবে আমাদের নূতন করিয়া কিছু বলিবার না থাকিলে এ প্রস্তাব আজ উত্থাপন করিবার প্রয়োজন ছিল না।

পাশ্চাত্য সভ্য জাতি সকলের একটী বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, তাঁহারা চির-প্রফুল্ল। তাঁহাদের শরীর যেমন সুস্থ, মনও তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং হৃদয়ও সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য তাঁহারা শুধু পুষ্টিকর বলকর আহার নিয়মিত পরিমাণে, নিয়মিত সময়ে, প্রতিদিন গ্রহণ করেন তাহা নহে, শরীরের স্ফূর্ত্তিজনক বায়ু সেবন ও ক্রীড়া ব্যায়ামাদিও নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলে যথানিয়মে করিয়া থাকেন। মানসিক উন্নতির জন্য জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকাদি অধ্যয়ন তাঁহারা নিয়মিতরূপে করিয়া থাকেন। আবার চিত্তের প্রফুল্লতা-বর্দ্ধনার্থ পেয়ানো, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রযোগে সুমধুর তান-লয় যুক্ত সঙ্গীত গান ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে কি তদনুরূপ অনুষ্ঠান প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি? আমরা অনেক স্থলেই তাঁহাদের শরীর মনের বল ও স্ফূর্ত্তিজনক কার্য্য সকল পরিহার করিয়া কখন কখন হয়ত বিশুদ্ধ সঙ্গীত দ্বারা শুধু চিত্ত বিনোদনের প্রয়াস পাইয়া থাকি।

সঙ্গীতের দেবতা বাগ্দেবী, বীণাপাণি সরস্বতী। এতদ্দ্বারা নারীজাতির সহিত সঙ্গীতের নিগূঢ় যোগ প্রমাণিত হইতেছে। সঙ্গীত-বিদ্যাতে নারীদিগেরই যে শ্রেষ্ঠ অধিকার তাহা পুরাণে বিদ্যাধরীদিগের উল্লেখেও প্রমাণিত হয়। তবে মুসলমান আধিপত্যের সময় যেমন এদেশে নারী জাতির অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র সমাজে নারীদিগের দ্বারা নৃত্য গীতাদি করাইয়া যে বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ পূর্ব্বক চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করা তাহাও চলিয়া গিয়াছিল। পুনরায় ইউরোপীয় জাতিসকলের সমাগমে এদেশে নারীজাতি মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে

সঙ্গে সাহেবদিগের অনুকরণে শিক্ষিত পরিবার সকলে নারীজাতি মধ্যে সঙ্গীত চর্চাও প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্র প্রায় ঘরে ঘরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সঙ্গীত শিক্ষা ও হারমোনিয়ম শিক্ষারও ব্যবস্থা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল যে সময়ের শুভলক্ষণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকের পশ্চাতে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি ভাল জিনিষের সঙ্গে সঙ্গেও মন্দ জিনিষের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সঙ্গীত-চর্চা-সম্বন্ধে আমাদের কোনও কোনও বিষয়ে দুই একটি কথা বলিবার আছে।

ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়, যখন স্বামী অথবা পিতা বা ভ্রাতা বা অপর কোনও আত্মীয় সমস্তদিন সংসার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে করিতে একান্তক্লান্ত,শ্রান্ত, বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হইয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হন, তখন যদি একটী বা দুইটী সঙ্গীতদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করা যায়। যে সকল গৃহস্থের ঘরে এরূপ ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়ই সে পরিবারে সুখ শান্তি আরাম লাভের বেশ একটা উপায় আছে। যে পরিবারে এ ব্যবস্থা নাই সেখানে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও দ্বিমত হইবে না। তবে যাঁহারা এ ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদিগেরও একটী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবার আছে।

একান্ত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে তাঁহারা যেন ভজন-সঙ্গীত সকল আমাদের জন্য, শুধু চিত্তের প্রফুল্লতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার না করেন; ভজনের সঙ্গীত সকল শুধু সাধন ভজন ঈশ্বরারাধনার সময়ই ব্যবহার করিবেন। আর পিতা মাতাগণও সন্তান দিগকে ঐ সকল সঙ্গীত যখন তখন গান করিতে না দেন। ভজন-সঙ্গীত যখন তখন গান করিলে তাহাদের সাধন ভজনের উপযোগিতা আর থাকে না। পশ্চিম দেশীয় সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যেও ভজন-সঙ্গীত ভজনের সময় ভিন্ন গীত হয় না। কিন্তু নূতন সব বিষয়েরই যেমন একটা বাড়াবাড়ি হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার অপ-ব্যবহারও হইয়া থাকে, তদ্রূপ বর্ত্তমান শিক্ষিত পরিবার মধ্যে এবং ব্রাহ্মসমাজেও অনেক স্থলে সঙ্গীতের এত বাড়াবাড়ি সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভজনসঙ্গীতের অপব্যবহার হওয়াতে অনেক ভাল ভাল ভজনসঙ্গীত শুধু আমোদের জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য গীত হইয়া থাকে। আমরা জানি না আমাদের কথা গুলি শ্রোতৃবর্গের কর্ণকে আঘাত করিবে কি না। আঘাতের আশঙ্কাতেই আমরা অনুনয় ও বিনয় সহকারে কথাটী বলিলাম। আশা করি আমাদের কথা রুচি বিরুদ্ধ হইলে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইবার ভয়ে অদ্য এখানে শেষ করা গেল।

একটা কিছু

সবাই ব্যস্ত, কেউ হ'তে, কেউ পেতে, কেউ দিতে, কেউ নিতে। স্রষ্টা হ'তে সৃষ্ট, দেবতা হ'তে মানব, চিন্ময় হ'তে মৃন্ময়, কার লক্ষ্য নয় একটা কিছু ?

এত বড় ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইল, এত যে সৃষ্টির প্রবাহ ব'য়ে চলিল, সবই কি অহেতুক ? এতে কি আনন্দময়ের আনন্দ প্রকাশ হয় নি ? এ বিচিত্র বিশ্বরূপে কি তাঁর আত্মরূপে প্রতিফলিত দেখ্‌বার সাধও ছিল না ? কে বলিবে—না ?

ঐ যে মহাশূন্যে প্রচণ্ডবেগে পৃথিবী ঘুরছে, কারও বাধা মানে না, কারও বারণ শুনে না, কেবল অবিরামগতি অজানা রহস্য হতে রহস্যে ছুটেই চলেছে. ওর কি সম্মুখে ও পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড অভিপ্রায় নাই ? একদিন মহা নীরবতা ভেদ করে ঘোরান্ধকারে শব্দ উঠ্‌ল "হও সৃষ্টি" অমনি হ'ল সৃষ্টি. "এস আলো" অমনি এলো আলো। শব্দ উঠ্‌ল "বেড়ে যাও, পূর্ণ হও" অমনি সব বাড়বার জন্য অগ্রসর হ'ল, পূর্ণতার জন্য ছুট্‌ল। সে অবধি এই মহা ছুটাছুটি, কার সাধ্য রোধ করে এ প্রচণ্ড গতি ?

ক্ষুদ্রতম ঐ পরমাণুটি, নগণ্য ঐ ধূলিকণাটি, ওর উপর এত শক্তির ক্রিয়া কেন ? নিমিষে নিমিষে ওর পরিবর্তন কেন ? আর ওর পাশের সকল অবস্থার সঙ্গে আপনাকে মিলাবার এত চেষ্টা কেন ? তাকে থামতে বল দেখি, যেমন তেমনিটি থাকতে বল দেখি, সে তোমায় তুচ্ছ ক'রে ঐ শুন বলছে "আমি বেড়ে যাব, পূর্ণ হব, একটা কিছু হব।"

আর মানুষের মন ? সে কি এত ছুটাছুটির মধ্যে আপনাতে আপনি বদ্ধ থাকতে পারে ? মহাবিশ্বের মহা আহ্বান—"আয় ছুটি", সেও ত এ আহ্বানে আহূত, সেও ত ঐ মহা নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত, তাই সে জন্ম হতে মরণে, মরণ হতে অনন্ত জীবনে ছুটেই চলেছে। সহস্র চেষ্টা কর, শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে কোন বয়সে তাকে থামাতে পারবে না, সে একটা কিছু হবেই, সে পূর্ণতা লাভ করবেই।

এই "একটা কিছু" যে জগতের মহা লক্ষ্য, মহা চালক। কেউ জেনে কেউ না জেনে, কেউ ব'সে কেউ ছুটে, কেউ ধ্যানে কেউ কর্ম্মে এই লক্ষ্য অনুসরণ কর্‌ছে। জেনে ফেলেছে যে. ধন্য হয়েছে সে। আর "চোখ ঢাকা বলদের মত" অজানা টানে যে এই লক্ষ্য পানে ছুটেছে, পরিণামে ধন্য হতে চলেছে সে।

নিষ্কর্ম্মা ভাই, একটা কিছুর অভাব পুরাবার জন্য তুমি প্রবীণ আত্মীয়ের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর জানি। নিষ্কর্ম্মা মহিলা কখনও আত্মগরিমায়, কখনও পরকুৎসায়, কখনও বা দশবৎসর পূর্ব্বে মৃত আত্মীয়ের জন্য শোকের ভাণ করিয়া বিকট চীৎকারে প্রতিবাসীর কানে তালা লাগাও তা জানি। কিন্তু ও তোমার নিয়তি নয়, ও তোমার স্বভাবের গতি নয়। তুমি যে এসেছ বড় হ'তে, পূর্ণ হ'তে। হাত গুটায়ে ব'সে ভাবছ কি ? ওঠ—ছোট—যা হ'বে তা

হ'য়ে পড়। ঐ ব'য়ে চলেছে মহাশব্দ-তরঙ্গ, মহা গগন কাঁপাতে কাঁপাতে উঠ্‌ছে মহা সুর—"আয় ছুটি", ঐ ব'য়ে চলেছে যুগ যুগ ধ'রে বিপুল জনপ্রবাহ—সবাই ডেকে ব'লে যাচ্চে "আয় ছুটি'। আর ঐ কোন্ অজানা দেশ হ'তে প্রতিধ্বনি তারস্বরে উত্তর দিচ্চে "আয় ছুটি"।

কিসের মোহ, কিসের নিদ্রা? অনন্তের সন্তান, আপনার নিয়তি পুরাও। কিছু আদর্শ পেয়ে থাক হারাও কেন? কিছু টান বুঝে থাক বাধা দাও কেন? ধূলার ঘরখানি ভাঙ্গতে কতক্ষণ, অন্তরে যে তোমার জন্য মণিময় ঘর বাঁধা রয়েছে, অনন্তে যে তোমার জন্য অনন্ত স্নেহ অপেক্ষা কর্‌ছে।

এই একটা কিছুকে চিনে লও, আর তারই দিকে জীবন-তরী ছেড়ে দাও। তোমার মায়ার নঙ্গর আল্গা পেলেই সে আপনি ভেসে চ'লে যাবে। আর এটা ওটা ভাববার দরকার কি? নিকর্ম্মা ভাই বোন, কিছু করবার না থাকে, হরিনাম জপ ক'রে দেখ, এতে সময়ট ও কাট্‌বে ভাল, লক্ষ্যটিও সিদ্ধ হবে।

কিণ্ডারগার্টেন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

২। শিশুশিক্ষায় খেলানা।—ফ্রোবেল শিশুগণের খেলানাপ্রিয়তার সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে খেলারছলে শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি সুন্দর খেলানা প্রস্তুত করেন। তিনি বহু বিবেচনা পূর্ব্বক, মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রানুসারে জড়বিজ্ঞান ও গণিতের মৌলিক নিয়মানুসারে তাহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিশুগণ এইগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞাতসারে সহজে গণিত, জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিখিয়া ফেলে। এই খেলানাগুলি দ্বারা তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়ের অনুশীলন হয়। মনোযোগ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, বিচারশক্তি প্রখর হয় এবং তাহাদিগের বুদ্ধিকে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলে।

৩। শিশু বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী—ফ্রোবেল স্বপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীমধ্যে এমন কতকগুলি শিশুজনসুলভ কার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে শিশুগণের আনন্দের সীমা থাকে না। সেগুলি যথা—Stick laying বা শলাকা স্থাপন; Ring laying বা বৃত্তস্থাপন; Tablet laying বা ফলক স্থাপন; Peas-work বা বীজ সংস্থাপন; Paper cutting বা কাগজ কর্ত্তন; Paper folding বা কাগজ ভাঁজকরণ; Mat-weaving বা শীতলপাটী বয়ন; Perforating বা কাগজ ছিদ্রকরণ; Clay modelling বা মৃন্ময়-গঠন ইত্যাদি। এই শিশুজনসুলভ কার্য্যাবলীর মধ্যে মানব-সমাজের যাবতীয় শিল্পকার্য্যের মৌলিক নিয়ম সকল নিহিত রহিয়াছে। শিশুগণ এই গুলিতে নিপুণতা লাভ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন শিল্পের মধ্যেই সহজে প্রবেশ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাহার উন্নতিসাধন করিতে পারে।

৪। অঙ্কন ও চিত্রশিক্ষা—ফ্রোবেল শিশুপ্রকৃতিমধ্যে অঙ্কন চেষ্টার স্ফুরণ দর্শন করত উহাকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মধ্যে অঙ্কন ও চিত্রশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফ্রোবেলের মত এই যে, শিশুগণকে অতি সহজ সরল রেখাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর জটিল অঙ্কনে উপনীত করিতে হইবে। শিশুগণ প্রথমতঃ দাগা বুলান' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যে পরিমাণে তাহাদের ক্ষুদ্র হস্তলিপি শিক্ষিত ও নিয়মিত হইয়া উঠিবে, এবং মনোবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহারা স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বনে স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারে মুক্তহস্তে অঙ্কন অভ্যাস করিবে। অঙ্কন-শিক্ষাদ্বারা শিশুগণের দর্শনশক্তির অনুশীলন হয়, পর্য্যবেক্ষণশক্তি বিকাশ লাভ করে চিত্তের সমাধান, সত্যচিন্তা ও সত্য কথনের অভ্যাস হয় এবং নীরব কর্ম্মনিষ্ঠার সাধনা হইয়া থাকে। অঙ্কন শিক্ষার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের হস্তলিপিরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

৫। পদার্থপাঠ, প্রকৃতিপাঠ ও বৈজ্ঞানিকপাঠ।—পদার্থশিক্ষা আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ শিশুগণ পদার্থনিচয়ের বিবিধ আকার ও বর্ণবিষয়ে শিক্ষালাভ করে। বস্তুতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞানলাভ হইলে পর, তাহাদিগকে সহজ বৈজ্ঞানিকপাঠ প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের বয়ঃক্রম ও বুদ্ধির বিকাশানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া, তাহাদিগকে সোপানপরম্পরায় উদ্ভিদ্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতির স্থূল স্থূল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানাবিধ ক্রীড়া-সামগ্রী, চিত্রপট, মৃন্ময়মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিবিধ উপকরণ অবলম্বনে এবং জীব-নিবাস, বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতি স্থানে তাহা-দিগকে লইয়া গিয়া শিশুজনবোধগম্য সহজ ভাষায়, প্রত্যক্ষ প্রণালীতে প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৬। নাট্য ও সঙ্গীত।—পদার্থতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিকপাঠ শিক্ষা হইলে শিশুরা ভঙ্গী ও সঙ্গীত সহকারে খেলায় তাহার অভিনয় করিয়া থাকে। টঙ্কশালা, মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ প্রস্তুতের যন্ত্র, দীপশলাকার যন্ত্র, বস্ত্রবয়ন যন্ত্র, কাচপাত্র নির্ম্মাণাগার প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসিয়া শিশুগণ বিদ্যালয়ে অঙ্কনবিদ্যার সাহায্যে তৎসমুদায়ের আলোচনা করে এবং অভিনয় ও সঙ্গীত বর্ণনা দ্বারা এই সকল তত্ত্বকে সজীব ও মনোহর করিয়া তুলে। এতদ্দ্বারা বিবিধ বস্তু ও বিষয়ের তত্ত্ব তাহাদের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া যায়।

৭। শিশুগণের কাহিনী শ্রবণ ও তাহার পুনরাবৃত্তি।—শিশুগণের মনো-যোগ, অনুশীলন ও চিত্তসমাধানের পক্ষে গল্প একটী প্রধান উপায়। তদ্ব্যতীত কাহিনী-শ্রবণ করিতে করিতে স্মৃতি ও ধারণাশক্তি উন্মেষিত হইয়া থাকে। শিশু-গণের মনোযোগ মনোহর গল্পের মধ্যে স্বতঃই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং কৌতু-হলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী মনে করিয়া রাখিতে শিখে।

ইহা হইতে পুনরাবৃত্তির বাসনা তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। অবশেষে কাহিনী-শ্রবণ ও তাহার পুনরাবৃত্তিতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া উঠে যে তন্মধ্যে একটী মাত্রও ঘটনা বিস্মৃত না হইয়া অবলীলাক্রমে পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে পারে। ইহাতে মনোযোগের এতাদৃশ সাধনা হয় যে অন্য সময়ে শিশু যখন পাঠ করিবে বা লিখিবে তখন তদ্গতচিত্তে তাহাই করিবে, অন্য কিছু করিবে না: পুনরাবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা শিশুদিগের মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। সুকাহিনীর, সংকথার নৈতিক উপকারিতা যে কতদূর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

৮। লেখাপড়া ও গণিতশিক্ষা।—কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও গণিতশিখানের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রণালীর শিক্ষা শিশুগণের পক্ষে অতিশয় মনোরম, তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক কোমল প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল।

৯। নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা।—ফ্রোবেল অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কার্য্যদ্বারাই শিশুগণকে নীতিশিক্ষা দিতেন। শিশুদিগের চরিত্র গঠন করিয়া তোলা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপরেই নির্ভর করে। এবিষয়ে বিদ্যালয়ে এমন একটী "আব্ হাওয়ার" সঞ্চার করিয়া রাখা প্রয়োজন, যাহার মধ্যে আসিয়া পড়িলেই শিশুগণ আপনা আপনি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারে অভ্যস্ত হইতে থাকিবে। শিক্ষকের অকপট স্নেহ ও সহানুভূতি, তাঁহার মধুর ব্যবহার শিশুগণের হৃদয় জয় করিয়া তাহাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে বা অসদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত রাখে।

সৌন্দর্য্যবৃত্তির অনুশীলন নীতিশিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। এজন্য ফ্রোবেল শিশুগণকে লইয়া নদীতীরে, প্রান্তরে, উপবনে, নিকুঞ্জে, পর্ব্বতে, উপত্যকায় ভ্রমণপূর্ব্বক প্রাকৃতিকদৃশ্য দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ সম্ভোগদ্বারা তাহাদের সৌন্দর্য্যবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতেন।

কিণ্ডারগার্টেনের নীতিশিক্ষা-প্রণালীও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের শিশুগণকে অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, পীড়িতাশ্রম এবং সাধারণ সেবালয় সমূহ প্রদর্শন, নানাবিধ পুণ্যকাহিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণন এবং অন্ধ, আতুর, রোগী, অনাথ, কাঙ্গাল, গরিবদিগের সাহায্যার্থ ফুল, ফল, আহার্য্য, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান দ্বারা তাহাদিগের অন্তরের নৈতিক বৃত্তিসমূহ স্ফুরিত করিয়া দেওয়া হয়।

১০। ধর্ম্মশিক্ষা।—কি প্রকারে শিশুর মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়, ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত হইয়া উঠে তৎসম্বন্ধেও কিণ্ডারগার্টেন প্রবর্ত্তকের বিশেষ মত ও কার্য্য আছে। তাহা সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক। এ বিষয়টীও শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য।

উপসংহার।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত মত এই যে, শিশুর উপর ছাপা পুস্তকের ভার চাপান উচিত নহে। সে নিজে দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া জগতের নানা বস্তু ও ঘটনার জ্ঞানলাভ করিবে ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নীতি ও চরিত্র লাভ করিবে। ছোট ছেলেকে ভূগোল, ইতিহাস ও ব্যাকরণের পুস্তক কণ্ঠস্থ করাইও না, কিন্তু তাহাদিগকে গল্প বল, ছড়া বলিতে শিখাও, গান গাহিতে ও অঙ্গচালনা করিতে শিখাও, ধূলা কাদা লইয়া খেলা করিতে দাও, ছবি আঁকিতে ও শিল্পকর্ম্ম করিতে শিখাও, বাগান করিতে ও পশু-পক্ষী পুষিতে শিখাও আর এই সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদের বয়স ও ক্ষমতানুসারে অতি সহজ ও আনন্দময় প্রণালীতে, তাহাদিগকে লেখাপড়া ও গণিতশিক্ষা দাও। কতকগুলা বৃথা কথা মুখস্থ করাইয়া তাহাদিগের আনন্দময় শিশুজীবনকে মাটী করিয়া ফেলিও না। তাহাদিগকে শাসন করিবার বা দণ্ড দিবার কোন প্রয়োজন নাই। শারীরিক দণ্ড বা নিষ্ঠুর শাসনে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। শিশুজীবন অতি কোমল, অতি সুন্দর ভালবাসা ও আনন্দই তাহার উপযোগী। শিশু যেমন ভালবাসা বোঝে, এমন আর কে বুঝে? ভালবাসিয়া আনন্দ দিয়া শিশুকে বশ কর, তাহাকে তিরস্কার বা প্রহার করিও না। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মত এই যে, শিশুর মধ্যে যে সজীব কর্ম্মশীলতা খেলার আকারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সংরুদ্ধ করিও না, কিন্তু সে ভাব বাহির হইয়া আসিতে দাও। তাহাতেই তাহার স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই তাহার স্বাস্থ্য ও সুখ, জীবন ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী, স্বয়ং ভগবান্ পুস্তক-নিরপেক্ষ ভাবে তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, পিতামাতা ও শিক্ষক তাহাকে সেই শিক্ষাপথেই সহায়তা করিবেন। অল্পবয়সে বালক বালিকাগণকে পাকাইয়া সংসারী করিয়া তোলা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা স্বাভাবিকভাবে বালক বালিকা থাকে, ততদিন তাদের বাল্যভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রকৃতির প্রণালীতে সহজে শিক্ষা দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী পিতা মাতা ও শিক্ষককে বলে—তোমরা বালক বালিকাগণকে যেরূপ নরনারী দেখিতে চাও, বাল্যকালেই তাহার নিকট তাহা আশা করিও না, কিন্তু তাহাদের বাল্য-প্রকৃতির উপরেই তাহাদের সেই মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের সূত্রপাত কর, দেখিবে যথা-সময়ে তাহারা সম্পূর্ণ নরনারী, প্রকৃত নরনারী হইয়া তোমাদের আনন্দবিধান করিবে *।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

---

* এই প্রবন্ধ শিশু-জীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসুর অনুমত্যানুসারে "শিশু-জীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে সঙ্কলিত করিয়া রচিত হইয়াছে।

জেনারল নোগীর ইচ্ছামৃত্যু।

ইদানীং প্রাচ্য মহাখণ্ডের অন্য কোনও দেশ জাপানের ন্যায় সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। যে মহাভূমি কেবল অতীতের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল, যাহার ভবিষ্যৎ কেবল অন্ধকারময় নিশ্চিত ছিল, তাহারই এক অলক্ষিত ও অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ হঠাৎ জাগরিত হইয়া এবং তাহার জাগরণের সংবাদ অনপেক্ষিত-ভাবে ঘোষিত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিল। তাহার পর হইতে জাপান নানা ভাবে জগতের চক্ষের সম্মুখে নিজকে রাখিয়াছে, কিন্তু যে মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়া জাপান প্রধান সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে একটী হইতে পারিয়াছে, সেই যুদ্ধের প্রধান বীর জেনারল নোগীর ইচ্ছামৃত্যুতে সমস্ত শিক্ষিত জগৎ যেভাবে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। স্বীয় প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে অতি কাপুরুষ এবং ঘৃণিত ব্যক্তির কর্ম্ম, অথচ এই মহাবীর যে কেন এমন ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না এবং সাহস করিয়া তাঁহাকে ঘৃণিত আত্মহত্যা দোষে দোষীও করিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক এই ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন, কারণ আমাদের চক্ষে আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ আর অধিক নাই, অথচ আমরা চক্ষের সম্মুখে যখন একজন মহৎ এবং বীর-পুরুষকে এই দোষে দোষী দেখিতে পাই, তখন তাঁহাকে বিচার করিতে হইলে বাস্তবিকই আমাদের সাবধান হইয়া মতামত প্রকাশ করিতে হয়।

একথা অবশ্য বলিবার প্রয়োজন কিছুই নাই, কারণ ইহা কোনও নূতন সত্য নহে, যে ইহজীবনে আমরা যাহা কিছু লাভ করি তাহার মধ্যে জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা মহাদান। এ দানের আর তুলনা নাই, কারণ ইহা না হইলে আমাদের কোনও অস্তিত্বই থাকে না। আবার সভ্যতা যতই অগ্রসর হইতেছে ততই এই মহাদান অর্থাৎ প্রাণের মূল্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি। অসভ্য বর্ব্বরেরা জীবন যে কিরূপ মহামূল্য রত্ন তাহা কখনও বোধ করে কি না সন্দেহ। আমরা যাহাকে "প্রাণের মায়া" বলি তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের আছে; কোন্ প্রাণীর তাহা নাই? কিন্তু আমাদের জীবন যে আমাদের পক্ষে একটী মহা সৌভাগ্য এবং গৌরবের বস্তু সে ভাব শিক্ষিত সমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে এবং যতই মানবজাতি উন্নত-তর আদর্শের ভূমিতে উঠিতেছে, ততই এই ভাব আরও ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহারও অবশ্যই কোন সীমা আছে। প্রাণ মহামূল্য বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু কি আর কিছুই নাই? ইহা মহৎ বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষা মহত্তর বস্তু কি আমাদের সম্মুখে কখনও উপস্থিত হয় না? ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে তাহা নহে। কত লোকে দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য অকাতরে

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক হিসাবে তাঁহাদিগকেও কি আমরা আত্মহত্যা-দোষে দোষী করিতে পারি? না। কিন্তু তাহা কি আমরা কখনও স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি? তাঁহাদের দোষী মনে করা দূরে থাক, তাঁহাদিগকে আমরা ভক্তির সহিত উচ্চ আসনে স্থান দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সভ্যতার উন্নতির সহিত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, অর্থ এবং মূল্যের আদর্শ ক্রমশই উন্নত হইতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কত উচ্চ আদর্শ আসিয়া পৃথিবীর মহাজাতি সকলের হৃদয় অধিকার করিতেছে। এই সকল উচ্চ আদর্শ যে জাতি প্রাণ অপেক্ষা যত প্রিয় করিতে পারিবেন, সেই জাতি সভ্যতার সোপানে তত উন্নত বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং যে সকল জাতির আদর্শে জীবনের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিবে, সেই সকল জাতি অতি হীন বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। জীবনধারণই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল, ধর্ম্ম, ন্যায়, আত্মসম্মান এ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া যদি আমরা প্রাণরক্ষা করিতে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে ইহাকে কেহ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব বলিতে পারেন না। জীবনের তুলনায় মহত্তর বস্তু যে জাতি বা যে ব্যক্তির যত অধিক আছে, সেই জাতি বা সেই ব্যক্তিকে তত শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং যদি আমরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কোন্ কোন্ বস্তু, অর্থাৎ কোন্ কোন্ আদর্শের জন্য তাহারা প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিতে প্রস্তুত, ইহার তালিকা করিতে পারি, তাহা হইলে এক অতি সহজ উপায়ে জাতিসকলের সভ্যতার মাপ পাইতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, সেই জন্য এক এক জাতির চক্ষে এক এক বস্তু মহৎ এবং শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। এক জাতি যে বস্তুকে জীবনবিনিময়ে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবে, অন্য জাতি সে বস্তুকে অতি তুচ্ছ মনে করিতে পারে। আদর্শের এই ভিন্নতা আছে বলিয়াই এ সকল বিষয় বিচার করিতে আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয়।

বাস্তবিক এই আদর্শের পার্থক্যই এস্থলে আমাদের অন্তরায়। যেমন নানা-দেশে নানা নীতি প্রচলিত থাকিলেও সকলেরই মূলে নীতির কতকগুলি মহাসত্য নিহিত আছে, তেমনই নানাদেশে নানা প্রকারের বিভিন্ন আদর্শ গৃহীত হইলেও সকলেরই ভিত্তিতে প্রকৃত আদর্শের কতকগুলি মহাসত্য অবশ্যই আছে। ইউরোপের বীরগণ এক প্রকার আদর্শে নিজেদের চালিত করিতেছেন এবং জাপানের বীরবংশ অন্য প্রকার ভাবে চালিত হইতেছেন, কিন্তু আদর্শ পৃথক্ বলিয়াই এক দেশ অন্য দেশকে মূর্খ এবং হাস্যাস্পদ বলিতে পারেন না। এমন খুব অল্পসংখ্যক বস্তুই আছে যাহাকে ইউরোপ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করেন, কিন্তু অন্যদিকে জাপানীগণের এমন বহু-সংখ্যক বস্তু আছে যাহার তুলনায় তাঁহারা

প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন প্রায় সকল জাতির মধ্যেই মানবের প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে প্রাণ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু জাপানীগণ প্রাণাপেক্ষা অন্য বহু বস্তু অধিকতর প্রার্থনীয় মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে রাজভক্তির তুলনায় প্রাণ তুচ্ছ, প্রভুর আজ্ঞাপালনে নিজের সর্ব্বনাশ হওয়া অপেক্ষা প্রাণ তুচ্ছ, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রাণ তুচ্ছ। যতক্ষণ জীবনের কতকগুলি আদর্শ পালিত হইতে পারিবে ততক্ষণই প্রাণের মূল্য আছে। অবশ্য এ আদর্শগুলি অন্যের চক্ষে হাস্যাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে জেনারল নোগীর ইচ্ছামৃত্যু বুঝিতে হইলে তাঁহার জাতীয় আদর্শের সহিত তাঁহাকে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, এবং একই সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। তিনি বাল্যকাল হইতে পুরাতন সময়ের সেনানীতির ভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং সে শিক্ষার মূলমন্ত্র "প্রভুভক্তি"। সে শিক্ষায় কেবল জীবনধারণ করা কিছু মহৎ বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং বংশগত নৈতিক এবং সামাজিক আদর্শের ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেই তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালনের সময়ে কর্ত্তব্যই মুখ্যলক্ষ্য এবং প্রাণধারণ গৌণলক্ষ্য। ইহার ফল এই যে কর্ত্তব্যসাধনের পথে মৃত্যু উপস্থিত হইলে পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্যই তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিনাবাক্যব্যয়ে পোর্টআর্থারের যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াও অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে যদি আমরা মনে করি যে, তাঁহার চিত্ত কঠোর ছিল তাহা হইলে আমরা মহাভ্রমে পতিত হইব। কি শত্রু কি মিত্র সকলের মৃত্যুই তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিত এবং মৃতব্যক্তি মাত্রকেই তিনি সম্মানার্হ মনে করিতেন। বাস্তবিক মৃতের প্রতি সম্মান তাঁহার পক্ষে একটী অতি গম্ভীর ও মহৎ বিশ্বাস ছিল। এই জন্য পোর্টআর্থার যুদ্ধের অবসানে তিনি যুদ্ধস্থলে সৈন্য এবং কর্ম্মচারীদিগকে সমবেত করিয়া যুদ্ধে হত সমস্ত পরলোকবাসী আত্মার উদ্দেশ্যে বেদিকা নির্ম্মিত করিয়া তাঁহাদের জাতীয় প্রথানুসারে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং মৃতব্যক্তিদিগের আত্মার উদ্দেশ্যে একটী গম্ভীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে নোগীর চরিত্রের বিশেষত্বের মধ্যে এই ছিল যে, প্রভুর জন্য, তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রকাশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে, তাহা মৃত্যুই হউক বা জীবনধারণই হউক, এবং দ্বিতীয়তঃ মৃতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। এই দুইটি জিনিষ বুঝিতে পারিলেই আমরা নোগীর ইচ্ছামৃত্যু বুঝিতে পারিব। গত ৩০শে জুলাই সম্রাট মৎসুহিতোর মৃত্যু হয় এবং তাহার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে তাঁহার কবর

হয়। যখন মৃতদেহ সমাধিস্থলে লইয়া যাওয়ার সংবাদ কামানধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল ঠিক সেই সময়েই জেনারল নোগী নিজ গলদেশে অস্ত্রচালনা করিলেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাঁহার সহগামিনী হইলেন। নোগীর এই কার্য্য তাঁহার দুর্ব্বলতার চিহ্ন নহে, অসহ্য শোকের দারুণ পীড়নের ফল নহে, কিম্বা উন্মাদের কার্য্য নহে। যিনি স্থিরভাবে একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিয়া পরে অবিচলিত-চিত্তে তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই কার্য্যকে শোকের দুর্ব্বলতাজনিত কি করিয়া বলিব? এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর এই মাসাধিককাল মধ্যে তাঁহাতে উন্মত্ততার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। সুতরাং এ সকল তাঁহার মৃত্যুর কারণ নহে। যতক্ষণ সম্রাটের দেহ চক্ষের সম্মুখে ছিল ততক্ষণ মৃত-প্রভুর প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য নোগী স্থিরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেহ সমাধিতে শায়িত করিবার জন্য নীত হইল, যখন আর কোনও কর্ত্তব্য সম্পাদন অসম্পূর্ণ রহিল না; তখন মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এবং প্রভুভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ কঠোরভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য মনে করিলেন, কারণ এই মূলমন্ত্রই তিনি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এ কার্য্যকে আমরা অন্যায় বলিতে পারি বটে কিন্তু যে ভাবে তিনি তাঁহার আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেইভাবে যে তিনি জীবনদান করিয়াছেন ইহার জন্য তিনি সকলের স্মরণীয়।

অতএব আদর্শ ভিন্ন বলিয়া আমরা ঘৃণিত কাপুরুষের তালিকায় তাঁহার নাম রাখিতে পারি না। আদর্শ যদিও ভ্রমশূন্য নহে, তথাপি উচ্চ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি সকলকে দেখাইলেন যে জীবনধারণ প্রার্থনীয় এবং বাঞ্ছনীয় হইলেও এমন বহু সামগ্রী আছে যাহার তুলনায় জীবনধারণ হেয়। নোগী তাঁহার শিক্ষানুসারে উচ্চ আদর্শানুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার মৃত্যুকে আত্মহত্যা না বলিয়া ইচ্ছামৃত্যু বলিতে বাধ্য হইলাম।

জ্ঞান ও ভক্তি, দোঁহার শুভমিলন।

[জ্ঞান।]

জ্ঞান বলে জগপতি অজ্ঞেয় অপার
ভক্তি বলে প্রাণপতি হৃদয়ে আমার।
পতি দূরে নহে।
জ্ঞান বলে স্থুল সূক্ষ্ম কে বুঝিবে তাঁরে,
ভক্তি বলে প্রাণ নাথ প্রাণের মাঝারে।
তাই যে বেঁচে আছি।
"জ্ঞান বলে কেবা তাঁরে দেখেছে শুনেছে?
ভক্তি বলে শ্রীমুখেতে কথা লেগে আছে
বলচেন "আমি আছি"।
জ্ঞান বলে আদি দেবের আদি অন্ত নাই,
ভক্তি বলে আদি অন্ত জানিতে না চাই।
কাছে পেলেই বাঁচি।

জ্ঞান বলে সৃষ্টি তাঁর বিচিত্র কৌশল ;
ভক্তি বলে দেহ মনে তিনই প্রবল।
দূরে যাই কেন ?
জ্ঞান বলে তেঁহ বুদ্ধি মন অগোচর,
ভক্তি বলে স্বপ্রকাশ সবার উপর
তাই সব প্রকাশিত।
জ্ঞান বলে মানুষে কি দেখিবে ঈশ্বরে,
ভক্তি বলে শোভা হেরে নয়ন না ফিরে
ওরূপ ভুবনমোহন।
জ্ঞান বলে শূন্য আকাশ পূর্ণ বল কিসে ?
ভক্তি বলে পূর্ণ চন্দ্র উদিত আকাশে
নয়ন খুলে দেখ।
জ্ঞান বলে কোন লোক দেখে নাই তাঁহারে ;
ভক্তি বলে ভক্ত সনে সদা লীলা করে,
এসে যুগে যুগে।
জ্ঞান বলে ভক্তি তুমি সবার পদানত।
ভক্তি বলে হও কেন অভিমানে স্ফীত।
সদা থাক নত।
জ্ঞান বলে ভক্তি তুমি থাক আমার বাড়ী
ভক্তি বলে উচু টেকে বসিতে না পারি
ও যে শূলের মত।
জ্ঞান বলে ভক্তি তুমি কেন লাজ কর।
ভক্তি বলে ভয় তুমি রুদ্রমূর্ত্তি ধর।
আমি দাঁড়াই কোথা ?
জ্ঞান বলে থাক ভক্তি (আমি) ছাড়ি অভিমান
ভক্তি বলে থাকি যদি দেও সবে মান।
হয়ে তৃণ সম।
জ্ঞান বলে তোমার তরে সব করি ভাই,
ভক্তি বলে তবে তব ঘরে আমার ঠাঁই।
আর যায় কোথা।
জ্ঞান বলে পূজি বিভুপ্রীতি শতদলে,
ভক্তি বলে দেখ তাঁরে হৃদয় কমলে।
জনম সফল কর।

[ভক্তি।]

ভক্তি বলে জ্ঞান তুমি নয়নের মণি,
জ্ঞান বলে সমাদরে দেখিছ এখনি।
নৈলে কেবা দেখে !
ভক্তি বলে অনাদরে কেবা কারে পায়।
জ্ঞান বলে অভিমান তব পায় পায়।
দেখে দূরে থাকি !
ভক্তি বলে জ্ঞান আমি করি বড় লাজ,
জ্ঞান বলে সতীর লাজেতে কিবা কাজ।
লাজে ফল কোথা ?
ভক্তি বলে জ্ঞান তুমি যাও বাড়ী বাড়ী,
জ্ঞান বলে জানিবে তা বিধির চাতুরী।
নৈলে থাকি কোথা ?
ভক্তি বলে জ্ঞান তব শির সমুন্নত,
জ্ঞান বলে ফল শূন্য তরু কবে নত ?
আমার তেমন দশা।
ভক্তি বলে জ্ঞান বিনা কে আদরে মোরে,
জ্ঞান বলে তব দ্বারে তাই আসি ঘুরে,
তব মান বাড়াতে।
ভক্তি বলে তব শিষ্য আমাকে না চায়,
জ্ঞান বলে যারা মম তোমাকেও পায়
আমি একা কবে ?
ভক্তি বলে জ্ঞান তুমি নানারূপ ধর,
জ্ঞান বলে তবু তব এ বিশ্বাস কর।
এক তুমি আমি।
ভক্তি বলে সকলি যে হরিলীলা দেখি,
জ্ঞান বলে তোমা হ'তে ইহা আমি শিখি।
লীলা বুঝে কেবা ?
ভক্তি বলে লীলা তুমি দেখ বল কিসে ?
জ্ঞান বলে দেখি লীলা তব সনে মিশে
আমি এ নারি।

ভক্তি বলে বিভুকে জানিলে কিবা হয়?
জ্ঞান বলে জানিলেই প্রেম উপজয়।
তাঁকে জানা আগে।
ভক্তি বলে জ্ঞান প্রেমে হয় পরিণত?
জ্ঞান বলে তাহাতেও তুষ্ট নই তত।
প্রেম শেষ নহে।
ভক্তি বলে সদা প্রেম করে কোন্ জনা,
জ্ঞান বলে জ্ঞান হরি অনুরাগে কেনা।
তুমি সহচরী।
ভক্তি বলে সহবাসে আনন্দ কি হয়?
জ্ঞান বলে, তুলা নয়, লাভে লোহা বয়।
নৈলে যত্ন কেন?
ভক্তি বলে তবে ভাই মিলি দুই জনে।
জনম সফল করি ও পদ সেবনে॥
ভক্তি জ্ঞান উভয়ের যুগল মিলনে।
সেবা আর যোগ আসি মিলে সেইক্ষণে।
জ্ঞানসহ সেবা আর ভক্তিসহ যোগ।
সবে মিলি ভূমানন্দ করে উপভোগ।
ধরাতলে নিদিবের শোভা মনোহর।
দেখিয়া হইল ধন্য যত নারী নর।
জয় জয় মহারব উঠে চারিভিতে।
পাপী সব তরে যায় বিধানের রথে।
শ্রীকাঙ্গাল।

মহিলাগণের পরিশ্রম।

এদেশে সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নরনারী উভয়েই প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য, আর্থিক সচ্ছল অবস্থাতে অবস্থিত এবং ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ও গৌরবান্বিত তাঁহাদের পরিবারে প্রায় সর্ব্বত্রই নারীদিগের পরিশ্রমজনক কোনও কার্য্য নাই। যদি ভদ্রপরিবারের মেয়েরা কোনও কার্য্য করেন তাহা অনেক স্থলেই মনের সাধ মিটাইবার জন্য কর্ত্তব্যবোধে নয়। যেখানে দুবেলা রন্ধনাদি কার্য্য পাচক পাচিকাদ্বারা সম্পন্ন হয়, বাসন পরিষ্কার, ঘর দুয়ার ঝাঁট দেওয়া কাপড় কাচা প্রভৃতি কার্য্য দাসদাসী করিয়া থাকে, সে সকল গৃহে গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা হয় পত্র লিখেন, পুস্তকাদি পাঠ করেন বা না হয় পতি, পুত্রাদির সন্তোষের জন্য, মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত, বিবিধ প্রকারের আচার তৈয়ার, পিষ্টকাদি বা জলখাবার প্রস্তুত করিয়া এবং নিজের ও শিশুসন্তানগণের বেশবিন্যাস ও বস্ত্রাদি শেলাই করিয়াই দিন কাটাইয়া দেন। যে সকল কার্য্যে মনের সাধ মিটে এবং চিত্তের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে তাহা চিরদিনই আদরণীয়। কিন্তু নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই ভগবান শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ তাহার রক্ষা জন্য পরিশ্রম করিতেই হইবে। পরিশ্রম না করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় না, ভুক্তবস্তুর পরিপাক দ্বারা শরীরে বলসঞ্চয় হইতে পারে না এবং মনে স্ফূর্ত্তি, প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা আসিতে পারে না। যে সকল রমণী মনোযোগ পূর্ব্বক বিবিধ মিষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিজের বুদ্ধি চাতুর্য্য প্রকাশ এবং পতি

পুত্রের মনোরঞ্জন করিতে যত্নবতী হন, নিশ্চয় তাঁহারা সেই সকল সামগ্রী নিজে ভোজন করিয়া এবং পতি ও পুত্র কন্যাদিগকে ভোজন করাইয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করিলেও পরিণামে রোগসমাগমের পন্থাই পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকেন। ভদ্রঘরের মহিলাগণ যদি মহাকবি কালিদাসের একটী কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন তাহা হইলে প্রত্যেক পরিবারের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সে কথাটী এই :—

শরীর মাদ্যংখলু ধর্ম্ম সাধনং।

শরীর রক্ষা ধর্ম্মসাধনের মূল। ফলতঃ নিজের এবং পতি ও পুত্রকন্যাগণের শরীরে কোন সূত্রসূত্রে রোগ আসিয়া প্রবেশ করিতে পারে তৎপ্রতি যাঁহাদের মনোযোগ কম তাঁহারা কোন প্রকারে সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। যাঁহারা নিজের মনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য বিবিধ মিষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া অনটনের পরিবার মধ্যে দারিদ্র্যের ভ্রূভঙ্গী দর্শনের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাঁহাদিগকে আর কোন্ কথা বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে? তবে কোনও কোনও পাঠিকা হয়তঃ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে সকল কার্য্যে হস্ত ও মনের চালনা হইয়া থাকে তাহা কি নিন্দনীয়? না তাহা কখনও নহে। শেলাইকর্ম্ম, নিজের ও কন্যাদের বেশবিন্যাস, মিষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত কি আচারাদি প্রস্তুত এ সকল কর্ম্ম চিরদিনই মহিলাদের উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সেই সীমা উল্লঙ্ঘন করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। কোনও মহিলা যদি আহার ও বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট সময় কেবল শেলাই কার্য্যে হস্ত ও মনের পরিচালনা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার হস্ত ভিন্ন শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বলবৃদ্ধি হইবে না। যাহাদ্বারা সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা হয় তদনুরূপ শ্রম করা প্রয়োজন। যাঁহারা সহরে নগরে বাস করেন তাঁহাদের দালানের ছাদের উপর পরিষ্কার বায়ুসেবন ও শরীর সঞ্চালনের জন্য অন্ততঃ কতক ক্ষণ বিচরণ করা প্রয়োজন। যাহাদের ছাদে বিচরণের সুবিধা নাই, তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিত সময়ের জন্য নিজ নিজ বারণ্ডায় পরিভ্রমণ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনকার্য্য সম্পাদন করেন। হস্ত সঞ্চালনে শুধু হস্তেরই বলবৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণে সমুদয় শরীর সঞ্চালিত হয় এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বশরীরে বলবৃদ্ধি হইবার উপায় হইয়া থাকে। মহিলাগণ যদি নিজে নিজে চিন্তা করিয়া শরীর মনের স্ফূর্ত্তিজনক কার্য্যে প্রতিদিন পরিশ্রম করেন এবং নিয়মিত সময়ে পরিষ্কার বায়ুতে বিচরণ করিয়া অবস্থানুসারে সর্ব্বাঙ্গের পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। কোনও এক পরিবারের মহিলাদের অবস্থার সহিত অন্য কোনও পরিবারের মহিলাদের অবস্থা এক হইতে পারে না, সুতরাং সকলের পরিশ্রমজনক স্বাস্থ্যকর কার্য্যের জন্য কোনও একটা সাধারণ বিধি স্থির হইতে

পারে না। অথচ মহিলাদের প্রত্যেকজন যদি শরীরের সর্ব্বাঙ্গ পরিচালনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাহা হইলে প্রতিজনেই আপন আপন অবস্থার অনুযায়ী ও সম্যক্ উপযোগী কার্য্যেরও ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইবার ভয়ে অদ্য এখানেই শেষ করা গেল।

কল্পতরু।

হিন্দুশাস্ত্রে ৫টী দেবতরুর উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কল্পতরু একটী। এই বৃক্ষের নিকট প্রার্থনানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ১৯শে নবেম্বর আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে কলিকাতা কমলকুটীরে এবং কুচবিহার সাবিত্রী-কুটীরে কল্পতরু প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই কল্পিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় বিবিধ প্রকারের খেলনাসহ মিষ্ট সামগ্রী সকল সংলগ্ন থাকে। কল্পতরু প্রদর্শিত হইলে শাখা হইতে ঐ সকল তুলিয়া আনিয়া শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শিশুগণ একাধারে বিবিধ খেলনা এবং মিষ্ট সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কল্পতরু যে উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয় তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য অদ্য দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা হয়। কেশবচন্দ্রের জীবন বিধাতার কৃপায় কল্পতরুর মত জগতের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরের নিকট সরল প্রার্থনা সহকারে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিশুসন্তান যেমন প্রথমে মাতৃস্তনের স্তন্যদ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে এই সংসারে একজন বড় এবং গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ কেশবচন্দ্র ঈশ্বর চরণে প্রতিদিন সরল সুমিষ্ট প্রার্থনার রস আস্বাদন করিতে করিতে যথাসময়ে ধর্ম্মজগতে এত বড় লোক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিপক্ক ধর্ম্মজীবন সত্য সত্যই একটী কল্পবৃক্ষসদৃশ হইয়াছিল। তাঁহাতে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান. বিশ্বাস, বৈরাগ্য, বিনয় প্রভৃতি স্বর্গের যাবতীয় দেবগুণ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের এমন একটী মিষ্ট দেবজীবন পৃথিবী দর্শন করিল যে তাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই: তাঁহার ছিল না, এমন কিছুই নাই, অথচ তিনি আপনাকে কখনও কোনও বিষয়ে আমি একটা কিছু এমন জ্ঞান করেন নাই। তাঁহার জীবনে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায় সুতরাং উহা কল্পতরু।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ লেডি হার্ডিঞ্জসহ পরিদর্শনে বাহির হইয়া ভূপালরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। এসময় ভূপালের বেগম স্বীয় রাজ্যমধ্যে নারী-দিগের ডাক্তারি শিক্ষার জন্য একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবেন অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে

সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। রমণী ছাত্রীদিগকে অবশ্য সুশিক্ষিতা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠা রমণী ডাক্তার দ্বারা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে এদেশের এবং বিশেষতঃ ভূপাল রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে। মহিলাদের চিকিৎসার জন্য রমণী ডাক্তার পাওয়া দুর্লভ, আর পাইলেও ব্যয়বাহুল্য অনেক। কেবল রমণীগণের জন্যে একটী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রমণীদিগের ডাক্তারি শিক্ষার সম্বন্ধে আপত্তি বড় কাহারও থাকিবে না একথা ভবিষ্যৎ বাণীরূপে বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করি বেগম সাহেবা তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের প্রস্তাবটী যতশীঘ্র পারেন কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। পরমেশ্বর বেগম সাহেবার মঙ্গল করুন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দিয়া এরূপ বিবিধ সদনুষ্ঠানের সাধন করাইয়া লউন ইহাই প্রার্থনা।

নির্জীব ভারতমহিলা সমিতি পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এ সংবাদ কোন্ মহিলার না মনে আনন্দের সঞ্চার করিবে। "যে সমুদায় নরনারী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও উদারান্নের সংস্থান করিতে পারে না, সেই নিরন্ন দুঃখীদিগের কল্যাণসাধন ও শিক্ষাদান এই সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। মহিলাগণ যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতা সহকারে জীবনের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তৎপক্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করা এই সমিতির একটী উদ্দেশ্য।" ১৯১০ সালের ৪ঠা আগষ্ট সমিতির জন্মদিনে শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বৎসর শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস বি, এ সভানেত্রী ও শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী মৈত্র সম্পাদিকা পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৯১১ সালের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র, শ্রীযুক্তা মনোরমা চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯১২ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী মৈত্র, শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী রায় এবং শ্রীযুক্তা সুখদা দেবী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্প্রতি সমিতি মহিলাগণের শিল্পকার্য্য শিক্ষার জন্য একটি সেলাইয়ের ক্লাশ খুলিয়াছেন। মেয়েদের সেবাকার্য্য (nursing) শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা সমিতির দীর্ঘজীবন ও কার্য্যকারিণী শক্তির বৃদ্ধি কামনা করি।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডস্থ ১৩ নং বাটীতে খ্রীষ্টীয় রমণীগণের মিশনারী ট্রেনিং কলেজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে বালক বালিকাগণের হস্তরচিত বিবিধ দ্রব্যে নিপুণতা ও উৎকর্ষতার পরীক্ষা হইয়াছিল। যথা:—(১) মৃত্তিকা দ্বারা বিবিধ আকারের বস্তু নির্ম্মাণ (২) অঙ্কন এবং (৩) বিভিন্ন প্রকারের চিত্র কার্য্য। ইহার সঙ্গে শিশু সন্তানদিগের জন্য বিবিধ প্রকারের খেলারও বন্দোবস্ত ছিল এবং

এই খেলার আরম্ভে ও শেষে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখানে শিক্ষার্থিনীগণকে নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ কার্য্যে পারদর্শিতা, প্রাথমিক সাহায্যে এবং ধাত্রী কার্য্যে প্রশংসাপত্র লাভের যোগ্যতা এবং স্বরলিপি শিক্ষা দিবার উপযোগিতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

আমাদের মহিলাগণ যে এবম্প্রকার পবিত্র কার্য্যে কতদিনে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হইবেন, তাহা মঙ্গলময় বিধাতাই কেবল জানেন।

বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী ক্ষীরোদ মণি সেন প্রথম আর্ট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গত মে মাস হইতে এক বৎসরের জন্য ২০৲ বিশটাকার বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি ইতি পূর্ব্বেও দুই বৎসর এরূপ বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন। মাননীয় গবর্ণমেণ্ট নারী দিগের শিক্ষার জন্য এদেশে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। শিক্ষার্থিনীগণ ইহা স্মরণে রাখিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে ইহার সাফল্য প্রমাণিত করিতে পারিলেই প্রকৃত মঙ্গল।

শিবপুরের ঘাটে দুর্ঘটনা।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শিবপুর কলেজের ঘাটে গঙ্গাতে এক অতি দুর্ব্বিষহ শোকজনক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ দিবস সমুদয় স্কুল কলেজ এবং আফিস কাছারী বন্ধ থাকাতে ইয়ংমেনস্ খ্রীষ্টীয়ান এসোসিয়েসন সংসৃষ্ট সাহেব ও বাঙ্গালী নর নারী, যুবক যুবতী, স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি অনেকে আমোদ আহ্লাদ করিতে এবং সমস্ত দিনটী সুখে যাপন করিতে শিবপুর কোম্পানীর বাগানে গমন করেন। যাইবার সময় প্রাতঃকালে ষ্টীমার ভাড়া করিয়া যাওয়া হয়। সায়ংকালে ফিরিবার সময় পার হইবার জাহাজ ভাটার জন্য নদীগর্ভে দূরে থাকাতে এক খানি ডিঙ্গি নৌকাতে চড়িয়া সকলে ক্রমে ক্রমে ঘাট হইতে জাহাজে উঠিতে ছিলেন। শেষবারে ডিঙ্গিতে অধিক লোক হওয়াতে এবং কোন কোন যাত্রী সবেগে আসিয়া নৌকারোহণ করাতে নৌকা ডুবিয়া গিয়া নৌকাস্থিত সাহেব বাঙ্গালী সকলেই জলমগ্ন হন। অল্প কয়েক জনের মাত্র জীবন রক্ষা হইয়াছে। অধিকাংশ আরোহীই সন্তরণ না জানাতে ও সেই সময় দৈবদুর্বিপাকে জাহাজের ঢেউ লাগাতে এবং উপযুক্তরূপে সহায়তা না পাওয়াতে গঙ্গাতে প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দিন আচার্য্য কেশব চন্দ্রের জন্মোৎসব করিয়া সকলে যখন ঘরে ফিরিলেন তখন এই রোমহর্ষণ ভীষণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অনেকেরই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। মৃতগণের মধ্যে আমাদের আচার্য্য পরিবার সংস্পৃষ্ট দুইটি যুবক ছিলেন। একজন শ্রীমান্ অরবিন্দ স্বর্গীয় কৃষ্ণ বিহারী সেনের শ্যালক পুত্র, দ্বিতীয়টী শ্রীমান সনৎ কুমার, আচার্য্যের ভাগিনেয় আমাদের কুচবিহারস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্টও কোন কোন যুবক ছিলেন। অন্যান্য সাহেব ও বাঙ্গালী মধ্যে মিস ট্রেঞ্চ নাম্নী একটী দ্বাবিংশবর্ষ

বয়স্কা মহিলা পিতার সঙ্গে ঐ ডিঙ্গিতে পার হইতে প্রাণ হারাইয়াছেন। মেডিকেল কলেজের কোন কোন ছাত্রকেও মৃতদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনাতে অনেকেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল দুঃখ ও শোক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এ উপলক্ষে বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে কলিকাতার হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টানগণের কতিপয় নেতা সম্মিলিত হইয়া কলেজস্কোয়ার গোলদিঘির পূর্ব্বধারে এক বৃহতী সভা করিয়া ছিলেন। সভাতে শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন দাস এম এ, প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথ লাল সেন, ডাক্তর প্রাণ কৃষ্ণ আচার্য্য, মেসার্স ডব্লু ই, ইলিয়ট, কে, জে, সাণ্ডারস্, মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ এবং ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সভারম্ভে সময়োপযোগী একটি নূতন শোক সঙ্গীত হইয়াছিল। সঙ্গীতটী ভাই মহিম চন্দ্র সেন রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। উহা আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

সুরাট মল্লার—একতালা।

হায়! কি শুনিলাম শ্রবণে।

হৃদয় বিদরে, চোখে অশ্রু ঝরে, কথা না সরে বদনে।

সাহেব বাঙ্গালী যুবক যুবতী, গেল শিবপুরে খেতে চড়াই ভাতী; আসিবার কালে মরে গঙ্গার জলে শিহরে পরাণ শুনে।

ঝড় বৃষ্টি বাণ না ছিল তুফান, খেয়া পার হতে সবে দিল প্রাণ; মানুষের ভারে, ডিঙ্গি মগ্ন করে, ঢেউলাগে সেইক্ষণে; (জাহাজের) পিতা কন্যা দোঁহে একত্র ডুবিল, বাঁচাতে কন্যারে পিতা চেষ্টাপেল, ছেড়ে দিয়ে শেষে আপনি বাঁচিল; শোকে দহিছে পরাণে। (পিতা)।

পুত্র শোকে কাঁদে পিতা মাতা গণ, কত ভদ্র স্বরে উঠিছে ক্রন্দন; হাহাকার ধ্বনি, স্থানে স্থানে শুনি, জল আসে দুনয়নে; লাট বাহাদুর শুনি এঘটনা, কোমল হৃদয়ে পাইলা বেদনা; হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশি বারতা, দিলা সান্ত্বনা বচনে!

শোকে দুঃখে তাহে কাতর হইয়া, দাঁড়াইনু আজ প্রান্তরে আসিয়া, মানব জীবন, চঞ্চল এমন, আছে নাই ক্ষণে ক্ষণে; বিভু পদে করি সরল প্রার্থনা, শোকার্ত্ত হৃদয়ে দিউন সান্ত্বনা, যারা গঙ্গাজলে মরিলা অকালে, দিন স্থান শ্রীচরণে! (তাঁদের)

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে পুনরায় "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী" এই সঙ্গীত হয়। প্রিয়দর্শন শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার স্বীয় ললিত কণ্ঠে সঙ্গীত দুটী করিয়াছিলেন।

আমরা এই দুর্ঘটনা সংসৃষ্ট শোকার্ত্ত পরিবারের সহিত সর্ব্বান্তকরণে সহানুভূতি করি। শান্তিদাতা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন এবং মৃতগণের অমরাত্মা সকলকে শান্তি ও আরামের রাজ্যে স্থান দান করুন ইহাই প্রার্থনা। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। [ধর্ম্মতত্ত্ব]।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৮শ ভাগ] পৌষ, ১৩১৯। জানুয়ারী, ১৯১৩। [৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া তোমার বঙ্গবাসিনী কন্যাগণের উন্নতির পথ খুলিয়া দেও। তুমি তাঁহাদিগকে মঙ্গলপথের যাত্রী করিয়া সংসারে এক এক জনকে এক একটি অবস্থা দিয়াছ, কিন্তু তাঁহারা কার্য্যত সেই অবস্থার দাসী হইয়া দুঃখে দিনযাপন করিতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নিজ নিজ অবস্থার দাসী মনে করিয়া দিনরাত্র তাহারই সেবায় জীবন ব্যয় করিতেছেন। কোথায় তাঁহারা অবস্থার সেবা প্রাপ্ত হইয়া সুখে তোমার রাজ্যে যাইবেন, না, অবস্থার তাড়নায় দুঃখ বিপদ নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তোমার বিশেষ দয়া না হইলে তাঁহাদের এই ভয়ানক ভ্রান্তি দূর হইবে না। তাঁহারা স্বচ্ছন্দতা বা দারিদ্র্যের জন্য সৃষ্ট হন নাই, কিন্তু ধন ও দারিদ্র্য তাঁহাদের সেবার জন্য আসিয়াছে। কোন অবস্থা তাঁহাদিগকে শাসন করিবে না, কিন্তু তাঁহারা সকল অবস্থাকে আপন আপন জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিবেন—এই যে তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় ইহা তুমি কৃপা করিয়া তোমার সকল কন্যাকে বুঝাইয়া দেও। তাঁহারা তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় জানিয়া সকল অবস্থায় সাহায্যে যাহাতে তোমার চরণের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

অবরোধ প্রথা।

মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির যত উন্নতি হইয়াছে তাহা মনুষ্যের সহিত ও প্রকৃতির জড়জীব সকলের সহিত পরিচয়ে লাভ হইয়াছে। আমরা স্বভাবত ইচ্ছা করি যে, এজগতে যাহা কিছু জানিবার ও লাভ করিবার বস্তু, সে সমস্ত আমাদিগের আয়ত্ত হইবে। এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া সুসভ্য দেশ সকলের বণিকগণ

পৃথিবীর সকল দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেছে. যদি কোন দেশ বা নগরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকে অমনই তাহারা মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। যদি বিদ্যার্থীকে বলা হয় যে অমুক অমুক শাস্ত্র তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, সে অমনই প্রতিবাদ উপস্থিত করিবে যে, তাহার জ্ঞানের দ্বার অবরুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি ভয়ানক অবিচার করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার বিশেষত্বই সকল প্রকার অবরোধের অবসান। আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বা স্থান অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা অচিরে অবরোধ-বিমুক্ত হইবে। সভ্যতা পৃথিবী-ব্যাপী হইলে পৃথিবীর সকল স্থান ও সকল জ্ঞান প্রত্যেকের পক্ষে মুক্তভাবে জানিবার ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিবার বিষয় হইবে।

আমরা বিধাতার কৃপায় এই সভ্যতার স্রোতের অথবা এই নব জাগরণের স্ফুরণ কিছু কিছু অনুভব করিতেছি। প্রায় এক শতাব্দী হইল আমাদিগের দেশে বিবিধ বিষয়ে সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে দেশের লোকের মন অবরুদ্ধ ছিল, ক্রমে ক্রমে সে অবরোধ দূর হইতেছে; সমুদ্রের অপরপারে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ ছিল, সে অবরোধ দূর হইতেছে। স্বস্ব গ্রাম বা নগরের বাহিরে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল, এখন গতায়াত সুগম হইয়াছে ও আরও সুগম হইতেছে। জাতি-বিভাগ ভিন্নতার প্রধান কারণ, তাহাও শিথিল হইয়া মিলামিশা সহজসাধ্য করিয়া দিতেছে। যে সকল শাস্ত্র ও জ্ঞান বিশেষ বিশেষ জাতির নিকট আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন সাধারণের সম্পত্তি হইতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যত প্রকারের আবদ্ধভাব সঞ্চিত হইয়াছিল এবং যেগুলি অখণ্ড বিধি বা সনাতন রীতি বলিয়া মান্য প্রাপ্ত হইতেছিল, সে সমস্তও এই নূতন তরঙ্গের আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ফলে এদেশ কোথায় যাইতেছে, তাহা আমরা কেহ জানি না; আমাদের আহার পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, যান, বাহন, ধন ভাষা, বিদ্যা প্রভৃতি কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এখন পুরাতন ধরিয়া রাখা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার মধ্যে যদি কেহ অন্য কোন মানুষকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা একান্ত বিফল হইবে। যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অন্য দেশের সহিত মুক্ত বাণিজ্য করিতে দিতে চাহেন না, তাঁহাদিগের চেষ্টা যেমন বিফল হইবে, তেমনই যাঁহারা আপনাদের কাল্পনিক গৌরব রক্ষার জন্য উচ্চ সামাজিক নিয়মকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের দশাও সেইরূপ হইবে।

যে সংস্কারের জন্য সকল দেশ ব্যস্ত, আমরাও যে সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার গতি, ঊর্দ্ধদিকে গমন—যেন কোন পর্ব্বতে আরোহণ করা। জর্ম্মনী, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, বৃটিশ রাজ্য সকলেই যেন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উন্নতির পর্ব্বতে আরোহণ করি-

তেছে। আমরা যে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি, ইহাও সেই পর্ব্বতারোহণের ন্যায় শ্রমসাধ্য। কিন্তু গতি বা কার্য্য করিতে হইলে কেবল চিন্তা, ভাব বা কল্পনাদ্বারা তাহা সাধিত হয় না। কার্য্য করিতে হইলে দুই খানি হস্ত চাই, চলিতে হইলে দুই খানি পদ চাই; এক হাতে কার্য্য করা বা এক পদে চলা কোনরূপে প্রাণরক্ষার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু উন্নতির শ্রমসাধ্য কার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। দেশের একজন বা দুজন লোক ধনী হইলে বা কৃতী হইলে যেমন দেশের দুঃখ যায় না, তেমনই দেশের এক শ্রেণী বা এক জাতি উন্নতি লাভ করিলে সমস্ত দেশের উন্নতি হইল, বলা যায় না। অন্ততঃ অধিকাংশ লোক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলে তখন বলা যাইতে পারে যে, দেশ উন্নতির পথে যাই-তেছে। ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করি-বার পক্ষে দুই চারি জন উন্নত লোকের চেষ্টা কখনও বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না। সমস্ত প্রদেশের যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি জাগরণ লাভ করিয়া দেশের সংস্কার ও প্রকৃত মঙ্গল সাধনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তখন বলা যাইবে যে, উন্নতির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

জনসমাজ অর্থ নরনারীর সমষ্টি। কতকগুলি পুরুষ বা কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া সমাজ হয় না। এক একটি দম্পতি সমাজের এক এক অঙ্গ। যদি সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হয়, দুজনে একজন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমরা কত দেখিয়াছি, স্বামীর উচ্চভাব, উচ্চজ্ঞান দেশের বা সমাজের মঙ্গল সাধ-নের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু স্ত্রী সে জ্ঞান, সে ভাব প্রাপ্ত হন নাই, তিনি উহার বিরোধী হইলেন—স্বামীর দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারিল না। কত স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, স্ত্রী উচ্চ ধর্ম্মভাবে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু স্বামী বিষয়কর্ম্মে একান্ত অভিভূত, স্ত্রীর মনের ভাব মনেই লয়প্রাপ্ত হইল। যতদিন সমাজের দুই হস্ত বা দুই পদ অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সমান উন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুক্তভাবে অগ্রসর হইতে না পারিবে, ততদিন কখনও প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে না। দুখানি পদের এক খানি যদি বেড়ীদ্বারা আবদ্ধ থাকিল, তাহা হইলে কার্য্যাত গমনাগমন বন্ধ হইল; যদি দুখানি হস্তের একখানি অবশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লোকদ্বারা অতি অল্প কার্য্যই হইতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি অন্ধ বা খঞ্জ হন, তাহা হইলে যেমন তাঁহাদিগের দ্বারা সাধারণের মঙ্গল কার্য্য দূরে থাকুক, আপনাদিগের সংসারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করাই কঠিন হয়, তেমনই যদি সুশিক্ষাতে, অভিজ্ঞতাতে, সৎসাহসে একজন অত্যন্ত হীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইতে পারে না। এজন্য আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যে দেশের ও সমাজের সংস্কার বা উন্নতিসাধনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, ইহা সম্পন্ন করিতে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে

আপন আপন গৃহকে উপযুক্তরূপে উন্নত করিতে হইবে।

আমাদের দেশের অবরোধ প্রথাই অদ্য বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। ইহা পূর্ব্বকালে ছিল না, মধ্যসময়ে সম্ভবতঃ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে আমাদিগের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর নারীগণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমরা সে বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করিব না। আমরা এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আজও কেন অবরোধপ্রথা এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে? বিশেষতঃ যাঁহারা নব জাগরণের অল্পমাত্র স্পর্শও অনুভব করিয়াছেন, যাঁহারা দেশকে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইতে অল্পমাত্রও যত্নশীল হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও কেন নারীগণকে অবরোধ মুক্ত করিতে যত্নশীল হইতেছেন না? যখন দেখিতে পাইবে, অবরোধপ্রথার মহাপাপে এদেশের মহিলাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও অজ্ঞ থাকিতেছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্ত্বেও নির্ব্বোধের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে বাস করিতেছেন, তখন মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের জাতির যত কলঙ্ক জগৎ দেখিতেছে, তাহার মধ্যে নারীগণের অবরোধপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর। যাঁহারা আপনার ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দ্বার চক্ষুকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশের বা সমাজের নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা করা একান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মানুষের সকল প্রকার উন্নতি মনুষ্য ও জড়জীবপূর্ণ প্রকৃতির সহিত পরিচয়ে লাভ হইয়া থাকে। গৃহে বসিয়া চিন্তা করিলে বা সারগর্ভ পুস্তক পাঠ করিলে সে উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ বলিবেন যে হঠাৎ অবরোধ-প্রথা তুলিয়া দিলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহাতে সত্যই বিপদের সম্ভাবনা। উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা হঠাৎ কাহাকে বলেন? যদি বলা যায় যে, যখন ভারত স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, তখন কোনরূপে ভয়ে ভয়ে আপনার ধন, মান, প্রাণ গোপনে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে এই অবরোধপ্রথা আসিয়াছে; কারণ ভারত বহু শতাব্দী এই ভাবেই জীবনরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি না, আমাদের দেশের সে দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে; আজ দেড়শত বৎসর ইংরাজ শাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা সেরূপ ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, কেবল তাহাই নয়, কিন্তু আমাদের রাজজাতি ও অন্যান্য সভ্যজাতির নারীগণ স্বাধীনভাবে সমাজের মঙ্গল কার্য্য করিবার অধিকার পাইয়া কত উচ্চ হইয়াছেন এবং কত মান্য পাইতেছেন তাহাও আমরা বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এখন যদি আমরা সকলে একবাক্য হইয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, অবরোধ প্রথা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবং যদি স্বীকার করি যে,

দেশে শান্তি ও সুশাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে, এখন অবরোধপ্রথা তুলিয়া দিবার ঠিক সময় হইয়াছে. তাহা হইলেই উন্নতির একটা বিশেষ পথ খুলিয়া যায়। অবরোধ হইতে মুক্তিদানকার্য্য আরম্ভ হইলে কোন কোন বিষয়ে নারী ও পুরুষকে অধিক সাবধান ও সুব্যবস্থিত হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে পথে অগ্রসর হইতে যাও তাহাতেই বিপদ আছে, এই বিপদের সহিত সংগ্রাম করাই মনুষ্য জীবনের নিয়তি ও মহত্ত্ব। গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা নিরাপদ নহে, ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি; তাহা হইলে নারীকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করিয়া যদি উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে বিপদের কিছু সম্ভাবনা থাকে, তাহা সত্ত্বেও সেই পথ খুলিয়া দিতে হইবে। উন্নতির সাধারণ নিয়মে সে বিপদের প্রতীকারও অবশ্য হইবে।

নারীগণ স্বাধীন মনুষ্য, তাঁহারা মুক্তভাবে বিচরণ করিতে অধিকারী। তাঁহাদিগের পক্ষে গৃহের প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ইহা যতই কেন বলা হউক না, অনেক মহিলা আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে, আমরা এই অবস্থাতেই ভাল আছি, আমরা স্বাধীনতা চাই না; যার তার সঙ্গে আলাপ করিব, যা তা দৃশ্য দেখিব,যেখানে সেখানে যাইব, এরূপ স্বাধীনতায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যেমন পক্ষী দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিলে আর মুক্ত আকাশে উড়িতে পারে না, পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া দিলেও পুনরায় পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে আসে, আমাদের দেশের অনেক মহিলার সেইরূপ ভাব হইয়াছে সন্দেহ নাই। মহিলাগণ অবরুদ্ধ থাকাতে তাঁহাদের জ্ঞানবিকাশের কত বাধা হইতেছে, তাঁহাদের হৃদয় কত সংকীর্ণ রহিয়াছে ইহা হয়ত এখন অনেককে বুঝাইতে হইবে। নারীগণকে সুশিক্ষা না দিয়া এবং গৃহে অবরুদ্ধ রাখিয়া যে তাঁহাদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে এবং যেন কার্য্যত তাহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর জীব করিয়া রাখা হইয়াছে, একথা বঙ্গনারী অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নারী সমাজে ও পরিবারে আপনার প্রাপ্য স্থান গ্রহণ করিলে যে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে এবং সমাজের ও দেশের মহা মঙ্গল হইবে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

এ দেশের নবজাগরণের প্রথম স্ফুরণে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ বহুবিধ সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, নারীর অবরোধপ্রথা দূর করা তাহার একটি প্রধান সংস্কার কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ নারীকে অবরোধমুক্ত করিতে অনেক যত্ন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, অনেক ব্রাহ্মিকা অবরোধ ত্যাগ করিয়া বিস্তৃত আকাশের তলায় আপনাকে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আমাদিগের আনন্দের বিষয়, কিন্তু এখনও অনেক পরিবারে নারীর অবরোধ দূর হয় নাই। এখনও অনেকে মনে করিতেছেন যে নবধর্ম্ম জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে যে আদেশ করেন অর্থাৎ

বিজাতীয় ভাবের অযথা অনুকরণ করিয়া বিকৃত ও উপহাসাস্পদ অস্বাভাবিক অবস্থা যাহাতে না আসে তাহার জন্য যে উপদেশ দেন, তাহার অর্থ এই যে অবরোধপ্রথা বা জাতিভেদ প্রভৃতি অতি দূষণীয় ব্যবস্থান গুলিকে রক্ষা করিতে বলেন! বর্ত্তমান সময়েও এরূপ ভ্রম হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাহা মানব চরিত্র গঠনের পক্ষে অপকারী যাহা সমাজের অনিষ্টকর প্রথা তাহাই কি জাতীয় ভাব বলিয়া আদৃত হইবে? চীন দেশের লোকেরা আফিম খাইয়া অপদার্থ হইয়া যাইতেছিল, এখন চীনবাসীগণ যে মহা উদ্যম করিয়া দেশ হইতে আফিমকে তাড়াইয়া দিতেছেন তাঁহারা কি ইহা দ্বারা বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিতেছেন? তাহা কখনই নহে। কোন দোষ বা কুসংস্কার রক্ষা করা জাতীয় ভাবকে সম্মান করা হইতে পারে না। যাঁহারা নূতনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন নূতন নূতন উন্নতি লাভ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা প্রথমে আপনাদিগের মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে অবরোধ মুক্ত করিয়া সকল উন্নতি দ্বারা যুক্ত করিয়া দিবেন ইহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ বিষয়ে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে দেশহিতকর চিন্তাশীল নরনারী সভা সমিতিতে মিলিত হইতেছেন সেই স্থানেই দেশের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছে। সেদিন বাঁকিপুরে যে সামাজিক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে অন্য সকল বিষয় সংস্কারের প্রস্তাবের সহিত অবরোধ প্রথা দূর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

জন্মোৎসব।

প্রত্যেক মানবসন্তানের পক্ষেই আপন আপন জন্মোৎসব করা একান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যসন্তান এই সংসারে যত প্রকার সুখ সৌভাগ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিজের জীবনই তাহার মূলীভূত কারণ। সুতরাং পৃথিবীর এবং স্বর্গের যাবতীয় দানের মধ্যে তাহার নিজের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ দানের জন্য জীবনদাতা ঈশ্বরের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে তাহার ভোগের জন্য যে ভূলোকে ও দ্যুলোকে অসংখ্য অসংখ্য দান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারও প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে না এবং তাহা ভোগ করিয়াও প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে পিতা মাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা আপনাপন সন্তানদিগকে জীবনের মূল্য সর্ব্বাগ্রে বুঝাইয়া দেন। এই জীবনের মূল্য বুঝাইয়া দিবার জন্য সন্তানদিগের এবং পিতৃমাতৃগণের আপন আপন জন্মোৎসব করাও প্রয়োজন। অবশ্য এই উপলক্ষে নূতন কিছু ভাল খাবার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, পরিধেয় নূতন বস্ত্র দেওয়া অথবা অন্য প্রকারের বিশেষ বিশেষ উপহার অর্পণ করা, আর শিশুদিগকে সুন্দর পুতুল কি অন্যান্য কোনও রূপ খেলনা

দেওয়া, ছবির পুস্তক দেওয়া এবং উপদেশজনক সহজপাঠ্য পুস্তকাদি ও রামায়ণ মহাভারতাদি উপাদেয় মহাকাব্য গ্রন্থ দান করা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রকৃত মূল্যও যাহাতে প্রতিজন বুঝিতে পারেন এবং সন্তানগণও একটু একটু বুঝিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জন্মের পূর্ব্বে সন্তান যে ছিল না, ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে দিন দিন জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বৃদ্ধি হইতেছে ও সে যে পার্থিব জীবনে একটী ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে এ সকল বিষয়ে যাহাতে তাহার অন্ততঃ মোটামুটি একটা জ্ঞান জন্মে পিতা মাতার পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য। আর এই মনুষ্যজীবনে জীবনদাতার কি মহদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে দিবার আছে তাহাও কিছু কিছু করিয়া এই উপলক্ষে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা বিধেয়।

সন্তানদিগকে জীবনের মহদুদ্দেশ্য বুঝাইতে গিয়া যে পিতামাতার জীবনের অপনাপন লক্ষ্যের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং জন্মোৎসব শুধু আমোদ আহ্লাদ ও ভাল খাদ্যাদি ও বস্ত্রাদি লাভের উৎসব নহে, উহার সঙ্গে যে জগৎপিতা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং জীবনের কর্ত্তব্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা জীবনে পালন করিবার সঙ্গে যোগ আছে তাহাও প্রত্যেক পিতা মাতারই সন্তানদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শিশুগণ পিতামাতার নিকট যাহা কিছু ভাল জিনিষ প্রাপ্ত হয় তাহাই অতিশয় আদরের সহিত ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। জনকজননী সন্তানের জন্মদিনে তাহাকে জীবনের মহত্ব, দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ ও শিক্ষা দিবেন তাহা যে সে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে এবং তাহা যে চিরদিনের জন্য তাহার চিত্তফলকে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। একেত পিতা মাতার নিকট শিক্ষাই সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ফল যাবজ্জীবন সে ভোগও করিয়া থাকে। তাহার উপর জন্মদিনে জন্মোৎসবের সময় তাহার মন যখন প্রফুল্ল থাকে, হৃদয় প্রমুক্ত থাকে এবং চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে সেই শুভ লগ্নে মহেন্দ্রক্ষণে পিতামাতা সন্তানলাভের জন্য ঈশ্বরচরণে কৃতজ্ঞতা দিতে দিতে মানবজীবনের দায়িত্ব যেরূপ সহজে অনুভব করিবেন তাহা সন্তানকে বুঝাইয়া দিলে তাহার চিরকল্যাণ হইবে। "জনম দিয়েছ যদি শরণ দিতে হবে, শীতল চরণারবিন্দে।" এ প্রার্থনা জন্মদিনোপলক্ষে যেরূপ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে অন্তরে আসে অন্য দিনে তেমন আসে না। আর "ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফুটে গাছে, ছোট বটি তবু তোমার জগতে আমাদের কাজ আছে।" এবাক্য জন্মদিনে শিশুদিগকে আপন জীবনের মহত্ব সহজে বুঝাইতে যে সুক্ষম তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

পূর্ণ।

সে এক অবস্থা যা ভাবতে কল্পনা হার মেনে যায়। না ছিল সূর্য্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল আলোক, না ছিল আকাশ, না ছিল সৃষ্টি, না ছিল কিছু, ছিল কেবল ঘোর আঁধার বিজনে এক মহাসত্বা। সত্বা—স্থিতি—থাকা কেমনে তা কে বলতে পারে? সেরূপ কে দেখেছিল, সে রূপে কে মজেছিল যে কথায় বা ইঙ্গিতেও প্রকাশ করবে? আশ্চর্য্য সে অবস্থা—সেই আপনাতে আপনি।

এ সত্বা কারেও অবলম্বন ক'রে নয়, কারও অবলম্বন হ'য়ে নয়। কারেও যেন তাঁর প্রয়োজন হয় নি, কারও যেন তাঁকে প্রয়োজন হয়নি। আপনাতে আপনি, বাইরে যেতে হয়নি, ছিলনা প্রকাশ, ছিলনা বিকাশ। আপনার সমস্ত সত্বাটুকুতে আপনি পূর্ণ, আপনার সমস্ত স্বভাবটুকুতে আপনি মগ্ন।

চাও তাঁর পরিচয়? ইনি সেই আদি সত্তা,সেই মহা স্থিতি যাঁকে ধারণা করতে "বুদ্ধি থচল হয়ে।" না পিতা, না মাতা এলেন আপনা হতে, ছিলেন আপনাতে, সবই তাঁর আপনাতে। চাও কারণ? আদি কারণের আবার কারণ কে? চাও মূল? আদি স্থিতির আবার মূলাধার কে? আদি শক্তির আবার প্রস্রবণ কে?

তাঁর আবার প্রতিষ্ঠা? আত্মপ্রতিষ্ঠ সে বিরাট সত্তার প্রতিষ্ঠার জন্য কারও ব্যস্ত হবার প্রয়োজন হয়নি। আর ছিলই বা কে যে ব্যস্ত হবে? একটিও পাখী ডাকেনি, একটিও ভক্ত গায়নি, একটিও তারা আরতি করেনি, একটিও ফুল তাঁতে অর্পিত হবার জন্য ফুটেনি। আপনার বিরাট মহিমায়, আপনার সৌন্দর্য্যগরিমায় আপনি মগ্ন। দ্রষ্টা নাই, স্তাবক নাই, মুগ্ধ হবার পাত্র নাই, অথচ এতেই তিনি তুষ্ট।

কেউ নাই তাতে কি? নাইয়ের অভাববোধও নাই। পূর্ণের কি অভাব যে অপূর্ণের। যাঁর আপনার ভিতর সব, তাঁকে কি আর বাইরে চাইতে হয়? আর তিনিই যখন সব, সব বলতে যখন একমাত্র তিনি, তখন তাঁর আর বাইরে কে? তাঁর চিন্তা, তাঁর আনন্দ, সবই যে তাঁতে। তাঁর ভাব তাঁতেই উঠে, তাঁতেই লীন হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা তাঁতেই খেলা ক'রে তাঁতেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

এমন ভাবে কত দিন গেল কে বলবে? দিন ছিলনা, কালগণনার উপায় ছিল না, ইতিহাস ছিল না, মানুষ ছিল না—কে বলবে কত দিন কি ভাবে তাঁর কেটেছিল?

আর পৃথিবী? বীজ যেমন মাটিশয্যায়, ভ্রূণ যেমন জরায়ুশয্যায় ঘুমায়, এ সৃষ্টিও তেমনি সেই মহাসত্তাশয্যায় ঘুমাচ্ছিল। একটা কিসের সম্ভাবনা যেন, একটা কি যেন হবে, একটা রহস্যময় ভবিষ্যৎ যেন—লুকিয়ে রয়েছিল।

লেখনী সংযত হও, পূর্ণ থাকুন পূর্ণ।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ কি?

যে ব্যক্তি যে বস্তু আস্বাদ করে নাই, সে সে বস্তুর স্বাদের কথা বর্ণনা করিতে পারে। না যে ব্যক্তি লণ্ডন নগর দেখে নাই সে সেই মহানগরীর বর্ণনা কিরূপে করিবে? সেই রূপ যে নিজে নির্ব্বাণ লাভ করে নাই সে নির্ব্বাণের কথা বর্ণনা করিতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যের আস্বাদনের বিষয় অন্যের মুখে শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া কতকটা বলা যাইতে পারে এবং আমরা যাহারা লণ্ডন নগর দেখি নাই, আমরাও এত কাল লোক মুখে বর্ণনা শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া ও কল্পনা বিস্তার করিয়া লণ্ডন নগরের কথা কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারি। সেইরূপ আমরা নির্ব্বাণের আস্বাদন নিজেরা না পাইয়াও নির্ব্বাণের কথা কিছু আলোচনা করিতে পারি।

আমরা জানি নির্ব্বাণ অর্থ শান্তি। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর তীব্র সাধনা করিয়া শেষ যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্ব্বাণ শান্তির অবস্থা। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে পাই, তাঁহার অহঙ্কার বিনাশ হইয়া গেল, বাসনানল নির্ব্বাপিত হইল, তাহার পর শান্তি লাভ হইল। ইহাকে আর আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই আর এক জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এই শান্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহুদী সন্তান যিশুখ্রীষ্ট বলিয়া গেলেন আমি তোমাদিগের জন্য শান্তি রাখিয়া যাইতেছি। যিশুকে শান্তির রাজা বলে, তিনি আপনি শান্তিতে জীবন শেষ করিলেন, এবং পৃথিবীর জন্য শান্তির ধর্ম্ম রাখিয়া গেলেন।

আমরা দেখিতে পাই, সমস্ত মনুষ্যজাতি যে শান্তিহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে সংসারে বিচরণ করিতেছে এই দুই ব্যক্তি সেই শান্তির সমাচার দান করিয়া গিয়াছেন। মনে হয় সমস্ত নর জাতির পূর্ব্ব প্রতিনিধি এই দুইটী মহাপুরুষ মানব জাতির জীবনের সমস্যা পূরণ করিতে যত যত উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে এই দুই জনের জীবনে ও শিক্ষায় তাহার সার সংকলন হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভবসাগর পার হইবার যত তরণী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠতম তরণী এই দুইটি মহাপুরুষের দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহারা দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে মানবজীবনের সমস্যা পূরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তথাপি উভয়ের জীবনে ও শিক্ষায় বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

ঈশা একেশ্বর বিশ্বাসী ইহুদি জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় পিতা, এই বিশ্বাসে আপনার সকল ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন ও মঙ্গলময় পিতার অনুকরণ করিয়া চির জীবন নর নারীর মঙ্গল করিলেন। পরম পিতা ঈশ্বরের নিত্য প্রেমে দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ অন্তরে যে সত্য ও গভীর নির্ভর হয়, তাহার উপরই ঈশার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রেম ভক্তি, সতত, মঙ্গলাভিপ্রায়, একান্ত বিনয়, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মঙ্গল

রের মঙ্গলস্বরূপে অটল বিশ্বাসে যে শান্তি দেয়, ঈশা সেই শান্তি আপনি সম্ভোগ করিলেন এবং চিরদিনের জন্য সকল বিশ্বাসীর পক্ষে শান্তির দ্বার খুলিয়া দিয়া গেলেন। এপথে অনেকেই শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং বিশ্বাস নির্ভরের তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মকৃপায় অল্পাধিক শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন।

সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের পথ সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি এদেশের যোগী ঋষি মহর্ষিদিগের পথের পরিসমাপ্তিতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা গভীর জ্ঞান ও আত্ম নির্ভরের দ্বারা ভবসাগর পার হইতে সাধন পরায়ণ হইয়াছেন শাক্যসিংহ তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধি হইয়া মহা সাধন ও তাহার অভুতপূর্ব্ব সিদ্ধি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি সৃষ্টিতে দুঃখকেই রাজত্ব করিতে দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাতেই দুঃখের প্রাধান্য বিশেষভাবে রোগ, জরা, মৃত্যু, দুঃখ। তিনি দুঃখ দেখিলেন এবং দুঃখের উপর আপনার দর্শন শাস্ত্র ও সাধন স্থাপিত করিলেন; এজন্য বুদ্ধকে অনেক পণ্ডিত দুঃখবাদী বলেন, কিন্তু তিনি দুঃখের উপাসক ছিলেন না। তিনি শান্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দীপ্ত শরা নরনারীকে শান্তিরসে স্নান করিবার পথ বলিয়া দেওয়াই তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল। অথচ তিনি সম্মুখে সত্যই দুঃখ দেখিতে পাইলেন। মহাবীর শাক্যসিংহ দুঃখ দেখিয়া ভীত হইলেন না। তিনি আপনার সহায় সম্পদ বল ভরসার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেন সম্মুখে উপস্থিত মহা শত্রু দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিতে আর কাহারও সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। আত্ম নির্ভর ভিন্ন গতি নাই। তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে এমন পূর্ব্বে কেহ ছিল না, এখন কেহ নাই, পরেও কেহ হইবে না। এ বিষয়ে প্রত্যেকে আপনার উপর নির্ভর করিবে। এই সত্য অন্তরে প্রতীত হইলে তিনি একান্ত দৃঢ়তার সহিত সাধন আরম্ভ করিলেন। এই দুঃখ বিনাশ কার্য্যের প্রথম সাধন হইল রাজ্য সম্পদ্ স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন ও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ। তাহার পর প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী উপদেষ্টা গুরু প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে সাধন করিলেন; যখন তাহাতে কিছু হইল না তখন পুনরায় আপনার উপর নির্ভর করিয়া উরুবিল্ব গ্রামের বহির্ভাগে বাস করিয়া কঠিন আত্মচিন্তা ধ্যান ধারণা আরম্ভ করিলেন। বহুদিন সাধনের পর দেখিতে পাইলেন যদিও পদ মান জাতি গোত্র ভোগ সুখ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করা হইয়াছে তথাপি অন্তরে ও বাহিরে অনেক দুঃখের কারণ রহিয়াছে।

তখন বাহিরের জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদন করিতে তিনি পঞ্চস্কন্ধের নিবৃত্তি সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে পঞ্চস্কন্ধ এই পাঁচটি যথা :—রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার। আমরা শুনিয়াছি সেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় অর্থের প্রতি আসক্তি দূর করিতে এক বিশেষ সাধন করিয়া-

ছিলেন। এক হস্তে একখণ্ড মৃত্তিকা লই-লেন ও অপর হস্তে একটী মুদ্রা লইলেন; তারপর ক্রমাগত মাটির টুকরা টাকাটির স্থানে লইতে লাগিলেন এবং মাটীর স্থানে টাকা লইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন মাটি টাকা, টাকা মাটী, এই রূপে কিছুদিন সাধনা করিয়া টাকা যে মাটি, তাহা তাঁর সাধন হইয়া গেল, ধনাসক্তি আর থাকিল না। তাঁহার হাতে টাকা দিলে নাকি হাত বাঁকিয়া যাইত। বুদ্ধদেব এইরূপ সাধন করিতে আরম্ভ করিয়া যাহা যাহা অন্তরায় হইল তাহা দূর করিলেন। রূপ। যাহা দেখা যায় তাহা অতি চঞ্চল, অতি অসার, অতএব রূপ কিছু নয়, রূপ মিথ্যা.যাহার যে রূপ আছে তাহা থাকিবে না, অতএব রূপকে আর আমি বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিব না। এইরূপে রূপকে ভেদ করিলেন। বেদনা অর্থ সুখ দুঃখের অনুভূতি। বৌদ্ধশাস্ত্রে সমস্ত অনুভূতির এক নাম বেদনা,পরে ইহাকেও ভেদ করিলেন. তাহার পর বিজ্ঞানকে ভেদ করিলেন, অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, আকাশ, পৃথিবী, দিবা রাত্রি, ঘট পট প্রভৃতি ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম কিছু নয়, এসকল প্রভেদ অসার ক্ষণিক, অপদার্থ, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই, এসকল প্রভেদ নিত্য নহে, তাহা দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন। তার পর সংজ্ঞা ভেদ করিলেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও যেমন কিছু নয় তেমনই তাহাদিগের নামও কিছু নয়, মিথ্যা, ইহা সাধন করিলেন। এইক্ষেত্রে শেষ সাধন সকল সংস্কারের শেষ দর্শন। বৌদ্ধশাস্ত্রে সংস্কার অতি বিস্তৃত ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা কিছু দুই বা অধিক বস্তুর যোগে হইয়াছে, অথবা যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই সংস্কার। যখন সাধন বলে সংস্কার ভেদ হইল, তখন আর বাহ্য জগৎ বিষয়ে তাঁহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সিদ্ধার্থ বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন কিন্তু তখনও অন্তরে দুঃখের বীজ রহিয়াছে। তিনি তাহাও দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে অন্তরের এই সকল শত্রুকে আসব বা দুঃখ বলে। ইহা চারি প্রকার, কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থ ভ্রান্তি মিথ্যা জ্ঞান, যাহা যে বস্তু নহে তাহাকে সেই বস্তু মনে করা। ইহার সাধন সত্যকে সত্য বলিয়া জানা অন্য সকলকে ত্যাগ করা, গভীর ধ্যানে সিদ্ধার্থ তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। তাহার পরের শত্রু কাম বা কামনা, কোন বস্তুর কামনা অন্তরে স্থান না দেওয়া। সমস্ত পৃথিবীতে বা স্বর্গে কোন বস্তুর প্রতি কোন কামনা নাই, এই সাধনে সিদ্ধ হইলেন। তাহার পরের শত্রু অস্মিতা। ইহার অর্থ অস্তিত্বের ইচ্ছা, থাকিবার ইচ্ছা, সুখে থাকি, দুঃখে থাকি,স্বর্গে থাকি নরকে থাকি, আমার অস্তিত্বটা থাকে, না যায়, সিদ্ধার্থ ইহাতেও সিদ্ধ হইলেন। সকলের শেষ শত্রু অর্থাৎ সকল দুঃখের মূল অবিদ্যা বা আমি আমি বোধ, আমি সাধন করি আমি ইচ্ছা করি, আমি মরি, আমি আমি, সকলের সঙ্গেই আছে।

দৃঢ় সাধনে ইহা তাঁহার সিদ্ধ হইল। ইহাতে তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি যে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন তাহাতে সিদ্ধি লাভ হইল, কিন্তু তিনি যে দুঃখের নিবৃত্তি চাহিয়াছিলেন তাহা লাভ হইল না। ইহার রহস্য কে বুঝিবে যে এত কঠিন সাধনে সমস্ত বাহ্য জগতে অন্তর্জগতের উপর জয় লাভ করিয়াও শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ হইল না।

যে কয়টি সাধনের কথা উল্লেখ করা হইল বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা ভিন্ন অনেক প্রকারের সাধন আছে কিন্তু এই কয়টি সর্ব্ব প্রধান ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই সুদীর্ঘ কঠোর সাধন সময়ে সিদ্ধার্থের অন্তরে মধ্যে মধ্যে নিরাশা অন্ধকার উপস্থিত হইত। তিনি মহাজন, মহাবীর সত্য, কিন্তু তিনি মানুষ,তিনিও আমাদের জাতীয় জীব, তাঁহার মনেরও যে উত্থান পতন ছিল তাহা ললিত বিস্তর পাঠে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইত বুঝি গৃহ ত্যাগ করা ঠিক কার্য্য হয় নাই, কখনও সন্দেহ হইত নির্ব্বাণ লাভ হইবে না; ফলে এ সময়ের সামান্য সাধকগণের যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হয় তাঁহারও তাহা হইত, তবে অবশ্য অতি অল্পপরিমাণে হইত ও তিনি অতি সত্বর তাহা দূর করিতে পারিতেন। এই সকল সময়ে কোন বিশেষ আলোকে পুনরায় অন্তরে বল লাভ করিতেন। এ সকল কথা নানা রূপ রূপক বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা বলা যায় না। যখন এত সাধন করিয়াও সম্বোধি লাভ হইল না। তখন পুনরায় তাঁহার মনে সংশয় আসিল। তখন তাঁহার নিকট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণের সমাগম হইল। যাঁহারা পূর্ব্বকালে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া তথাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বাসবাণী বলিয়া গেলেন। ঈশা পর্ব্বতোপরি গভীর উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন যেমন তাঁহার নিকট আইজায়া ও মুশা উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা ঠিক সেইরূপ ব্যাপার। তাঁহারা ঈশার জীবনের শেষ উন্নতি ও পরিসমাপ্তির কথা বলিয়া গেলেন, পূর্ব্ব বুদ্ধগণও উপস্থিত হইয়া শাক্যের নির্ব্বাণ লাভের কথা বলিয়া গেলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের এই গভীর সত্য কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে মানুষ মহাবীর হইলে, সকল ধর্ম্ম পালন করিলেও ঠিক আপনার চেষ্টায় ভবসাগর পার হইতে পারে না, আপনার অতীত শক্তি আসিয়া সাহায্য করা প্রয়োজন হয়, শাক্য ঈশ্বর বিশ্বাস লইয়া সাধন করেন নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে ঈশ্বরের নামই নাই। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাসী তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে এই পথে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান করিল।

যে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে শাক্য সিংহ সম্বোধি লাভ করিলেন তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণে আশা পাইয়াছিলেন যে অভিষ্ট সিদ্ধির সময় উপস্থিত। তিনি রাত্রির প্রথম প্রহরে তৃণ আসনে বজ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। যত প্রকারের

ধ্যানে অভ্যস্থ ছিলেন তাহাতে সাধনবলে প্রবেশ করিলেন ; আপনি অকিঞ্চন, স্বর্গ মর্ত্ত কিছুই সম্মুখে নাই, এই অবস্থাতে আকাশবৎ অবস্থায় স্থিতি করিলেন। তাহার পরের ধ্যানের বিষয় লিখিত আছে যে "একদিভাব" হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার অনেক টীকা ও অর্থ আছে, আমরা তাহার মর্ম্ম ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসীর ভাষায় বলিতে গেলে হয়ত বলিতে হইবে যে, শাক্য ধ্যানযোগে এক অদ্বিতীয়কে দর্শন করিলেন, অর্থাৎ জীবে নিত্য সত্যকে দর্শন করিলেন। তাহার পর চতুর্থ ধ্যানে তিনি নির্ব্বাণ ধাতুতে বিলীন হইয়া গেলেন। বৌদ্ধ টীকাকারগণ একথার আর টীকা করেন নাই। কারণ তিনি যে অবস্থা লাভ করিলেন তাহাতে সকল নিবৃত্তি, বর্ণনাও নিবৃত্তি। তখন থাকিল কেবল শান্তি ; লাভ হইল অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। তাঁহার স্বভাব মঙ্গল স্বভাব হইল।

অনেকের মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয় বুদ্ধদেবের আমিত্ব বিনাশ হইয়াছিল, তিনি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইলে তখনই তাঁহার জীবনেরও কি শেষ হইয়াছিল ? আমরা জানি তিনি ২৯ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করেন, ৩৬ বৎসর বয়সে সম্বোধি লাভ করেন এবং অশিতি বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি নির্ব্বাণ লাভের পর ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, এই দীর্ঘকালে তাঁহার জীবন যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি নির্ব্বাণ কি ? অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ হইলে কি কি যায়, কিকি থাকে, নির্ব্বাণের দ্বারা কি লাভ হয় তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। এই কথা আলোচনা করিতে সর্ব্ব প্রথমে শান্তির কথা মনে হয়। কি অলৌকিক শান্তিই তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং জনগণকে কি শান্তি দান করিয়া মুগ্ধ করিতেন চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। মহা শত্রু তাঁহার নিকট আসিয়া শত্রুতা ভুলিয়া যাইত, ভয়ানক শোকার্ত্ত তাঁহার নিকট যাইয়া শান্তি পাইত। দস্যু তাঁহার নিকট যাইয়া দস্যুবৃত্ত ত্যাগ করিত। যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত দুই সেনানায়ক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিজয় তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইত। এই দীর্ঘ কালের কত ঘটনা বর্ণিত আছে কিন্তু বুদ্ধের ব্যস্ততার কোন উল্লেখ নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি শান্তি হারা হন নাই। এমন কি সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা আলেচনা করিতে করিতে অন্তরে শান্তির ভাব উপস্থিত হয়। যে সকল দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই সকল দেশের কোটি কোটি নর নারীকে পৃথিবীর অপর সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোক হইতে এইটি পৃথক যে বৌদ্ধগণ শান্তি প্রিয়, শান্তিতে অভ্যস্ত শান্তির সাধক বুদ্ধের অপর বিশেষ ভাব সহানুভূতি, উদার প্রেম, যিনি অপরের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিলেন, করিলেন, তিনি সকল দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত ছিলেন। নরনারী বাসনানলে জ্বলিতেছে ইহাই তাঁহার জীবনের এক দুঃখ ছিল এবং এই জন্যই সকলের হিতের

অন্ত্য অশীতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা স্থানে বিচরণ করিয়া দুঃখ নিবৃত্তি বা পথ প্রচার করিলেন।

শাক্যসিংহ দুঃখকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দুঃখের অন্ত করিয়া জগৎকে বলিয়া গেলেন যে আমি চারিটি আর্য্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছি তাহা সকল নরনারীর পক্ষে সত, এজন্য ইহা সকলের গ্রহণীয়। সে সত্য চারিটি এই, যথা:—(১) দুঃখ সত্য, (২) দুঃখের উৎপত্তি সত্য, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি সত্য, ও (৪) দুঃখ নিবৃত্তির পথ সত্য। সেই পথ বা মার্গ অষ্টাঙ্গ। তাঁহাকে যাঁহারা দুঃখবাদী বলেন তাহারা তাঁহাকে দুঃখান্তক বলিলেই কথাটা সত্য ও শোভন হইত। কারণ তিনি নিজে দুঃখের সমস্যা পূরণ করিয়াছেন এবং জগতের দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে নানাশ্রেণীর দার্শনিকদিগের সহিত একভাবাপন্ন প্রমাণ করিতে যত্ন করা হয়। কেহ তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী বলেন, কেহ বস্তুবাদী বলেন, কেহ নিরীশ্বরবাদী বলেন। এ সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকের সহিত তাঁহার চিন্তার সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু শাক্যসিংহ কেবল দার্শনিক মত দ্বারা পরিচিত হইবার লোক নহেন। তিনি এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর। তাঁহার প্রদর্শিত সত্য গ্রহণ করিয়া অষ্টাঙ্গমার্গ সাধন করা প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। আমরা এ বিষয় যতই আলোচনা করি ততই মনে হয় যে ঈশার বিশ্বাস ও নির্ভরের শান্তি, সাধারণও যেমন তাঁহাকে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমস্ত জীবন তীব্র সম্বেগের সহিত প্রেম সাধন করিতে হইয়াছে শাক্যসিংহকেও নির্ব্বাণ শান্তি লাভ করিতে তীব্র সম্বেগসম্পন্ন হইয়া কঠোর সাধন করিতে হইয়াছে। শাক্য বলিলেন নির্ব্বাণ অর্থ শান্তি, ঈশা বলিলেন, নির্ভর অর্থ শান্তি।

আমরা এ বিষয়ে যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে শাক্যসিংহ সাধনবলে মনুষ্য স্বভাবের হীনতা পরিহার করিয়া দেবভাবে জীবনধারণ করিয়াছেন, অতএব নির্ব্বাণ অর্থ মনুষ্যের মরণশীল অংশের নির্ব্বাণ বা মৃত্যু এরূপ জীবন কাহার না আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী?

মহর্ষি জীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব। *

মহর্ষিদেবের দীক্ষা-দিন উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সকলে সমাগত হইয়াছি। যাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্মপথের—কল্যাণপথের প্রকৃত সন্ধান জানাইয়া দেন, তাঁহারা আমাদের গুরু ও নমস্য। বর্ত্তমান যুগে মহর্ষিদেবের সমুন্নত জীবনের প্রভাব আমাদের সকলের উপর যেরূপ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। অদ্যকার এই শুভদিনে

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা দিন উপলক্ষে বিগত ৭ই পৌষ মহর্ষিদেবের বাটীর দালানের বেদী হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই তিনি আপনার সমুদয় বলবীর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এ দিনটি যে কেবল মহর্ষিজীবনের একটি পবিত্র দিন তাহা নহে, এ দিন আমাদের সকলেরি পক্ষে স্মরণীয়।

মহর্ষি জীবন আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা দেখি :—

১। সত্যলাভের জন্য তাঁহার দারুণ ঔৎসুক্য। কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃত সত্য বুঝিবার জন্য তিনি বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি চারি জনকে বেদাধ্যয়নের জন্য বারাণসীতে প্রেরণ করিয়াছেন। অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, ঈশ্বরের স্পর্শ এক একবার লাভ করিতেছেন, পরক্ষণেই তাঁহাকে হারাইতেছেন। এই সময়কার তাঁহার রচিত সঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিতেছে,—

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে ;
হারায়ে জীবন-শরণে
কি কাজ জীবনে আমার।"

ঈশ্বরের অন্বেষণে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত, তাঁহাকে তিনি না পাইলে ফিরিবেন না।

২। ধর্ম্মকে সকলের মধ্যে দিবার জন্য একান্ত চেষ্টা। পরে যখন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিলেন, তখন সে আনন্দ তিনি একাকী ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিসে সকল লোক সেই আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজে প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারক নিয়োগ করিয়া সে আনন্দ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থব্যয়ের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি তাঁহার আয়ের বহুল অংশ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত পুরুষ নিতান্তই বিরল।

৩। তাঁহার দীনতা। তিনি ধনীর সন্তান। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার জন্য সমুদয় অভিমান এককালে বিসর্জ্জন দিয়া জনসাধারণের সহিত তুল্যভাবে মিশিতেন এবং অপরকে উচ্চ আসন দিতেন। প্রথমে তিনি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেন—বলিতেন "আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী নই। বিদ্যাবাগীশ, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরই উহাতে উপযুক্ত অধিকার। আমি বিষয়ীর পুত্র—বিষয়ী যজমানের ন্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতগণের অধস্তন সোপানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করাই আমার যোগ্য।" পরে অনেক দিন বিলম্বে সকলের অনুরোধে তিনি বেদীতে বসিতে আরম্ভ করেন।

৪। তাঁহার নিষ্ঠা। ব্যাখ্যান তাঁহার রসনা-বিনির্গত। এই সময়ে তিনি প্রতি বুধবার প্রাতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বেদীর নিম্নে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। একবার বাটীতে গিয়া স্নানাহার সম্পন্ন

করিয়া আবার ধ্যানে বসিতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর একবার বাটী গিয়া স্নানান্তে পট্টবাস পরিধান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতেন। তাঁহার বক্তৃতা এক নূতন ধরনের ছিল। বলিতে বলিতে এক একবার তিনি থামিয়া যাইতেন, পরক্ষণেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিধারার ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানগুলি তাঁহার মুখ হইতে সবেগে বিনির্গত হইত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলিতেন যে যখন আমি এ বয়সে ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া আমার এখনকার জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখি, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যাই,—বুঝিতে পারি না যে কেমন করিয়া সেই তরুণ বয়সে আমার মুখ হইতে সেই সকল উপদেশ বাহির হইয়াছিল।

৫। তাঁহার ভোগ। বিষয়রাজ্যে তাঁহার ভোগ ছিল না, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সম্ভোগ "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃত রস পানে।" "বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে" ইহাই তাঁহার রচিত সঙ্গীত। তিনি বলিতেন আমরা যে জেগে আছি এ জাগা নয়, এ যে মৃত্যু, এ যে অসাড়তা; আত্মার জাগাই জাগা, আত্মার স্পন্দনই প্রকৃত স্পন্দন। তাঁহার বিরচিত সঙ্গীত হইতেই তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাই—

"যোগী জাগে,
ভোগী রোগী কোথায় জাগে—
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃত রসপান—
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর, সেই জাগে।"

৬। তাঁহার উপাসনাপরায়ণতা। মহর্ষি পরিবারবহুল সংসারে অবস্থান করিতেন; কত বিপ্লব কত শোকাবহ ঘটনা তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি অচল, অটল। একদিনের জন্যও তাঁহার উপাসনা ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

৭। প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বর সন্দর্শন। আমরা প্রতিদিন "যোদেবো-হগ্নৌ যোপ্সু" এই মন্ত্র পাঠ করি। ফলতঃ তিনি যে অগ্নিতে জলেতে সর্ব্ব বস্তুতে রহিয়াছেন এ বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু মহর্ষিদেব ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য তাঁহার শক্তি তাঁহার বল সকল পদার্থের ভিতরে সুস্পষ্ট-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেন। তিনি নৌকা-যোগে পদ্মায় বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে চারিদিক শুভ্র হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইত। তিনি অনিমেষ নেত্রে সে শোভা সন্দর্শন করিতেন। সকল শোভার আকর, সকল সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ যিনি, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্তায় তিনি ডুবিয়া যাইতেন। তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া অমৃত পান করি-তেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া যাইত। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আমরা তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে প্রায়ই যাইতাম। প্রাতে গিয়া দেখিয়াছি তিনি উদীয়মান সূর্য্যের

উপরে পলকহীন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব'সিয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় হৃদয় বিগলিত। যিনি সূর্য্যের সূর্য্য, তাঁহারই ধ্যানে তিনি নিমগ্ন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার বারান্দার পূর্বদিকের সমুন্নত গাছগুলি তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের মহিমান্বিত উদয় দেখিয়া তাঁহার মহিমায় নিয়মিতরূপে নিত্য ডুবিবেন, এই তাঁহার প্রাণের সাধ ছিল। তিনি এত স্থান থাকিতে সেই বিশাল প্রান্তরের ভিতরে বোলপুরের শান্তিনিকেতন কেন প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, যে, সেই অসীমের সহিত হৃদয়ের সুর মিলাইতে হইলে ঐরূপ অনুকূল স্থানের নিতান্ত প্রয়োজন।

৮। তাঁহার অনুশাসন—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা এই, "যাহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও"।

৯। ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বাস। আমরা তাঁহাকে শেষ প্রায়ই বলিতাম যে, আপনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের যে ভয়ানক দুর্গতি হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া আমরা ভীত হই। তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন যে, ঈশ্বর তাঁহার এই পবিত্রতম সত্যধর্ম্মকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তিনি ইহার উন্নতি ও রক্ষার উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ম্লান হইবার নহে। "রামমোহন রায়ের বোঝা যে আমার মস্তকের উপরে আসিয়া পড়িবে কে ভাবিয়াছিল? তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি নিশ্চয় উহার বিধান করিবেন"।

১০। তাঁহার অনন্যপরায়ণতা। ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরম উদ্দেশ্য ছিল। তাই অন্য কোন বিষয়ে বা সমাজসংস্কারে তিনি আপনার শক্তি নিয়োগ করেন নাই। তিনি আপনার পরিবারের ভিতরে যথোচিত সংস্কার পূর্ণমাত্রায় আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের এমনই পবিত্রতম ব্রত ছিল এবং উহার ভিতরে এতই পরমানন্দ তিনি উপভোগ করিতেন, যে অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার শক্তিকে দ্বিধা হইতে দেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিবার জন্য তাঁহার চিরব্যাকুলতা ছিল।

১১। তাঁহার প্রশংসা-বিমুখতা। কত গ্রাম, কত নগরে, কত দূরদূরান্তরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, কত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সংবাদ পত্র তাহার সন্ধান জানে না। তিনি নিস্পৃহভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। নীরবে নির্জ্জনে তিনি সাধনা করিয়াছেন। প্রশংসালাভের ব্যাকুলতা তাঁহাকে কোন বয়সে আকুল করিয়া তোলে নাই। মহর্ষির দেহান্তে তাঁহার ভস্মরাশি শান্তিনিকেতনে স্থান পাইবে এবং তাহার উপর একটি মন্দির নির্ম্মিত

হইবে, এক সময়ে তাঁহার জীবদ্দশায় এইরূপ একটি প্রস্তাব তাঁহার সন্তান সন্ততি ও শিষ্যবর্গের মধ্যে উঠিয়াছিল। যখন এ কথা মহর্ষির কাণে পৌঁছিল, তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "তোমরা কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। এ অবতারপ্লাবিত দেশে ওকথা মুখে আনিও না। আমার আদেশ জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের বিন্দুমাত্র আমাতে আরোপ করিয়া পাছে আমার সমাধির উপরে কেহ ফলপুষ্প উপহার দেয়, ইহাই আমার দারুণ আশঙ্কা"। যখন চিন্তা করি বিস্মিত হইয়া পড়ি, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। কি অসাধারণ মহত্ব। কি উচ্চ গগনে তাঁহার আত্মা সঞ্চরণ করিত। ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কি আশ্চর্য্য প্রখরতা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যতই চিন্তা করি, তাঁহার বিশেষত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। এই যে দীক্ষা—এই যে ধর্ম্মজগতে প্রথম পদবিক্ষেপ, কে ইহার গুরুত্ব মহর্ষির মত এমন বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণার প্রথম রেখাপাত মহর্ষির মত কে বা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আজীবন স্মরণ করিয়াছে।

তিনিত চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ দীক্ষা কেবল তাঁর নয়। তাঁহার দীক্ষাতে আমাদের সকলেরই দীক্ষা। তাঁহার দীক্ষা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকেই আলোক লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যতকাল থাকিবে, মহর্ষির দীক্ষাতে সকলেরই দীক্ষা ঘটিবে, গতিমুক্তির পথ সম্মুখে অনাবৃত দেখিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থতা লাভ করিবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

কেন?

কেন আশাহত হয় মানবে
নিভৃতে নিজনে হৃদয়ের কোণে
যে আশা লতাটি রাখেগো যতনে
কেন বাথিয়া পরাণ নির্ম্মম করে
নির্ম্মূল করে দানবে!
কেন আশাহত হয় মানবে?

কেন এত দুঃখ বাজে হৃদয়ে
যারে ভাল বাসে অন্তর দিয়া
সে যদি কভুগো তুচ্ছ করিয়া
কথা নাহি কয় চলে যদি যায়
চরণে দলিয়া নিদয়ে!
কেন এত দুঃখ বাজে হৃদয়ে?

কেন মর্ম্ম বিদরে হায়রে,
ভাল বেসে যারে দেয় উপহার
হৃদে বড় বাজে উপেক্ষা তার,
কেন সরল পরাণ হেরি অপমান
মরমে মরিয়া যায়রে,
কেন মর্ম্ম বিদরে হায়রে?

কেন নীরবেতে আঁখি ঝরেগো
ঈপ্সিত ধনে নাহি যদি পায়
প্রতি পলে পলে শোণিত শুকায়
কেন হৃদয় ভিতরে ভীষণ আগুন
দগ্ধ করিয়া মারে গো,
কেন নীরবেতে আঁখি ঝরেগো?

কেন অন্তর জলে পিয়াসে
তৃপ্তি কভুগো কখন হবেনা

সংযম বিনা শান্তি রবেনা
কেন বাসনা অনল পশিয়া হৃদয়ে
তবেগো জ্বালায় নিরাশে ;
কেন অন্তর জ্বলে পিয়াসে ?
কেন গঠনি পরাণ পাষাণে
(যদি) দিবে এত দুখ সহিতে মানবে
কঠিন ব্যথাই হৃদয়ে জানাবে
কেন দাওনি সে সব সহিতে শকতি
রাখিতে মনেরে শাসনে ;
কেন গঠনি পরাণ পাষাণে ?

শ্রীইন্দু প্রভা দেবী—
দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট

স্ত্রীলোকদিগের জাতীয় বিষয়ে মত প্রকাশের অধিকার সম্বন্ধে বিপক্ষ দলের মত।

[প্রশ্নের উত্তর।]

আমার প্রথম প্রবন্ধ মহিলাতে বাহির হইবার পর যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল বলিয়া আশা করি তিনি মার্জ্জনা করিবেন। যে মাসের মহিলাতে প্রশ্ন বাহির হইয়াছিল, সেই মাসের মহিলা অনবধানতাবশতঃ খুব অল্প দিন হইল আমার কাছে আসিয়াছে এবং সেই জন্যই উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল।

প্রশ্নকারী দুইটী বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন। প্রথম—"বিরুদ্ধ দল (Anti Suffragists) নারীর অধিকার দাবীর বিরুদ্ধে কি যুক্তি দেখান," এবং দ্বিতীয়—"আজ পর্য্যন্ত Suffragistরা তাঁহাদের আন্দোলিত সংস্কারকে কতটা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন।"

আজ আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

সাফ্রাজিষ্টদের বিরুদ্ধে যা মত, তাহা বুঝাইতে হইলে বোধ হয় ইংলণ্ডের মহাসভার সাধারণের প্রতিনিধি সভার (House of Commons) আধুনিক বক্তৃতার, অন্যান্য সাধারণ স্থলে পঠিত বক্তৃতার এবং সংবাদ পত্রে তাঁহাদের মতামতের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাহা সহজে বোধগম্য হইবে।

তাঁহাদের প্রথম যুক্তি—"স্ত্রীলোকেরা যে সমান অধিকার চান, তাঁহাদের শরীরের শক্তি কি পুরুষের সমান? মেয়েরা কি যুদ্ধ করিতে পারেন"?

অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে স্ত্রীলোক বীর-যোদ্ধৃীর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং স্ত্রীলোকেরা প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের দায়িত্বের ভাগ আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন করেন, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? কামানের সাহায্যে শক্রনিপাত করা অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানে রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যে শক্তি ও সাহসের দরকার, তাহা প্রদর্শন করিয়া সেবাব্রতিনী সৈন্যদল কি যুদ্ধ করিবার অধিকতর প্রকৃত শক্তির পরিচয় দেন না? আবার স্ত্রীলোকেরাই দেশ রক্ষার জন্য মাতারূপে সন্তানদিগকে কি লালন পালন করেন না? তবে তাঁহাদের কি দুই কাজই করিতে বলা হইবে?

এ রকম তর্ক ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি বিরুদ্ধ দলকে জিজ্ঞাসা করি যে, পুরুষেরা যুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়াই কি তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে? যাঁহারা শারীরিক অক্ষমতা নিবন্ধন যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের এই অধিকার হইতে কি বঞ্চিত করা হইয়াছে? কখনই না। সাধারণ দেশবাসী দেশ রক্ষার্থে সৈন্য ও রণতরীর জন্য কর দিয়া কেবল মাত্র সাহায্য করিয়া থাকেন, আর এ রকম সাহায্য প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে করিয়া থাকেন। এ রকম যুক্তির মজা এই যে, যেই কোন পুরুষ সৈন্যদল ভুক্ত হয় সে ভোট দিবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়।

তার্কিকেরা কিছুতেই বিচলিত নন। কথায় কথায় তাঁহাদের প্রিয় প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, "স্ত্রীলোকেরা কি নগরাদির শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম"? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এই প্রশ্নের উত্তরও প্রথম যুক্তির উত্তরের মত। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রধান বিষয় এই যে, প্রথমতঃ সিপাহি ইত্যাদি দ্বারা নগরাদির শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করার সুব্যবস্থা হইবার পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীলোকেরা অধিকার পাইবার জন্য দাবী করিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ নারীগণ যে পুলিসের কাজ একেবারে পারেন না তাহা নহে। আমেরিকা ও ইউরোপে কোথাও কোথাও মেয়েদের পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে ও তাঁহারা বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বিরুদ্ধপক্ষের একজন Parliament এর বিখ্যাত সভ্য এইরূপে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদিগকে ভোট সম্বন্ধে স্বাধীনতা ইউরোপের কোন দেশে কোন কালে দেওয়া হয় নাই"; অতএব ব্রিটীশ রাজ্যতন্ত্রেরও এই রকম কার্য্যে উৎসাহ দান করা অবিবেচনার কার্য্য।

কেহ আগে করেন নাই বলিয়া করা উচিত নয়, এই মতের পরিপোষণ করিলে কি আজ আমাদের পুরুষেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক, শিল্প, নৈতিক, ইত্যাদি উন্নতি—যাহা এখন আমাদের গৌরবের বিষয়—তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন?

ভদ্রলোকটী আরও বলিতেছেন যে, যে সকল মহিলার municipal (নগরের বিধিবদ্ধ কার্য্য সভা সম্বন্ধীয়) ভোট দিবার অধিকার আছে—তাঁহারা তাহা একেবারেই ব্যবহার করেন না, তবে আর কেন স্ত্রীলোকদিগকে ঐ অধিকার দেওয়া? ইঁহার পূর্ব্বেই যিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তিনি ইহার ঠিক উল্টা যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি স্ত্রীলোকদের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে একমত হইয়া পুরুষদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন ও মতদানে পুরুষদের একেবারে পরাস্ত করিবেন; এরকম অবস্থা কল্পনা করাও ভয়ানক, সুতরাং মেয়েরা যাহাতে অধিকার না পান সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু অধিকারার্থিনীগণ বলিতেছেন—যদি কয়েকজন নারী তাঁহাদের একটা অধিকার ভাল করিয়া ব্যবহার না করিয়া

থাকেন কিম্বা উদাসীনতা দেখাইয়া থাকেন, সেই জন্য কি যাঁহারা নাগরিকের কর্ত্তব্য পালনের জন্য ব্যগ্র ও উৎসুক তাঁহাদের সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ন্যায়-সঙ্গত ?

নারীগণ দ্বারা পুরুষদের 'একেবারে পরাস্ত' হইবার ভয় একেবারে অমূলক। তাঁহারা মনে করেন যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা একমত হইবেন ও সমস্ত পুরুষেরা অন্য মত হইবেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই রকম অবস্থা কখনই সম্ভব নয়। এখন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পাইবার জন্য প্রায় সকলেই একমত কিন্তু অধিকার পাইলে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে সবাই একমত হইবেন তাহা কখনই নহে ; পুরুষদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ হয় তেমনি তাঁহাদেরও হইবে। পুরুষদের মধ্যে যেমন প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন মত আছে, মতের বিভিন্নতা আছে, স্ত্রীলোকদিগের ভিতরও ঠিক সেই রকমই আছে, আর এই স্বতন্ত্রতাই তো ভবিষ্যতের আশা।

একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রী (Cabinet Minister) বলিতেছেন যে স্ত্রীলোকেরা ভোট লইতে ইচ্ছুক নহেন সুতরাং তাঁহাদের পাওয়া উচিত নয়। স্ত্রীলোকেরা চান কি না তাহা বুঝিতে হইলে ব্রিটেনের এই তথ্যগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি যতদূর জানি ব্রিটেনে ৩০টী সমিতি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে ও কেবলমাত্র একটী বিরুদ্ধে আছে। গত পঞ্চাশ বৎসর এত বেশী সমিতি হইয়াছে যে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তবে সাফ্রেজিষ্ট সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহা কৌতূহলের বিষয়। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইড্ পার্ক হইতে একজটর হলে ৩০০০ স্ত্রীলোক প্রশেসন করিয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে ১৫০০০ স্ত্রীলোক লণ্ডন সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে জুলাই মাসে হাইড পার্কে ৪০টী মঞ্চ হইতে সাধারণ লোকের জন্য বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ৩।৪ লক্ষ লোক যোগ দিয়াছিলেন। আবার ১৯১১ সালের জুন মাসে ৪০০০০ স্ত্রীলোক লণ্ডনের ভিতর দিয়া প্রশেসন করিয়া গিয়াছিলেন। মেয়েরা ভোট চান, কি চান না তাহা এই সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অধিকারপ্রার্থিনীদের কেবলমাত্র একটী মণ্ডলী নয় ; The Woman's Social & Political Union এপর্য্যন্ত, ১৩৭,০০০ পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই মণ্ডলীর ১০০০ জন সভ্যকে শান্তির জন্য অপরাধ অনুসারে এক সপ্তাহ হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে অবরোধ করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে ৪০০০কি৫০০০ সহানুভূতিকারীদের একজন হইয়া সকলে মিলিয়া ৬ জন বীরনারীকে অভ্যর্থনা করিতে অবকাশ পাইয়াছিলাম। ইহারা এডিনবরা হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ৪০০ মাইল হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। কেবল-

মাত্র গবর্ণমেণ্টের কাছে আগত সভাতে যেন স্ত্রীলোকদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় এই সম্বন্ধে একটী আবেদনে যাঁহাদের এই কার্য্যে সহানুভূতি আছে তাঁহাদের স্বাক্ষর লইবার জন্য ইঁহাদের এই পরিশ্রম। সেই সহির খাতা এত বড় হইয়াছিল যে, একটী প্রকাণ্ড শকটে রাখিয়া তাহা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকদের এই রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও এই রকম স্বার্থত্যাগ চক্ষে দেখিয়াও যে পুরুষেরা কি করিয়া বলেন যে স্ত্রীলোকেরা ভোট চান না তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

বিরুদ্ধ দলেরা কেহ কেহ এই ভয় পান যে মেয়েদের এই অধিকার দেওয়া হইলে রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা প্রযুক্ত গৃহে গৃহে অশান্তি হইবে। কিন্তু অশান্তির ভয় কি কেবল মেয়েদের ভোট দিলেই হইবে? তার্কিকেরা সংসারে ধর্ম্মবিষয়ে, শিল্পবিষয়ে, আচার ব্যবহার, খাদ্য, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনৈক্যে শান্তিভঙ্গের ভয় করিলেন না, করিবার কারণ দেখিলেন না, দেখিলেন কেবল, বুঝিলেন কেবল, বুঝাইলেন সবাইকে, যে যদি শান্তি রাখিতে চাও মেয়েদের ভোট দিবার অধিকার দিও না।

মতের অনৈক্য হইলেই কি হিংসুক ও কলহপ্রিয় হইতে হয়? মতের ভিন্নতা কি বিশ্বস্রষ্টার প্রদত্ত নূতন প্রাণ, নূতন সজীবতায়, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে না? বিরুদ্ধবাদিগণ নিজের জোরে বলিতেছেন যে অমুক লোকেরা এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন না জানেন না সুতরাং তাঁহাদের কথা বলিয়া দরকার নাই, বলিলেই মতে মিলবে না, অশান্তি হইবে। বলি, শান্তির ভিখারীরা, আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া কি তোমরা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছ? চেষ্টা বিফল হইবে। শান্তি সম্ভব কোথায়? যেখানে সকলের সঙ্গে খুব গভীর খুব উচ্চ সহানুভূতি আছে যেখানে স্বাধীন মতের ভিতর সমন্বয় দেখিবার সহানুভূতি আছে, সেইখানে শান্তি সম্ভব।

কৌতূহলের বিষয় এই যে, যে মহিলাটী বলিতেছেন যে মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয় কিছু জানেন না কিছু বুঝেন না তিনি নিজেই স্বপক্ষীয় কোন সংবাদ পত্রে "ইংরাজ শাসনে লর্ডসভার (House of Lords) মূল্য ও উপকারিতা" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সাহস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র যাহাতে ভবিষ্যতে Parliamentএর সভ্য হইতে পারেন তাহার সমর্থন করিবার জন্য যে সব সভাসমিতি হইয়াছে তাহাতে তিনি নিজের পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া সাধারণ সভাতে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন ও সাধারণের সম্মুখে পুত্রের নিকট হইতে তাহাকে পার্লামেণ্টের সভ্য করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ পাইয়াছেন!

আমার মনে হয় যে পার্লামেণ্টে এমন একটীও সভ্য নাই যিনি সভ্য হইবার জন্য, স্ত্রী, কিম্বা কন্যা, কিম্বা ভগ্নী, কিম্বা কোন মহিলা বন্ধুর কাছে সাহায্য না লইয়াছেন; সাহায্যকারী মহিলা সভাতে পক্ষ

সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন কিম্বা বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোট সংগ্রহার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও এই ভদ্রলোকেরাই বার বার বলিতে ভুলেন না যে, "মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয় আবার কি জানেন!"

ক্রমশঃ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।—বড়দিনের ছুটীর পর ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য আবার নিয়মিত রূপে আরম্ভ হইয়াছে। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে ছুটীর পূর্ব্বে School Inspector শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু ও সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও মহামান্য কাশীম বাজারের মহারাজা বাহাদুর স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্কুলের বন্দোবস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মেয়েদের Cooking Class and Music Class দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহামান্য মহারাজা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে "তোমরা খুব লেখাপড়া শিখিবে; আগে এদেশে যে সব মেয়ে ছিলেন যেমন লীলাবতী, খনা প্রভৃতি তাঁহাদের মত হইবে।" ইঁহাদের আগমন উপলক্ষে স্কুল তিন দিন বন্ধ ছিল।

এখন স্কুলে একশত একচল্লিশটী শিশু ছাত্র ও ছাত্রী হইবে এবং এ মাসের মধ্যেই দেড় শতের অধিক ছাত্র ছাত্রী হইবে এমন আশা করা হইতেছে। এ বৎসর স্কুল হইতে দুইটী ছাত্রী Matriculation পরীক্ষা দিবেন। শনিবারে মহিলাদিগের জন্য বক্তৃতা প্রদানের কার্য্য আবার আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম শনিবারে পারস্য দেশ হইতে আগত মেঃ সিরাজী বি, এ, "পারস্য ও পারস্য-মহিলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোর্ডিং এর ছাত্রী সংখ্যা এখনও খুব কম, নূতন বৎসরে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হইবে এমন আশা করা হইতেছে।

মহিলার পাঠিকাগণ বোধ হয় ফাদার ডামিয়ানের কথা শুনিয়াছেন ইনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে হনলুলু উপনিবেশে কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশে গমন করিয়া নিজে তাহাদের সেবা শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি নিজেও উক্ত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের সঙ্গে বাস করিয়া আশা ও বিশ্বাসের বার্ত্তা এবং আত্মার অমরত্ব, পরলোকতত্ত্ব ও ঈশ্বরপ্রেম প্রচার করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। ঈশ্বরের প্রেম যুগে যুগে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রকাশিত হয়।

আমরা অদ্য দ্বিতীয় ফাদার ডামিয়ান ডাক্তার সার্ জর্জ্জ টারনারের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি;—ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল দেশে আপন গভীর গবেষণা দ্বারা টাইফয়েড প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের সংক্রামকতা হ্রাস করিবার অনেক উপায় আবিষ্কার করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। উক্তস্থানে তিনি কুষ্ঠরোগী

দিগের জন্যও একটী স্বতন্ত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া গত ২ বৎসর হইতে ডিভনসায়ারে একাকী দিনাতিপাত করিতেছেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ইহা অবগত হইয়া নিজেই নববর্ষের দিনে তাঁহাকে Knight উপাধিতে ভূষিত ও তাঁহার পেনসন্ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে কুষ্ঠরোগে তিনি বামহস্ত হারাইয়াছেন।

বড়লাট লর্ড হার্ডিং দিল্লীতে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর পত্নী লেডি হার্ডিং এর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য ও তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে মান্দ্রাজ গবর্ণর পত্নী লেডি পেণ্টল্যাণ্ড ভারতীয় নারীজাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁর ভাবের অনুসরণ করিয়া আমাদের গবর্ণর পত্নী লেডি কারমাইকেলও নারীদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতীয় নারীদিগের স্বাক্ষরযুক্ত যে পত্র প্রদত্ত হইবে তাহাতে রাজভক্ত বঙ্গমহিলার যে সম্পূর্ণ মত আছে তাহা অবশ্য বলিবার অপেক্ষা রাখে না। মহিলার পাঠিকাগণ এই কার্য্যে অবশ্যই যোগদান করিবেন।

নূতন ধূমকেতু।—হারভার্ড কলেজের মানমন্দিরে গত ৮ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক গেল্ এবং সিডনে একটা নূতন ধূমকেতু দর্শন করিয়াছেন।

চলিষ্ণু চিত্রাবলী ও বাক্য কথন।—অনেকেই বায়স্কোপ দেখিয়াছেন। বায়স্কোপের চিত্রসমূহ কেন ওরূপ ভাবে জীবন্ত বা চলিষ্ণু মনে হয় তাহার কারণ সময়ান্তরে আলোচিত হইবে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বায়স্কোপ কোম্পানী সময়ে সময়ে চলিষ্ণু চিত্রের সহিত গ্রামোফনের গান এইরূপ ভাবে সংযোজিত করেন, তাহাতে মনে হয় যেন চিত্রই বাস্তবিক গান করিতেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার কিট্‌স এই পন্থা উদ্ভাবন করেন। সম্প্রতি তিনি গানের পরিবর্ত্তে গ্রামোফোনের রেকর্ডে চিত্র সমূহের কথাবার্ত্তা উত্থিত করিয়া লইয়া এইরূপ ভাবে চিত্র প্রদর্শন করিছেন যে হঠাৎ মনে হয় যেন চিত্র সমূহ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ইহা এখনও আমাদের দেশে আমদানী হয় নাই।

রমণী ও জারমান বিশ্ববিদ্যালয়।—জারমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রমণী ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ২,৯১৮ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০৬২, তিনটি ব্যাভেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৭৯, দুইটি বাডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪১৭ এবং অবশিষ্ট ৩০০ সমগ্র জারমান দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২,৫০০০ রমণী বিশুদ্ধ জারমান বংশ সম্ভূতা। ২,৯১৮ জন ছাত্রীর মধ্যে ১,৬৩০ জন সাহিত্য এবং ইতিহাস, ৫৩০ গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, ৬৫ জন চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৭৪ জন রাজনীতি এবং কৃষি বিজ্ঞান, ৩৯ জন আইন বিদ্যা, ২৮ জন দন্ত বিজ্ঞান, ৭ জন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং ১১ জন ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।
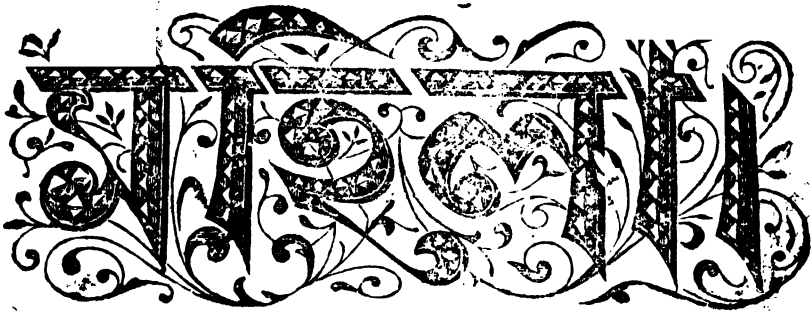
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০শ ভাগ] মাঘ, ১৩১৯। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩। [১০ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণ, হে মঙ্গলময়, দেখ, নরনারী সকলেই আপন আপন অভাব অপূর্ণতার জন্য চীৎকার করিতেছেন। যাহার যাহা আছে তাহা তুমি দিয়াছ; কোথায় সে জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া, তোমার প্রেম স্বীকার করিয়া, তোমার চির পূর্ণপ্রেমে ডুবিবে, তাহা না করিয়া প্রত্যেকে সংসারেই সকল প্রকারের ধন, সুখ, ও পূর্ণতা অন্বেষণ করিতেছেন। তুমি আপনার পূর্ণ মঙ্গল বিধানে এখানে কাহাকেও পূর্ণতা বিধান করিবে না, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; ধন, জন, স্বাস্থ্য, সম্ভোগ এই সকলকেই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু মনে করিয়া চিরদিন তাহাদেরই অন্বেষণে দিন কাটাই। তুমি অনন্ত সুখধাম, তুমি তোমার সকল দান হইতে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, একথা মুখে বলি অথচ অন্তরে তোমারে চাই না, সংসার চাই। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তোমার কন্যাগণকে বলিয়া দেও যে, তুমি এখানে যাঁহাকে যাহা দিয়াছ যেন তাহা অপেক্ষা অধিক বৃথা প্রার্থনা না করেন এবং যত কিছু অভাব, অসুখ, কষ্ট, দুঃখ, তাহা দূর করিতে যেন অধিক হইতে অধিকতররূপে তোমাকে অন্বেষণ করেন। হে প্রেমময়, তুমি তোমার কন্যাগণকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়াই তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে অভাবগ্রস্ত করিয়াছ, যে সে অভাব পূরণ করিতে তাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তোমার পরিচয় পাইয়া ইহপরকালের সকল অভাব সকল ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমাকে লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। তবে হে পূর্ণমঙ্গলময়, আশীর্ব্বাদ কর যে, তোমার কন্যাগণ যেন তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তোমার বিধান পালন করিয়া সকল দুঃখ অভাব হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বারবার প্রণাম করি।

টাইটানিক—কাহিনী

বিগত ইংরাজী মে মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে যে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্যই এখনও জনসাধারণের চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। বিশাল "টাইটানিক" অর্ণবপোতের ভয়-ভাবনা শূন্য যাত্রিগণের মধ্যে প্রায় দেড় সহস্র যাত্রী কি প্রকারে ন্যূনাধিক দুই ঘটাকালের মধ্যে সাগরবক্ষে প্রাণ হারাইল, তাহা সে সময়ে সকলেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল মিষ্টার লরেন্স বীজ্‌লি নামক টাইটানিকের একজন যাত্রী ঐ দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পুস্তকাকারে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা পাঠে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

১০ই মে, বুধবার, টাইটানিক ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাত্রা করে; ইহাই তাহার প্রথম আটলাণ্টিক সাগর মন্থন এবং ইহাই তাহার শেষ হইল। আধুনিক সভ্য জগতের বিলাসকাননরূপে এই অর্ণবপোত খানি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এত বৃহৎ তরী আর প্রস্তুত হয় নাই এবং এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তুও পূর্ব্বে কোনও তরীতে একত্রিত করা হয় নাই। যাত্রিগণ টাইটানিককে আমোদভূমির ন্যায় মনে করিয়া নিশ্চিন্তমনে ও নিরুদ্বেগচিত্তে নানা নিরীহ আমোদে সময় যাপন করিতেছিলেন। এই ভাবে রবিবার সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নিরাপদে কাটিয়াছিল।

রবিবারে সন্ধ্যার সময়ে সম্মুখস্থ কয়েকটী জাহাজ হইতে তারহীন বার্ত্তায় জানিতে পারা যায় যে, টাইটানিকের সম্মুখে ভাসমান বরফ দেখা দিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া টাইটানিকের নায়ক কাপ্তেন স্মিথ সকল কর্ম্মচারীকে তুষারগিরি লক্ষ্য করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও বরফ দেখা যায় নাই, কিন্তু রাত্রি প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটের সময়ে হঠাৎ সম্মুখে একটি তুষারগিরি লক্ষিত হইল। লক্ষিত হইবামাত্র টেলিফোনে সেই সংবাদ কাপ্তেনকে জ্ঞাত করা হইল এবং সেই মুহূর্ত্তেই টাইটানিকের গতি একেবারে ফিরাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হইল না; বিশালাকার পোতখানির গতির বেগ রোধ করিতে না পারিয়া মহাবেগে বরফ পর্ব্বতের গাত্রে আসিয়া পড়িল এবং বৃহৎ তরীখানির তলদেশের একপার্শ্ব একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যদিও এই সংঘর্ষণ এত প্রচণ্ড হইয়াছিল, তথাপি আরোহিগণের মধ্যে কেহই ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই। মিঃ বীজ্‌লি বলেন যে, ঐ সময়ে তিনি তাঁহার শয্যায় পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, এমন কি কোনও শব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই।

যাহা হউক সংঘর্ষণ হইবামাত্র জাহাজের গতিরোধ করা হইল এবং সংবাদ লইয়া কাপ্তেন জানিতে পারিলেন যে, ঐ আঘাতে টাইটানিকের তলদেশ এমনভাবে চূর্ণ হইয়াছে যে, তাহার আর রক্ষা নাই।

তৎক্ষণাৎ তিনি লাইফবোট প্রস্তুত করিবার জন্য এবং চতুর্দ্দিকে তারহীনবার্ত্তায় টাইটানিকের বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন আরোহী কারণ জানিবার জন্য ডেকে উপস্থিত হইলেও সকলেরই মন উদ্বেগশূন্য ছিল এবং কেহ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করিলেই অন্য কয়েকজনে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিলেন। কারণ কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে, টাইটানিকের ন্যায় জাহাজের কোনও বিপদ ঘটিতে পারে। কিছু কাল ডেকের উপরে থাকিয়া আরোহিগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাহার কিছু পরেই কাপ্তেন স্মিথ সকল আরোহীকে লইয়া বেল্ট সহ ডেকের উপরে আসিতে আদেশ করিলেন।

এই আদেশ শ্রবণ করিয়াও কাহারও মুখে কোনও আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সকলে লাইফ বেল্ট লইয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কাহারও কোনও ব্যস্ততা ছিল না, কোনও চীৎকার বা কারণ জিজ্ঞাসা কিছুই লক্ষিত হয় নাই। সকলে যখন নীরবে ডেকের উপর সমবেত ভাবে দণ্ডায়মান, তখন নাবিকেরা লাইফবোটগুলি প্রস্তুত করিতেছিল। কিন্তু সমস্ত প্রকৃতি এরূপ শান্ত, সমস্ত আকাশ এমন নির্ম্মল এবং সুন্দর দেখাইতেছিল, নক্ষত্রগুলি এমন স্থিরভাবে জ্বলিতেছিল যে, সমূহ বিপদের কথা কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

ক্রমে লাইফবোটগুলি প্রস্তুত হইলে পর আজ্ঞা হইল যে, কেবল স্ত্রীলোক এবং শিশুগণকে প্রথমে লাইফবোটে লওয়া হইবে। এই সময়ের দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর, কিন্তু সে সময়ে কেহই সেরূপ কষ্টবোধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় নাই। কেহ কেহ তাঁহাদের স্বামিগণকে ছাড়িয়া যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বলপূর্ব্বক নৌকায় বসাইয়া দেওয়া হইল। এই ভাবে লাইফবোটগুলি একে একে পূর্ণ করা হইল। এপর্য্যন্তও কাহারও মনে তেমন ভীতির সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু হঠাৎ টাইটানিকের ডেক হইতে হাউই মহাশব্দে আকাশে উঠিয়া অন্ধকাররাশি আলোকিত করিয়া বহু উচ্চে সশব্দে বিপদবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে জ্ঞাপন করিল। তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, টাইটানিকের বিপদ সামান্য নহে। ক্রমে ক্রমে তিনটি হাউই আকাশে উঠিয়া যাত্রিগণের উদ্ধারের জন্য সাহায্যপ্রার্থনা করিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে, প্রকৃতির শান্ত নীরবতার মধ্যে এই আলোকশিখায় যাত্রিগণ কি বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাহা হউক ইতিমধ্যে লাইফবোটগুলি যাত্রিগণকে লইয়া একে একে সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে আরম্ভ করিল। বিপদের গুরুত্ব না বুঝিতে পারায় অনেকেই নৌকায় উঠিতে সম্মত হন নাই, সেই জন্য যেসকল নৌকা সর্ব্বপ্রথমে ভাসান হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই।

লাইফবোটগুলি একে একে টাইটানিক হইতে দূরে সরিতে আরম্ভ করিল,

কিন্তু নৌকারোহিগণ কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া নক্ষত্রতারকাচয় সমুদ্রস্থিত এই তরীর অসহায় অবস্থা মহাশূন্যের বক্ষে দূরতম তারকামণ্ডলে ঘোষণা করিবার জন্য যেন অধিকতর তেজে জ্বলিতেছিল; পবনদেব নিশ্চল, যেন নিশ্বাসরোধ করিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তিনি রত্নগর্ভার এই বিকটলীলা দেখিতেছিলেন; আর সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গমালা হিল্লোলশূন্য, যে হিল্লোল এত মৃদু যে বিশালকায়া তরীখানি তাহার স্পর্শ অনুভব পর্য্যন্ত করে নাই। এই সুন্দর অপরূপ দৃশ্যের মধ্যে আকাশগাত্রে টাইটানিকের বিরাটবপুর আকৃতি; তাহার পার্শ্বদেশ আলোকমালায় সজ্জিত, যেন তখনও তাহার অবয়ব কিছুমাত্র বিকল হয় নাই। কিন্তু সহজেই ইহা বুঝা যাইতেছিল যে, তাহার সম্মুখদেশ সাগরবক্ষে অন্তর্হিত হইতেছে। ক্রমে যতই টাইটানিকের সম্মুখদেশ ডুবিতেছিল ততই তাহার পশ্চাদ্ভাগ সাগরবক্ষ হইতে উঠিতেছিল।

কিন্তু এ অবস্থাসত্ত্বেও কর্ম্মচারিগণ স্থিরভাবে শেষ নৌকাখানিতে পর্য্যন্ত আরোহীদিগকে সাবধানে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। টাইটানিক অদৃশ্য হইবার অল্প পূর্ব্বেই শেষ নৌকাখানি ভাসান হয়। যাহা হউক ইতিমধ্যে তারহীনবার্ত্তা অবিশ্রান্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করা হইতেছিল, কিন্তু যদিও ছয় সাতটী জাহাজের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সে সকল গুলিই বহুদূরে থাকাতে তাহাদের সাহায্য লাভ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ৬০ মাইল দূরস্থিত "কার্পেথিয়া" জাহাজ সংবাদ পাওয়া মাত্র উদ্ধারকল্পে প্রাণপণ বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্য একটী জাহাজ টাইটানিকের এত নিকটে ছিল যে, তাহার আলোক দেখা গিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মনোযোগ কোনও মতেই আকর্ষণ করা যায় নাই।

শেষ নৌকাখানি যখন ভাসান হইয়া গেল তখন আর কিছুই করিবার রহিল না। কর্ম্মচারী এবং আরোহিগণ স্থিরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে রহিলেন। আটলান্টিকবক্ষে সে রাত্রিতে বীরোচিত কার্য্য অনেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাহাজের বাদকদিগের দল যে সাহস দেখাইয়াছিল, তাহা আর কেহ দেখায় নাই। রাত্রি একটার কিছু পূর্ব্বে বাদকগণ স্ব স্ব যন্ত্র লইয়া ডেকের উপর উপস্থিত হন এবং যেমন তিলে তিলে টাইটানিক উর্ম্মিমালার মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল, ঐ সঙ্গে যন্ত্রিগণও নির্ভীক ও অবিচলিতচিত্তে সঙ্গীতের সুরে সকলের প্রাণ উৎসাহিত এবং শীতল করিতেছিলেন। এই বীরজনোচিত কার্য্য সম্যক্ ধারণা করিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়। তখন প্রায় রাত্রি দুইটা। জাহাজের সম্মুখভাগ প্রায় সমস্তই নিমগ্ন হইয়াছে, অথচ সকলে নিস্তব্ধ, অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান, সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। যন্ত্রিগণ মৃত্যুমুখে পতিত আরোহিগণের প্রাণে সান্ত্বনা এবং আশার বাণী শুনাইতে তখনও নিযুক্ত। যাহাতে শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডেক তাড়িতালোকে আলোকিত হইতে পারে তাহার জন্য ইঞ্জিনীয়ারগণ তখনও যন্ত্রকক্ষে তড়িদ্‌যন্ত্রের নিকট স্থিরভাবে দণ্ডায়মান! এই ভাবে কিছুকাল থাকিবার পর টাইটানিক ধীরে ধীরে স্বীয় দেহ আলোড়িত করিয়া উর্দ্ধাধো ভাবে দণ্ডায়মান হইল এবং ঐ সঙ্গে জাহাজের বিদ্যুতালোক নির্ব্বাপিত হইল। নির্ব্বাপিত হইবামাত্র দশদিক পূর্ণ করিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হইল; মিঃ বিজলী বলেন যে, বোধ হয় জাহাজের যন্ত্রাদি সমস্ত স্থানচ্যুত হইয়া জাহাজের একটী অংশ লইয়া সশব্দে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইল। এই মহাশব্দ আকাশে মিলাইয়া যাইবার পর কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত জাহাজখানি এক বিশাল স্তম্ভের ন্যায় স্থির ছিল। কিন্তু কিছু পরেই এক পার্শ্বে সামান্য মাত্র নত হইয়া মানববুদ্ধির চরমসীমার নিদর্শন টাইটানিক চিরকালের জন্য সাগরগর্ভে অন্তর্হিত হইল। আটলান্টিক তাহার বিকটগ্রাসে টাইটানিককে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে সমুদ্রবক্ষের কোনও বিক্ষোভ হইল না, অতলস্পর্শী সমুদ্র পূর্ব্বেরই ন্যায় স্থির, শান্তবক্ষ হইয়া রহিল। কিন্তু সমুদ্রবক্ষ স্থির থাকিলেও এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বিদারক এক গগনভেদী হাহাকার শুনা গেল। শত শত যাত্রী সাগরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণরক্ষার নানা চেষ্টার মধ্যে গভীর ক্রন্দনে আকাশ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু মায়ামমতাশূন্য প্রকৃতিদেবী পূর্ব্বেরই ন্যায় স্থির, নির্ম্মম। এ ক্রন্দন দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া উঠিতে লাগিল এবং লাইফবোটস্থিত আরোহীদিগের শ্রবণগোচর হইল, কিন্তু উদ্ধার করিতে যাওয়া বৃথা জ্ঞানে কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে হাহাকারধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পরে একেবারে মিশাইয়া গেল, সমুদ্রের নির্ম্মমলীলা শেষ হইল।

আর অধিক কিছু বলিবার নাই। সমুদ্রবক্ষে বিক্ষিপ্ত যাত্রিগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। একটী অর্দ্ধনিমগ্ন নৌকার পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় ৩০জন যাত্রী প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত ঐভাবে যাপন করিয়া প্রাতে তাঁহারা একটী লাইফবোটে স্থান পান। লাইফবোটগুলিও সমস্ত রাত্রি দিক্‌শূন্য হইয়া বিচরণ করিয়া প্রাতে "কার্পেথিয়া" জাহাজ দেখিতে পায় এবং একে একে কার্পেথিয়ার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবে পুনর্জীবন লাভ করিয়া সকলে এই জাহাজে আশ্রয় লাভ করেন।

নববিধান কি ?

'নববিধান' শব্দের অর্থ ও মূলতত্ত্ব সকলের বিশেষতঃ 'নববিধান'-বিশ্বাসীর জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত ইহার অর্থ জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও মনে করেন না; কিন্তু তাঁহারা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া কত উন্নতি লাভ

করিতেছেন, সেই ধর্ম্ম কি এবং তাহার বিশেষত্ব কি তাহা কি বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয় নহে? সহজ ভাবে ইহা আমরা সকলেই জানি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম, এক ঈশ্বরই আমাদের পূজনীয় পিতা এবং সমগ্র মানব জাতি আমাদিগের ভ্রাতা ও ভগ্নী; কিন্তু এই উদার ধর্ম্ম কি পরিমাণে আমাদিগের নিকট উদার, তাহাই আলোচনার বিষয়। আমরা এক ঈশ্বর পূজা করিয়া যে টুকু আলোক পাইয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে শিখিয়াছি যে, মূলতঃ সকল মানবজাতির ধর্ম্মই এক, কেবল ধর্ম্ম বিশেষের বিশেষত্ব আছে মাত্র; সেই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে নববিধানের যাহা বিশেষত্ব আছে তাহা অতি নিগূঢ় বিষয় হইলেও আমরা আপাততঃ ইহাকে অতি সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আজ প্রায় ত্রিশবৎসর এই নূতন ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার গভীর অর্থ বুঝিবার অভাবে ইহার প্রসার উত্তম রূপে হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি, ইহা ক্রমশঃ সরল হইয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে যাহাতে সমগ্র হৃদয়ের সহিত আমরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি।

প্রথমতঃ আমরা বিধান শব্দ বুঝিবার চেষ্টা করিব; বিধানের স্থূল অর্থ ব্যবস্থা. কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবস্থার অর্থ কি? যুগে যুগে কত ধর্ম্মের বিধান কিংবা ব্যবস্থা এই ভারতবর্ষে হইয়াছে; ইহা কি তাহা হইলে ঋষিরা বা ভারতবাসীরা পরামর্শ ও সঙ্কল্প করিয়া বিধান করিয়াছে? এক এক দেশে এক এক মহাপুরুষের অভ্যুত্থান এবং এক ঈশ্বরের পূজা প্রচলন কি পরমেশ্বরের প্রেরণীয় হয় নাই? ইহাকে ঈশ্বরের বিধান না বলিয়া কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষের ফল কেমন করিয়া বলিব? আমরা আমাদিগের জীবনের ঘটনা সমূহ ও অবস্থায় পরিবর্ত্তনকে যদি বিধাতার বিধান বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্মের প্রকাশ হইতেছে তাহা আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিধাতার বিশেষ ধর্ম্মবিধান বলিয়া স্বীকার করিব না কেন? প্রেমময় পরমেশ্বর যে তাঁহার ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার ধর্ম্মবিধান ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া এবং তাহা দ্বারা জীবনের উন্নতি সাধন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? যদি না পারি, তবে ইহাকেই যেন ভগবানের বিশেষ বিধান বলিয়া গ্রহণ করি।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য যে, এই ধর্ম্মবিধানের নূতনত্ব কোথায় এবং এই বিধানকে "নব" বলিব কেন?

যখন যে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, সাধারণ ভাবে তাহাই নূতন. কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানের নূতনত্ব এই যে, ইহা সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এই উদার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিলে কোনও ধর্ম্মকেই মিথ্যা ও কোন সাধু মহাজনকে ভ্রান্ত বলিয়া অবহেলা করিতে পারি না।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম ও মহাজন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মবিশ্বাসী ও 'বিধান'-বিশ্বাসীর প্রণম্য।

প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে হইলে যেমন সকল ধর্ম্মকেই প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনি যিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত খৃষ্টান তাঁহাকেও সকল ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী ও আস্থাবান্ হইতে হইবে, নতুবা কোন ধর্ম্মবিশ্বাসীই নিজ ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে পারেন না।

সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশেষে সকলের ধর্ম্ম এক সূত্রে বাঁধিয়া রাখাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব এবং সকল পুরাতন ধর্ম্মবিধিকে নূতন দৃষ্টিতে নূতন করিয়া দেখিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম ও উচ্চতম নাম "নববিধান"।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বাঙ্গালী মেয়ের খাওয়া পরা।

পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের খাওয়া পরা যেমন সোজাসুজি এবং অল্পব্যয়সাধ্য ছিল, অন্য কোন দেশীয় মেয়েদের খাওয়া পরা এরূপ নহে। এরূপ খাওয়া পরার দোষ গুণ আমরা এখন বিচার করিতেছি না। কেবল ইহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীনতা এবং খরচের ন্যূনতাই গণনা করি। সামান্য একখানা বস্ত্র পরিয়া এবং সকলের খাওয়ার পরে সামান্য উপকরণে বা বিনা উপকরণে কয়েক গ্রাস অন্ন উদরসাৎ করিয়া আনন্দে প্রফুল্লচিত্তে প্রায় দিবানিশি নানারূপ খাটুনী খাটিতে পারে, অর্থে, বিত্তে, গৃহসম্পদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্বে অধিকার নাই, এমন নারী বঙ্গদেশ ছাড়া কোথাও জন্মে কি? বাঙ্গালা দেশে মহিলাস্থলে নব্য শিক্ষা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব আসিয়া পূর্ব্বাবস্থা দূরীকরণে রত হইয়াছে। তথাপি অদ্যাপি অসংখ্য বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। অল্প অশন বসনে সন্তুষ্ট থাকা সকল মনুষ্যের পক্ষেই কর্ত্তব্য। অশন বসনে বাসনা বলবতী করিলেই ক্রমে ভোগবিলাসের পাপে মনুষ্যকে জর্জ্জরিত হইতে হয়। ভোগের লালসা যাহারা যৌবনাবধি বর্দ্ধিত করে, তাহারা আজীবন তাহাতে দগ্ধ হইয়াও নিবৃত্তি বোধ করে না।

লজ্জা ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্রের ব্যবহার। শারীরিক অভাব মোচনার্থ ক্ষুধা তৃষ্ণা; ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীকরণার্থ অন্ন পান। বস্ত্রদ্বারা যেন লজ্জা ও শীত নিবারিত হয়, ইহা দেখিতে হইবে। অন্নপানে যেন শরীর পরিপোষণোপযোগী উপকরণ লাভ করে, ইহাও দেখা চাই।

বঙ্গীয় রমণীসমাজ যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া এতকাল যাপন করিয়াছেন, ইহা লজ্জা এবং শীত নিবারণের নিতান্তই অনুপযোগী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতের অপর প্রদেশগুলিতে নারী জাতির বস্ত্র ব্যবহার বাঙ্গালা দেশের নারীর বস্ত্র ব্যবহার অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। সে সকল প্রদেশে বস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় নারীগণের পুরাতন প্রণালীর বস্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্যই সফল হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক

যাঁহারা দেশীয় রীতি নীতির দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই স্ব স্ব পুরমহিলাদের বেশ পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অধুনা হিন্দুসমাজেও কামিনীগণের অনেকে নব প্রণালীতে বস্ত্রাদি ব্যবহারে রত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের ধনী, দরিদ্র, নাগরিক এবং গ্রামবাসী সকল মহিলার পক্ষেই নূতন রীতিতে বস্ত্র ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু পরিবর্ত্তিত বেশের সহিত যেন বঙ্গীয় নারীকুলে বিলাসের বিষ প্রবিষ্ট না হয়। বঙ্গীয় গৃহিণী এবং রমণীগণ কি জানেন না যে, বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি অপেক্ষা দরিদ্র? বাঙ্গালী জাতিতে স্বচ্ছল অবস্থার লোকের সংখ্যা অতি কম। ঋণ না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, এরূপ লোকও খুব কম। এ অবস্থায় দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা আহার পরিচ্ছদের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার উপরে যদি সমাজমধ্যে নারীগণ নিত্য নূতন ফ্যাসানের বেশধারণে অতি ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তবে সে জন্য কত প্রকারের ক্লেশ পরিবার ও অভিভাবকদিগের হইতে পারে, তাহার চিন্তা কি মহিলাগণ করিবেন না?

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে নব্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, নবধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং নবভাবের পরিবর্ত্তনস্রোতে পতিত হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা হিন্দুসমাজ মধ্যে বাস করিয়া নূতন শিক্ষা, রীতি ও ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সকল বিষয়ে প্রণিধান হয়, আমরা ইহা প্রার্থনীয় বোধ করি। এ দেশের লোকদিগকে সভ্য ভব্য করিতে হইলে নারীজাতির বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন। নারীজাতি সভ্য, ভব্য ও শিক্ষালোকে আলোকিত এবং কুসংস্কারবিবর্জ্জিত না হইলে পুরুষ কখনই অন্যান্য সভ্যজাতি সকলের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।

স্বদেশে সন্তুষ্টি মানুষের মহদ্‌গুণ. শুদ্ধি এবং শান্তিলাভের জন্য ইহা গভীররূপে দরকার। প্রাচীন ঋষিগণ সামান্য ফল মূল আহার এবং সামান্য বল্কলে গাত্রাচ্ছাদন ও পর্ণকুটীরে পরমানন্দে বাস করিয়া কত গভীর তত্ত্ব সমালোচনায় ও তৎপ্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন, ঋষিপত্নী ও কন্যাগণ তাঁহাদের সহায় ছিলেন, সে কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্যসমাজে মুক্তভাবে চলা ফিরার জন্য রমণীগণকে পুরাতন প্রণালীর বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইতেছে। কিন্তু বেশবিলাসের বায়ুগ্রস্ত হইয়া যেন সে জন্য কেহ নিজের বা অন্যের সমূহ ক্লেশের হেতু না হন।

শরীরের শক্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য আহার। যেরূপ আহারে কোনরূপ রোগ না জন্মিতে পারে, তাহাই সকলের পক্ষে গ্রহণীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বালিকা ও যুবতী স্কুলবোর্ডিংএ থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাদের নানা কারণে আহার খুব কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী রমণীগণ স্বভাবতঃ অল্পাহারী। শিক্ষাপ্রাপ্তাদিগের বেশের আড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি যাইতেছে, কিন্তু আহার খুবই কমিয়া

যাইতেছে। বোর্ডিংগুলিতে আহার্য্য ব্যঞ্জনাদির পাকপ্রণালীও বোধ হয় অনেক মেয়েরেই রুচিকর হয় না। সুতরাং রুচিকর আহার্য্য না পাইলে আহার কমিয়া যাইবারই কথা। তদুপরি অনেক মেয়ে চা পানে খুবই অনুরক্তা; চা পান বিষয়ে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেন। আমরা শারীরতত্ত্ববিৎ ও বস্তুতত্ত্ববিৎ নহি, সুতরাং চা পানের ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের আলোচনার অধিকারী নহি; কিন্তু চা পানে কিছুটা অন্নগ্রহণে যে অরুচি জন্মায় অর্থাৎ চায়ের স্বাভাবিক ক্ষুধা দূর করিবার যে শক্তি আছে, ইহা আমরাও স্বীকার করিতে বাধ্য। কেন না যাহারা অধিক পরিমাণে চা পান করে, তাহারা প্রায়শঃ অতি অল্পাহারী হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে এদেশে নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে নানারূপ কুসংস্কার ছিল। এখন দেশ হইতে সেরূপ কুসংস্কার দূর হইয়াছে, কিন্তু নারীজাতির শিক্ষার প্রণালী অদ্যাপি ঠিক হইয়া উঠে নাই। এ বিষয়ে শিক্ষিত নরনারীগণের বিশেষ চিন্তাও পরিলক্ষিত হয় না। যে প্রণালীতে শিক্ষা হইতেছে, ইহা নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণপ্রদ বলা যায় না। ইহা নারীজাতির শরীরক্ষয়েরও নূতন সূত্র হইয়াছে। নারীহিতৈষিগণের এ বিষয়ে মনোযোগ যাইতেছে কি?

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশীয় মেয়েরা মানসিক পরিশ্রম কিছুই করিত না। বাল্যাবধি নানারূপ শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত থাকিত। তদ্দ্বারা তাহাদের যথেষ্ট ক্ষুধাবৃদ্ধি হইত। চায়ের ন্যায় পদার্থের এদেশে সর্ব্বত্র অপ্রচলন ছিল। কাজেই সেকেলে বাঙ্গালী মেয়েদের যৎসামান্য অল্পাহারেও বেশ কর্ম্মক্ষমতা এবং শারীরিক শক্তি রক্ষা হইত। অধুনা শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা মেয়েদের পক্ষে মানসিক শ্রম যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের শারীরিক শ্রম কিছুই নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? তাহার পর বোর্ডিংএ অরুচিকর আহার্য্য অনেকের গলাধঃকরণে ক্লেশবোধ হয়। তৎপরে ক্ষুধা ও রুচি অনেক মেয়ে চা পান দ্বারা নষ্ট করে। কাজেই বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে অল্পাহারের অল্পাহার হইয়া উঠিতেছে। যদি ধনশালিনী যুবতীগণের কোন প্রকারে আহারে বিলাস থাকে, তাহা ময়রা দোকানের মিঠাই! সেগুলি শরীরের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর। সুতরাং বলিতে হইতেছে যদিও নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গীয় নব্য রমণীকুলে জ্ঞান, সুনীতি ও সুরীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তথাপি শারীরিক শ্রমাভাবে এবং আহারের অতিরিক্ত মাত্রায় অল্পতায় শিক্ষিতাদিগের শরীর কর্ম্মের অতি অযোগ্য এবং রোগনিবাস হইয়া পড়িতেছে।

বোর্ডিংএর অনেক মেয়ে (আমরা এরূপ শ্রুত আছি) নাকি আহার কমান একটা গৌরবের বিষয় মনে করে। চেষ্টা করিয়া ক্রমে তাহারা খাওয়া কমাইয়া ফেলে। বোর্ডিংএর অধ্যক্ষ রমণীগণের এবং সমস্ত মেয়েদেরই ইহা সন্ধান করা আবশ্যক। দেহ রক্ষা না হইলে জ্ঞান দ্বারা সংসারে কে কি কাজ করিতে সুক্ষম

হয়? কার্য্যের জন্য জ্ঞান। জ্ঞানলাভে অবহিত হইয়া শরীরকে অনাহারে বা অল্পাহারে নষ্ট করিলে নিজের বা পরিবারের কিংবা দেশের কি লাভ? নারীগণ শিক্ষিতা হইয়া যদি ক্ষীণ ও রুগ্নদেহ হন, তবে দেশের গৃহিণী, মাতা ও ভগিনীগণ যে অকর্ম্মণ্য রুগ্ন হইয়া পড়িবেন।

যাঁহারা এদেশে মহিলাকুলের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত, অথবা নগরে নগরে যাঁহারা মহিলাবোর্ডিংএর কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালিকা, আমরা তাঁহাদের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, মেয়েদের শরীর রোগমুক্ত কি রোগাগার হইতেছে, তাঁহারা যদি ইহা সন্ধান না করেন, তবে তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-যত্ন একপ্রকার পণ্ড হইতেছে। অনেক গৃহে অনেক মা কিন্তু মাঝে মাঝে এ অভিযোগ উত্থাপন করিতেছেন যে, মেয়েগুলি পড়ে পড়ে রোগা হইতেছে। বোধ হয় শিক্ষাকার্য্যের কোন অধ্যক্ষের কর্ণে এরূপ অভিযোগ প্রবেশ করিতেছে না। অনেক শিক্ষিতা মেয়ে সাজে গোজে খুব জমকাল দেখায়; কিন্তু তাহাদের দেহের সাজগোজ খুলিলে দেহখানা কঙ্কালসদৃশ দেখায়। আবার অনেকে দেখিতে খুব মোটাসোটা, অথচ নিজে সর্ব্বদা অতি দুর্ব্বল বোধ করে, সুতরাং সে মোটাসোটার কোন মূল্য নাই। অনেক মেয়ে পড়িতে পড়িতেই আপনার শরীর নানারূপ রোগে কাতর বোধ করে, অথচ সে সকল অঙ্গে ভালরূপ টেরও পাইতে পারে না।

শিক্ষাদ্বারা শরীর এবং মন উভয়ই যাহাতে সুস্থ, সমর্থ এবং জ্ঞানমণ্ডিত হইয়া উঠে, তাহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভেই সমবায়ভাবে শিক্ষার ফল মেয়েদের জীবনে ফলিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান সময়ের যুবতী শিক্ষার্থিনী এবং শিক্ষিতাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাই শিক্ষিত এবং শিক্ষিতাদিগের গোচরীভূত করিলাম।

ইউরোপীয় নারীগণের সমরপন্থী ভাব।

বিলেত কেন, জগতের প্রায় সকল সভ্য দেশেই আজ কাল রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর স্ত্রীলোকদিগের একটা গভীর উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছে। এই উত্তেজনার মানে কি? কিসের জন্য নিজের নিজের ঘরের সুখ স্বচ্ছন্দতায় বিতৃষ্ণ হ'য়ে শত শত স্ত্রীলোক নিজেদের জীবন এই জ্বলন্ত অগ্নিতে উৎসর্গ ক'রতে একেবারে দৃঢ়সংকল্প হ'তেছেন? এই যে এক মহা হোমের অনল সমস্ত ইউরোপ ব্যাপিয়া জ্বলে উঠেছে, আর তাতে আহুতি দেবার জন্য প্রত্যহ এতগুলি জীবনের অশান্ত অধ্যবসায় প্রকাশ পাচ্ছে, এর ভিতর কি কোন মানে নেই? আমরা কাগজে প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, কতগুলি মেয়ে দোকানের জানলা দরজা ভেঙ্গে

জেলে গেলেন ; ইংলণ্ডের নানা স্থানে এই প্রকারের নানা অশান্তির কথা প্রায়ই খবরের কাগজে প্রকাশ পাচ্চে। আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল স্ত্রীলোকের এই উগ্র ভাবের অনুমোদন ক'রতে পারচেন না ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব-সুলভ কোমলতা ও পুরুষজাতির উপর তাঁহাদের অবিচলিত ভক্তির কথা যখন ভাবেন, তখন বিলেতের মেয়েরা যে "পাগল" হ'য়ে গেছে, এই কথাই সাব্যস্ত ক'রে নেন ; আবার আর এক দিকে সূক্ষ্ম বিচারের পক্ষপাতী অনেক লোক আছেন, যাঁরা হঠাৎ এই সকল মেয়েদের "পাগল" ব'লে উপহাস না ক'রে, বাস্তবিকই এই গভীর আন্দোলনের ভিতর এই "সামরিক ভাবের" স্থান কোথায়, তাই অন্বেষণ ক'রতে ইচ্ছুক।

ইউরোপ ও আমেরিকার মত সভ্য-জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে এই যে একটা "মরিয়া" ভাব এসেছে, এটাকে কি আমরা পাগলামি বা হিষ্টিরিয়া ব'লে উপহাস ক'রে ক্ষান্ত হবো ? এটা কি তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্যতার প্রমাণ, না পুরুষজাতি নিজেরাই অন্ধতাবশতঃ স্ত্রীজাতির এই নূতন ভাবের প্রতি সম্যক্ সহানুভূতি প্রকাশ ক'রতে অক্ষম ? আমার তো মনে হয়, ওদেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে এই গভীর আন্দোলনের নিগূঢ় অর্থ অনেকের কাছেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় নি। আজ যে কার্য্যটাকে সকলে পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, সেটা হ'তে পারে এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের দিকে তাকিয়ে প্রথমতঃ "পাগলামি" ছাড়া আর কিছু মনে হয় না ; কিন্তু জগতের ইতিহাসের অন্যান্য সংস্কারের প্রথম অবস্থার কথা ভেবে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, এখানেও জনসমাজের অধিকাংশ লোকই এই আন্দোলনের নিগূঢ় অর্থ বুঝ্‌তে অসমর্থ হ'য়েছেন।

সভ্যজগতে মানবসমাজে আজ কত শতাব্দী হ'তে দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে, সময়ে সময়ে এক একটা নতুন ভাব এসে নতুন যুগের অবতারণা করে দিয়েছে ; সে ভাবটা হ'তে পারে, প্রথম প্রথম নানা-প্রকার জটিলতার ভিতর দিয়ে আসে ; ভাবের প্রকাশও এমন কি প্রথম অবস্থায় সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করা অসম্ভব হ'য়ে উঠে ; কিন্তু সেই সব ক্ষণিক অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়েও মহাকল্যাণকর এই ভাব-গুলি জনসমাজের ভিতর আপনাদের মহান সত্যের পরিচয় দিয়ে আস্তে আস্তে নব নব যুগপরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। তাই বলি, এ আন্দোলনের মধ্যে আপাততঃ অনেক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও ইহা নব যুগের একটি নব ভাব।

এই যে শত শত স্ত্রীলোক নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতার উপর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আপনাদের জীবন এই নতুন ভাবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ক'রচেন, জগতের ইতিহাসে এটা কি একটা সামান্য কথা ? প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এটা একটা ভাববার বিষয়। সে দিন যে ইতালী স্বাধীন হ'লো, তা কি কেবল ঐ গোলা-

গুলির সাহায্যে? না, কখনই না! সুপ্ত আত্মা জেগে উঠেছিল; তাই নিজেদের নানারকমের ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও সমস্ত ইউ-রোপের ভ্রূকুটিতে দৃক্‌পাত না ক'রে, সকল বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন ক'রে পরিশেষে জয়যুক্ত হ'তে সমর্থ হ'য়েছিলো। কেউ কেউ হয়তো ব'লবেন, "তারা তো পুরুষ ছিল।" "দেশের সেবায় তাঁরা আহূত হ'য়েছিলেন।" বাস্তবিকই তাদের চোখের সম্মুখে ইতালী এক "নতুন দেশ' হ'য়ে উপস্থিত হ'য়ে-ছিলো, যার জন্য দেশভক্তদিগের হৃদয় সর্ব্বদা অক্লান্ত ভাবে দেশের সেবার জন্য নিয়োজিত হতে পেরেছিল। সেই রকম স্ত্রীজাতির এই নতুন ভাব, দেশভক্ত-দিগের সেই "নতুন দেশের" ছবির ন্যায় কি জনসমাজে আজ আদৃত হবে না? আজ স্ত্রীজাতির ভিতর যে সেই সুপ্ত আত্মা জেগে উঠেছে, তাকি অস্বীকার করা যায়? এখন স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ নিয়ে বিচার করলে চলবে না, কারণ জগতের ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে. যখন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নরনারী তাঁদের নিজেদের বাহ্য পার্থক্যের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে সকল আত্মার সঙ্গে এক হয়ে জগতের কল্যাণার্থে অগ্রসর হতে চান।

আজ এই যে স্ত্রীলোকেরা "সামরিক পন্থার" সাহায্য নিয়েছেন, হতে পারে ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটি ও ভ্রম আছে, কিন্তু এর ভিতর যে একটা আধ্যাত্মিক বিদ্রোহের ভাব বিরাজ করচে, তা বোধ হয় অনেকেই বুঝিতে পারচেন না। জগ-তের সমস্ত স্ত্রীজাতির ভিতর আজ একটা নতুন জাগরণ এসেছে, এ উদ্দীপনার বিরাম নেই, প্রত্যহই নতুন নতুন স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনসমাজে ইহা এক মহাপ্রলয়ের অবতারণা করচে।

যদি আজ সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করি, তা হলে স্ত্রীজাতির এই নূতন সামরিক ভাবের ভিতর "জ্ঞান" "শক্তি" ও "মানবপ্রেমের." বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখ্‌তে পাই। পুরাকালে মধ্যবিৎ ও উচ্চ শ্রেণীর অনেক স্ত্রীলোকেরাই সমাজের অনেক ক্ষত ও গলিত স্থান একেবারেই দেখ্‌তে পেতেন না; কিন্তু এখন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে সব স্থান আর লুক্কায়িত নাই। আজ যে অগ্নিতে স্ত্রীলোকেরা উত্তেজিত, অজ্ঞতা-বশতঃ সে অগ্নির উত্তাপ পুরাকালের স্ত্রী-লোকদের ভিতর একেবারে প্রবেশ করে নাই। আজ জ্ঞানের সাহায্যে যাঁরা সকল অবস্থা জান্‌তে পারচেন, যাঁরা নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর নিজেদের আবদ্ধ রাখ্‌তে চান না, জগতের কল্যাণের জন্য যাঁদের হৃদয় আজ ব্যথিত, তাঁদের আজ জড়ের ন্যায় বসে থাকা অসম্ভব। দেশের শত শত অপরিণতবয়স্কা বালিকারা যখন সমস্ত পৃথিবীর অসদাচার এই পুরুষদিগের পাপ বাসনার অগ্নিতে স্বরূপ উৎসর্গীকৃত হচ্ছেন (White Slave Traffic), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদের সর্ব্বনাশের কথা যখন মনে হয়, এবং তদুপরি যখন আইনের অসম্পূর্ণতা ও এই সকল ভয়াবহ ব্যাপারের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া ও দেশের মধ্যে গভীর জড়তার ভাব প্রতীয়মান হয়, তখন কোন

স্ত্রীলোক দেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে চুপকরে বসে থাকতে পারেন? এরকম অবস্থায় এটা কি একটা আশ্চর্য্যের কথা হবে, যদি কোন স্ত্রীলোক বলেন, যে দেশের আইন কানুন বদলাবার জন্য আমি ভগবানের দ্বারা আহূত হয়েছি? স্ত্রী-জাতির সতীত্বে ও মাতৃত্বে কি কলঙ্ক পড়বে না, যদি কোন স্ত্রীলোক এই সকল ঘোর অবিচার দেখেও গভীর স্বার্থপরের ন্যায় নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন? আত্মসম্মান ও সৎ-সাহস যেমন পুরুষের ভূষণস্বরূপ, তেমনি দয়া, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক নারী জীবনের মুখ্য ধর্ম্মও সাধনার বস্তু। অনেকে এই সকল রাজনৈতিক অধি-কারিণী স্ত্রীলোক দিগকে (সাফ্রাজেট্) "পুরুষধর্ম্মী" (unwomanly) বলে অবজ্ঞা করে থাকেন, কিন্তু আমার তো মনে হয়, যাঁরা এইসকল দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা শুনেও চুপ করে বসে আছেন, কিম্বা যাঁরা কোন কাজ করা দূরে থাকুক, বরং যে সকল নারী এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের উপর বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করেন, তাঁরাই ঐ নামের প্রকৃত অর্থের সার্থকতার পরিচয় দিতে-ছেন।

সাফ্রাজেট্দের জানলা দরজা ভাঙ্গাটা অনেকেই "পাগলামি" ব'লে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এই "পাগলামির" প্রকৃত অর্থ কি এবং ইহার সূত্রপাত কোথায়, তা বোধ হয় অনেকে খোঁজ রাখেন না। এই যে একটা নবজাগরণ স্ত্রীলোকদের ভিতরে এসেছে, এই জাগ-রণই বিভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীজাতির ভিতর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য নব নব পন্থার সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এই জন্য প্রত্যেক দেশেই স্ত্রী পুরুষের ভিতর একটা সংগ্রা-মের ভাব লক্ষিত হয়েছে। এমন কি অনেক স্থানে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনের ভিতর একটা দূরত্বের ভাব এসেছে। "জানলা দরজা ভাঙ্গার" চেয়েও এটা আরও গুরুতর, এতে সন্দেহ নাই। অনেকে বলছেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগকে কোন স্থান না দেওয়াতেই এই পারিবারিক অশান্তি এসে পড়চে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, কতকগুলি স্ত্রীলোক এই সকল ঘোর অবিচারে মর্ম্মাহত হয়ে এবং তদুপরি পুরুষদের কোন সহানুভূতি না পেয়ে নিজেদের একেবারে নিরুপায় মনে করচেন। এই নিরুপায় ভাবই অনেকের ভিতর এই "পাগলামির ছিট্" এনে দিয়েছে। সকলেই যে জানলা ভাঙ্গতে দৌড়চ্ছেন এমন নহে, কেউ কেউ এমন সকল পন্থা অবলম্বন করচেন, যা আরও ভয়ানক ও তীব্র। অনেকে বলচেন, যে যতদিন না এই সকল অন্যায় অবিচারের একটা মীমাংসা হবে ততদিন পুরুষের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। এমন কি অনেক বিবাহিত ও অবিবাহিত স্ত্রীলোক আজ এই ভাবানুযায়ী কাজ ক'রতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন। এই সব কথা শুনে অনেকের মনে হ'তে পারে যে, তবে কি স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ক্রমে ক্রমে

"মাতৃত্বে অবজ্ঞা" এসে প'ড়চে? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই সমাজ বেশ বুঝতে পারবেন যে,"অবজ্ঞার"পরিবর্ত্তে বরং আরও গম্ভীরতর মাতৃত্বের ভাব নতন জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির ভিতর এসে কার্য্য ক'রছে। নারীর এই নতন আত্মা পুরুষের নূতন আত্মার সঙ্গে মিল্‌তে ব্যস্ত; জগতে যেখানে নির্দ্দয়তা ও নির্ম্মমতার প্রকাশ পাচ্ছে, সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে এক হয়ে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রবে, এই নব দীক্ষাগ্নিনীর বাসনা। কিন্তু যতদিন না পুরুষ সে ইচ্ছায় সায় দিতে পার্‌চেন, ততদিন এই জাগ্রত আত্মা পুরুষের সঙ্গে মিল্‌তে অসমর্থ।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী-জাতির ভিতর সামরিক ভাব প্রকাশের এই ভাবার্থ। "জানলা ভাঙ্গা" বিশাল সমুদ্রের মধ্যে একটি তরঙ্গ মাত্র; এ একটি তরঙ্গ একদিন থেমে যেতে পারে, কিন্তু বিশাল সমুদ্রের গর্জ্জন থামবার নয়।

সকল যুক্তি ও তর্কের প্রথম অবস্থায়ই আমরা মেনে নিতে চাই যে, বিবাহ জিনিষটা যেমন স্ত্রী-পুরুষের ভিতর একটা অকাট্য বন্ধন, পুরুষজাতিই যেমন এই জড়জগতে সকলের পথপ্রদর্শক, তেমনি স্ত্রীজাতির সকল অবস্থাতেই অতি ধীর ও নম্র থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিকই এ কথায় যে মাহান্ সত্য নিহিত আছে, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সব কথাতো আদর্শ সমাজের পক্ষে খাটে। যখন দেখ্‌ছি বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষা শারীরিক বলই অধিকতর প্রবল, সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অন্যায় ও অবিচার থাকা সত্ত্বেও প্রতীকারের উপায় কম,তখন কি করে বলা যায় যে, মনুষ্যসমাজে বিবাহ মাত্রই অতি পবিত্র ও স্বর্গীয় বন্ধন। যে আদর্শ সমাজের কথা বলা হ'লো, তা তো ভবিষ্যতের; এমন দিন আস্‌বে হয়তো যে দিন আজকের এই সমরপন্থী স্ত্রীজাতিই অতি নম্র ও ধীর ব'লে সমাজের কাছে আদৃত হবেন। তখন নূতন যুগের প্রবর্ত্তনকারী এই সামরিক ভাব জগতের কাছে একটা নূতন শক্তি ব'লে আখ্যাত হবে। "আজকাল স্ত্রীলোকেরা ঠিক উচিতমত কাজ ক'রচেন কি না, প্রত্যেক কাজে তাঁদের জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হ'য়েছে কি না," ভবিষ্যৎ বংশ এ কথার কখনও অনুসন্ধান করবে না। "নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এরা জেগে উঠেছিলো কি না, উদার প্রেমের বিকাশের জন্য এদের প্রাণ কেঁদে উঠে নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিলো কি না' এই কেবল তখন ভাবী বংশ জান্‌তে ব্যস্ত হবে। আজকাল এই 'সমরপন্থী' স্ত্রীলোক যে পথই ধরে চলুন না কেন, যতই ভুল ভ্রান্তি তাঁদের জীবনে হউক না কেন, নূতন ও উদার প্রেমের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জগতে প্রসারিত করবার জন্য এঁদের জীবন যে উৎসর্গিত হ'য়েছিলো এই মনে ক'রেই ভবিষ্যৎবংশ সর্ব্বদা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকবে। সে দিন এঁদের জীবনের দুঃখ ক্লেশের ভার অনেকটা অপনোদিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই; আজ জগতের

সম্মুখে যেটা "কাঁটার মুকুট" ব'লে ঘৃণিত হ'চ্চে, হয়ত একদিন সেই মুকুটই "পুণ্যের মুকুট" ব'লে জনসমাজে গৌরবান্বিত হবে।

স্ত্রীলোকদিগের জাতীয় বিষয়ে মতপ্রকাশের অধিকারসম্বন্ধে বিপক্ষদলের মত।

[প্রশ্নের উত্তর।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে, যখন তাঁহারা বলেন যে গৃহই স্ত্রীলোকের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, তখন তাঁহারা আমাদের যুক্তি একেবারে খণ্ডন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু আমরাও যে তাঁহাদের মতের সঙ্গে সায় দি ও আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করি। নিশ্চয়ই, গৃহই আমাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র এবং সেই জন্যই পরিবার এবং শিশুদিগের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম করা হয় তাহাতে আমাদের মতামত লওয়া নিশ্চয়ই দরকার। যেমন দিন যাইতেছে আমরা দেখিতেছি যে, ন্যায়তঃই হউক কিম্বা অন্যায় রূপেই হউক, পারিবারিক বিষয় সকল এখন জাতীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের অবস্থা যখন এই, তখন মাতা কিম্বা কন্যাকে জাতীয় সভায় মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কি সঙ্গত?

আমরা ভোট দিবার অধিকারপ্রার্থিনী বলিয়া সাধারণের সম্মুখে আমাদের তিরস্কার করা হয় এবং আমরা পারিবারিক কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছি বলিয়া নিন্দা করা হয়। বিরুদ্ধ পক্ষের মহিলা যখন নিজের গৃহের ও পরিবারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া সাধারণের সম্মুখে গৃহই "স্ত্রীলোকের কর্ম্ম ক্ষেত্র" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য মঞ্চে দাঁড়ান, তখন তাঁহাদের মতের বিষয় স্মরণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

লর্ড কার্জ্জন, যিনি বিরুদ্ধবাদীদিগের নেতা, তিনি বলেন স্ত্রীলোকদের মহান্ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার শক্তি নাই, সুতরাং তাঁহারা ভোট পাইবার উপযুক্ত নন। এই উক্তির উপর আমার আর টীকা দিতে ইচ্ছা করে না, তবে এইটুকু বলি যে, মাননীয় লর্ড কার্জ্জন মহোদয় যখন বলিলেন যে, স্ত্রীলোকদের শাসন কার্য্যের শক্তি নাই, তখন তিনি প্রকৃতই সত্য কথা বলিলেন। তিনি মেয়েদের রাজকীয় বিষয় ভোট দিবার অধিকার দিতে ভয় পান; কেননা তিনি জানেন যে, তাহা হইলে রাজ্যশাসনে প্রেম, সত্য ও ন্যায় ভিন্ন কোনও অন্যায়ের উপর স্ত্রীলোকেরা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন না।

"Times" সংবাদ পত্র ভোট দিবার অধিকার সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, অধিকার পাইলেই স্ত্রীলোকরা "সমান পরিশ্রমের জন্য সমান পারিশ্রমিক চাহিবেন", আর ইহাতে যাঁহাদের কারবারে স্ত্রী শ্রমজীবী নিযুক্ত হয়, তাঁহাদের কারবার চালান শক্ত হইয়া উঠিবে; কেননা এখন স্ত্রীলোক শ্রমজীবী অনেক কম পারিশ্রমিকেই পাওয়া যায়। কিন্তু "Times" এর সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাধা-

রূপ সভাতে একজন বিখ্যাত রাজমন্ত্রী বলিতেছেন যে, ভোটের অধিকার দিবার সঙ্গে স্ত্রীলোকদের পারিশ্রমিক বাড়াইবার প্রশ্নের কোনও সম্পর্ক নাই।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে, স্ত্রীলোকদের ভোট দিবার অধিকারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। একই পক্ষের লোকেরা নিজেদের মধ্যেই বৃথা মারামারি কাটাকাটি করিতেছেন, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিরাশভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, "ইহাদের এইরূপ ব্যবহারের কি কোন কারণ আছে"? আমাদের মনে হয়, বিপক্ষবাদের প্রধান কারণ কুসংস্কার এবং অন্য কারণ বোধ হয় এই যে, স্ত্রীলোকরা নীতির যে উচ্চ আদর্শ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পুরুষেরা সেই আদর্শকে ভয় পান।

"নারীগণ মতামত প্রকাশের অধিকার পাইলে দেশের মঙ্গল হইবে" এই আশাকে যাঁহারা বৃথা কল্পনা মনে করেন ও সন্দেহ করেন, তাঁহাদের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার শাসনসভার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব।

এই শাসনসভার মত এই যে, "অষ্ট্রেলিয়ার মহিলাদিগকে রাজকীয় ও প্রজাতন্ত্র মহাসভায় পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়াতে দেশের খুব উপকার হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহাদের যোগ দেওয়াতে সভ্যনির্ব্বাচনকার্য্য বেশ শান্তভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় এবং রাজসভার সভ্যেরা নারীদিগের ভোট অধিকসংখ্যক প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ নারীরা উপস্থিত গুরুতর প্রশ্নগুলিকে অবহেলা না করিয়াও স্ত্রীলোক ও বালকদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন ব্যবস্থাপন করিতে সবিশেষ রূপে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ দেশরক্ষা ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহারা পুরুষদের মতই দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্ম বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যদিও এই অধিকার দিবার সময়, ইহার ফলে ভয়ানক বিপত্তি হইবে বলা হইয়াছিল, তথাপি আমরা এই সংস্কারে উপকার ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। যে সমস্ত জাতি প্রতিনিধিঘটিত শাসন সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার দিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করুন"।

এই সপ্তাহের সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে আরও চারিটি রাজ্যে নারীদিগকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ এখন দশটী রাজ্য এই অধিকার সম্ভোগ করিতেছেন। শেষের এই চারিটি রাজ্য এই অধিকার দিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই পূর্ব্বের ছয়টী রাজ্যের সামাজিক জীবনের উন্নতি দেখিয়াই তবে এই সংস্কার নিজেরা করিয়াছেন। তাঁহাদের যোগ দেওয়াতে অধিকার প্রার্থিনীদের মত যে প্রকৃত সত্য এবং কাল্পনিক নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

মেবেল ওয়াল্টার।

বেহারে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা।*

আজ আমাদের পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের দিন; কেন না ভারতের নানাদেশের কত শিক্ষিতা মহিলাগণ বেহারে পদার্পণ করিয়া বেহার ভূমিকে পবিত্র করিতেছেন। যে আকর্ষণ তাঁহাদের এখানে টানিয়া আনিয়াছে তাহার মূলে শিক্ষা নাই? ভারতের উন্নতিকল্পে যাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা জাগিয়াছে, তাহার কারণ শিক্ষা। যে নূতন বাতাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহিয়া যাইতেছে—চীনের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যকেও অল্পদিনের মধ্যেই সুসভ্য সমাজে পরিচিত করিয়া দিতে চলিয়াছে—যে সুবাতাস ভারতের অন্যান্য দেশে মৃদু মধুর গন্ধের সহিত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ঢেউ বেহারেও লাগিয়াছে; কিন্তু কত মৃদু—কত ক্ষীণ! যখন শুনিতে পাই গুজরাট, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি সকল দেশের মহিলাগণ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং ইহার সাফল্য অনুভব ও লাভ করিতেছেন, তখন হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং অন্তরে কেবল এই ইচ্ছাই প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে যে, বেহারবাসিনী ভগ্নীগণও জাগিয়া উঠুন।

ভগবানের রাজ্যে এই নিয়ম দেখিতেছি যে, পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। যে জাতি যতদিন পর্য্যন্ত নারীকে ক্রীড়া-পুত্তলি ও বিলাসসামগ্রীর ন্যায় গৃহরূপ আলমারিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ততদিন সে জাতি উন্নতির সর্ব্বনিম্নস্তরে স্থান পাইয়াছেন। আমাদের ভারতের ইতিহাসেও তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, "বালিকাকে শিক্ষিতা ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা করিবে। তাহাকেও পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিবে।" পুরাকালে এ বাক্যের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় সম্পাদিত হইত বলিয়াই আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, লীলাবতী এবং আরও অনেক শিক্ষিতা ও সাধ্বী রমণীর নাম ভারতের উন্নত পর্ব্বের সহিত জড়িত দেখিতে পাই। যতদিন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল, ততদিন ভারত সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল।

মধ্যে রাজ্যপরিবর্ত্তনের সহিত অবরোধ-প্রথার প্রচার ও শিক্ষার বিলোপ সাধিত হয়। কিন্তু আজ কাল ব্রিটিশ-রাজের ন্যায় ও শান্তির রাজ্যে গৃহের কন্যা, বধূ অপহরণের কথা কেহ শুনিতে পায় না। তবে এত শৃঙ্খল, এত আবরণের আবশ্যকতা কি?

শতাব্দী-শতাব্দী ধরিয়া যে অন্ধকারের ভিতর দিয়া স্ত্রীজাতি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আলোকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষগণ সাহায্য না করিলে তাঁহাদের আর অন্য পথ নাই। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যদি আপন আপন পরি-

---

* ১৯১২ সালের Social Conference এ পঠিত হিন্দী প্রবন্ধের অনুবাদ।

বারস্থ বালিকা ও স্ত্রীগণের শিক্ষা ও উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে সে সদ্দৃষ্টান্তে আরও অনেকে এ পথে অগ্রসর হইবেন।

অনেকেই মনে করেন, মাতৃভাষায় চিঠি পত্রের আদান প্রদান ও রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারাই স্ত্রী ও কন্যার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ তাঁহাদেরতো অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবেনা। তাঁহাদের কেবল এই জিজ্ঞাসা করি যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল অর্থোপার্জ্জন? ইহার দ্বারা কি তাঁহারা জীবনে আর কোনও ফল লাভ করেন নাই? যদি তাহাই হইবে, তবে কেন তাঁহারা শ্রীমতী Annie Besant, Sister Nibedita, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, খুদাবক্সখাঁ ও অন্যান্য সাধ্বী ও মহাত্মাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন? পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি উদ্রেক করিবার, মার্জ্জিত রুচির সংস্কারের ও জাতীয় চরিত্র গঠনের এক মাত্র উপায় কি শিক্ষা নয়?

বালিকাগণ শুধু গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া সকল শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অবশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত, কারণ পরস্পরের সহিত সঙ্গের আদান প্রদানের ভিতর দিয়া যে সহানুভূতি, আত্মনির্ভরশীলতা, পরোপকারের ভাব ও শিক্ষা জাগিয়া উঠে তাহা বাড়ীতে থাকিলে হয় না। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পার না হইতে পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে উদার হৃদয় সৎশিক্ষার পরিচায়ক।

আর একটি কথা, শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা অবশ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ ভারতের এমনকি পৃথিবীর সকল স্থানেই এ ভাষার প্রচলন বেশী। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডার অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ যাহা এখনও কোনও ভাষায়ই প্রায় পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় পরিসমাপ্ত হইলে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইবে। শাস্ত্র বলেন, "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। তাহাতে বিলাসিতা, অহঙ্কার, আত্মাভিমান ও স্বার্থান্বেষণ বাড়িয়া যায়—যাহার পাপে জাতি আরও অবনতির পথে অগ্রসর হইবে। যে শিক্ষায় স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, রাজভক্তি ও জাতীয় প্রেম পরিপুষ্ট হয়, মনে গভীর চিন্তা, ভাব ও দায়িত্বের উদ্রেক হয়, হৃদয় বিনীত ও ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হয় সেই শিক্ষারই এখন প্রয়োজন হইয়াছে। পৃথিবীর ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের অন্য সকল পার্থিব আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা এই শিক্ষাদানই কি শ্রেষ্ঠ নয়?

পুরুষগণ! আর নিজেদের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিবেন না। স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় হওয়া মানে আত্মোন্নতির পথ বন্ধ করিয়া রাখা। কারণ স্ত্রীজাতি পরিবারের কেন্দ্র, সমাজের ও গৃহের অর্দ্ধাঙ্গই অধিকার করিয়া আছেন। যদি ভবিষ্যৎ জাতিকে উন্নত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপন আপন স্ত্রী ও কন্যাগণকে সুশিক্ষা প্রদানে পশ্চাৎপদ

হইবেন না। সুমাতা হইলে ঘরে ঘরে সুসন্তানও অবশ্যই জন্মিবে। কিন্তু যত দিন স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধিত না হইবে, ততদিন ইহা সম্ভব নয়। মহাকবি Ten. nyson যে বাক্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশব্দ মহা সত্য। সেই বাক্য আবার স্মরণ করুন ও জীবনে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করুন।

"The woman's cause is man's ;
they rise or sink
Toghther, dwarfed or God-like
bond or free.
If she be small, slight-natured,
miserable
How shall men grow ?"

ভগ্নীগণ! আপনারাও সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। বাধা বিঘ্ন অনেক আসিবে, কিন্তু সে সকল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। একের ইচ্ছায়, একের উৎসাহে ইহা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু এই বৃহতী সভা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে. আমরা একা নই। ইঁহারাও সকলেই আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী এবং সেই কারণেই কত দূর দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। বেহারবাসিনী ভগ্নীগণ! আসুন সকলে মিলিয়া ইঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত শিক্ষা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হই। ঈশ্বরের এই অযাচিত দান যাহা পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় বেহারের ভূমিকে পবিত্র করিতে আসিয়াছে, সেই দান হৃদয়ের গভীর প্রেমের সহিত গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।

যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের আমৃত্যু সকল কার্য্যেরই সাক্ষী-স্বরূপে বর্ত্তমান সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।

যে মাঘোৎসবের জন্য সম্বৎসর ধরিয়া দেবতারাও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আজ আমাদিগের সেই প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। সেই এই ব্রহ্মোৎসবে কত ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা কত সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মকথা সকল বলিয়া গিয়াছেন। আর আজ সেই ব্রহ্মোৎসবে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি অন্য কি-ই বা নূতন কথা বলিতে পারিবে? কোটি কোটি রবিশশিগ্রহ যে বিরাট বিশাল ব্রহ্মচক্রে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতেছে, কোটি কোটি মানবাত্মা যে ব্রহ্মচক্রে ভগবানের জয়গান করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, সেই ব্রহ্মচক্রের মধ্যে আমার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া আমি নিজে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

কিন্তু যে বিশ্বেশ্বর দেবাধিদেবের বলে মূক ব্যক্তি বাচালতা লাভ করে, যাঁহার বলে পঙ্গু যে, সে-ও অনায়াসে গগনস্পর্শী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, আজ এই ব্রহ্মোৎসবে তাঁহারই বলে বলী হইয়া. তাঁহারই সাহসে সাহস প্রাপ্ত হইয়া প্রাণের একমাত্র আরাম সেই ভগবানেরই বিষয়ে দুইচারিটি কথা সমাগত সাধুমণ্ডলীকে শুনাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। কোন্ ব্যক্তি এমন পুণ্য ক্ষেত্রে এমন পুণ্য মুহূর্ত্তে

ভগবানের পুণ্য কথা শুনাইবার অবসর পরিত্যাগ করিতে পারে ?

এই শুভ মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ কর্ত্তৃক সেই অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনা সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্যকার দিবস আমাদের এত প্রিয়। এই মাঘোৎসবের দিন ব্রহ্মের জয়োৎসবের দিন। এই শুভদিনে ব্রাহ্ম-সমাজ সেই পরমদেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া সমগ্র নব্যজগতের ধর্ম্মরাজ্যে স্বীয় রাজত্ব স্থাপ-নের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাই আজি-কার দিন আমাদিগের এত প্রিয়। পূর্ব্ব-দিকে প্রাতঃসূর্য্য প্রথম উদিত হইয়া আমাদিগকে নবজীবন দান করে বলিয়া পূর্ব্বদিক যেমন আমাদিগের প্রিয়, সেই-রূপ এই ব্রাহ্মোৎসবের দিবস হইতেই ব্রাহ্মসমাজ ভারতে ব্রহ্মনামের জয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগের অন্তরে প্রাণ আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া এই ব্রহ্মোৎ-সবের দিন আমাদিগের এত প্রিয়। তাই আমরা আমাদিগের হৃদয়দেবতাকে আমা-দিগের সমবেত হৃদয়ের পূজা দিবার জন্য আজ এই পুণ্যক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে আমাদিগের দেশের যে কি মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে, আমরা চারিদিকেই আজ তাহার পরিচয় পাইতেছি। কাহার ইহা অবিদিত আছে যে কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজই নব্যভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রথম বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। সেই বীজ আজ বৃক্ষ-রূপে পরিণত হইয়া আমাদিগের সকলকে ছায়াদান করিতেছে। এক ধর্ম্মবিষয়েই ব্রাহ্মসমাজ কত না উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে নব্যজগতে ধর্ম্মসম্বন্ধ সমূহের প্রস্তা-বনাই হইত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিকালে বলিতে গেলে সমগ্র ভারতে সেই একমাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকৃত ধর্ম্মের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল, আর আজ তাহার স্থলে এক বঙ্গদেশেই ধর্ম্মবিষয়ক কত মাসিক পত্র, কত পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইহা অল্প আশাপ্রদ নহে। ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে ভারতে ধর্ম্মের আলোচনা বিশেষভাবে আরম্ভ হইয়াছে, ভারতবাসীর স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। একথা স্বীকার্য্য যে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে। কিন্তু এইতো সময়, যখন ব্রাহ্মসমাজকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মের আলোচনা যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন তো ব্রাহ্মসমাজের জয়-মুহূর্ত্ত সন্নিহিত। এই আলোচনারই ফলে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন নিঃসন্দেহ। এমন শুভমুহূর্ত্তে ব্রাহ্ম সমাজ নিদ্রিত থাকিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করিলে অমার্জ্জ-নীয় অন্যায় কার্য্য হইবে। সুপ্রসিদ্ধ বীর নেলসন প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীকে একটি জাগরণমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন—"ইংলণ্ড আশা করে যে প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য

সাধন করিবে।" পূজ্যপাদ পিতামহদেব সেইরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মকে একটি জাগরণ-মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন—প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে তাহা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রাখা কর্ত্তব্য সেই মন্ত্রটী এই—"সমস্ত জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা সকল বিষয়ে কি জ্ঞানে, কি বস্তায় কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইতে কেনই বা কুণ্ঠিত হইবেন? ব্রাহ্মসমাজের দেবতা যিনি, তিনি পরাজয় কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ব্রাহ্মসমাজ যখন সেই অপরাজিত দেবতার নামাঙ্কিত পতাকা স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতেছেন এবং যখন সেই দেবদেব ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে স্বীয় অক্ষয় আশীষ দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তখন ব্রাহ্মসমাজের পরাজয়ই বা কোথায় এবং ভয়ই বা কিসের?

ব্রাহ্মসমাজের সেই অপরাজিত দেবতা ভারতের চিরপুরাতন ঋষিবন্দিত সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। এই সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে আমাদিগের জানিতে হইবে, প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে এবং জানিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে, স্পর্শ করিতে হইবে।

সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের পরিচয় আমরা তো আমাদিগের চতুর্দ্দিকে নিত্যই দেখিতেছি, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা কেবল কথার কথা নহে যে তিনি আছেন তাই জগতসংসার আছে, তিনি আছেন তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমাদের কল্পনাতেও ইহা আসিতে পারে না যে তিনি না থাকিলে এই ব্রহ্মচক্রের অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইত। ইহাও কি কখনও সম্ভব যে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিবার কেহই নাই, কাহারও ইচ্ছা ইহার ভিতরে কার্য্য করিল না, অথচ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড আপনাপনি আবির্ভূত হইল এবং স্বয়ংই কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম আবিষ্কার করিয়া আপনাকে তাহাতে পরিচালিত করিতে লাগিল?

এই ব্রহ্মচক্র যে কি আশ্চর্য্য নিয়মে কার্য্য করিতেছে তাহা ভাবিলে নির্ব্বাক হইতে হয়। সকলেই জানেন যে জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়া বলিয়া দেন যে সূর্য্যচন্দ্র অমুক দিন অমুক মুহূর্ত্তে উদিত হইবে এবং অমুক মুহূর্ত্তে অস্ত যাইবে। এখন, যদি সেই গণিত মুহূর্ত্তে সূর্য্যচন্দ্রের উদয়াস্ত না হইল, তবে আমরা বলিব যে নিশ্চয়ই জ্যোতিষীদিগের গণনাতেই ভুল হইয়াছে; কিন্তু একথা আমরা কখনই বলিল না যে সূর্য্যচন্দ্র ভ্রমক্রমে উদয়াস্তের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করিয়াছে—ভগবৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের অভ্রান্ততায় আমাদের এতই অটুট বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেরই বশবর্ত্তী হইয়া জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বের এবং শতসহস্র বৎসর পরবর্ত্তী কালেরও সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা সকল অনায়াসে গণিয়া বলিতে পারেন। কে বলিতে সাহস করিবে যে এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মসকল আপনাপনি আসিয়াছে? সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মহান্

পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কাহার জ্ঞান এই সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পরিচালনভার স্বীকার করিতে পারে? এই যে জীবজন্তুদিগের অন্তরে স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি প্রভৃতি সাধুভাব সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, এগুলি কে এই সংসারকে মধুময় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন? এমন সুন্দর ভাবগুলিকে মিথ্যা বলিতে পারি না। আমার সেই প্রাণারামের স্নেহ আমার হৃদয়ে নামিয়া আমাকে যে আনন্দরসে ডুবাইয়া দিতেছে; আমার সেই স্নেহময়ী জননীর দয়া প্রীতি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে যে রক্ষাকবচস্বরূপে রক্ষা করিতেছে; এবং আমারও হৃদয় যে সেই জীবনের জীবন, প্রাণের একমাত্র আরামস্থল প্রাণের দেবতাকে পাইবার জন্য কতবার দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে—এই সকল ভাব যদি মিথ্যা হয় তবে তো কিছুই সত্য নহে। আর এই সকল ভাব যদি সত্য হয়, তবে সেই জ্ঞানময় পুরুষের ইচ্ছা ব্যতীত আর কাহার ইচ্ছাতে এগুলি যথাযথ নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতেছে?

যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল জ্ঞানমূলক নিয়ম এবং ভাবরাশি অবিশ্রান্ত ভাবে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছে, সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মহান্ পুরুষের ক্ষমতাও যেমন আশ্চর্য্য, তাঁহার কার্য্যকুশলতাও তেমনি আশ্চর্য্য। তিনি যে নিশ্বাসে অগণ্য অগণ্য কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রকে আপনাপন কক্ষপথে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি সেই নিশ্বাসেই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া আপনার মঙ্গলনিয়মে আমাদের প্রত্যেককে নিয়মিত করিতেছেন।

ব্রহ্মচক্রের নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষকে জানা, তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নহে। সেই মহৈশ্বর্য্যবান ভগবান যে স্বপ্রকাশ। তিনি স্বকীয় মহিমাতে অনন্ত জীবন্ত মূর্ত্তিতে যেমন মস্তকের উপরে ঐ সুনীল আকাশে প্রকাশিত, তিনি সেইরূপ জীবন্তভাবে এই সন্তানগুণেও প্রকাশিত এবং সেই একই ভাবে তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আমাদের জ্ঞান মোহেতে নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়া না গেলে একথা বলা অসম্ভব যে এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা কেহ নাই অথবা থাকিলেও তাঁহাকে জানিতে পারি না। অন্ততঃ ভারতবাসী আমরা ভারতের ঋষিদিগের আবিষ্কৃত অমূল্য রত্ন আত্মজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া যেন একথা না বলি যে আমরা সেই অনন্ত পুরুষকে জানিতে পারি না।

তাঁহাকে আমাদিগের জানিতেই হইবে। তাঁহাকে না জানিলে আমাদিগের হৃদয়সিংহাসনে অন্য কাহাকে বসাইয়া হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিব? তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে চাও? তাহা অসম্ভব। আমাদের দেবতা যিনি, তিনি যে অনন্ত অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান জগতে আর কি আছে যে তাহাকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিব? জগতের সকলই যে কালে বা স্থানে

সীমাবদ্ধ, কিন্তু একমাত্র তিনিই অনন্ত, স্থান ও কাল প্রভৃতি সকল প্রকার সীমার অতীত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই দয়াময় ভগবান্ এমনই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা সীমাবদ্ধ হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারি। তিনি আমাদের জ্ঞানকে তাঁহার জ্ঞানের সহিত সমধর্ম্মী করিয়া দিয়াছেন এবং আমরা আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সমধর্ম্মিতাসূত্রে সেই জ্ঞানস্বরূপকে জানিতে পারি, এবং তখন হৃদয়ের ভক্তিপ্রীতি দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি।

সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন, তিনি অনন্তমঙ্গলও বটে। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় যেমন আমরা সর্ব্বত্র বিস্তৃত দেখি, সেইরূপ তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবেরও পরিচয় সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হই। জীবজন্তুগণ প্রাণ ধারণ করিবে বলিয়া তাহাদিগের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বেই তিনি বায়ু সৃষ্টি করিয়া দিলেন। উচ্চনীচ পর্ব্বতসমূহ হইতে নদনদী প্রভৃতি জলপ্রবাহসকল প্রবাহিত করিয়া দিলেন। যুগযুগান্তর পরবর্ত্তী কালে প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া তিনি ভূগর্ভে অঙ্গার ও তৈল সঞ্চিত রাখিয়া দিলেন। আমাদিগের হৃদয়ে প্রেম প্রভৃতি যে সকল সুমঙ্গল ভাব দিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কত না মঙ্গলভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সত্যই একবার চাহিয়া দেখ, সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয় প্রশান্ত মূর্ত্তিতে, স্বীয় আনন্দরূপে অমৃতরূপে এখনি এখানে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত করিবার জন্য এখনি এখানে বর্ত্তমান আছেন। তিনি তাঁহার অভয় আশীর্ব্বাক্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য অবিরত উৎসাহিত করিতেছেন। আইস, আমরা তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া নির্ভয় হই এবং বলের সহিত দেশ হইতে দেশান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, সেই পবিত্র ব্রহ্মনামের জয় ঘোষণা করিতে থাকি। তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা না দিয়া আমরা বাঁচিতেই পারিব না। সেই আত্মার আত্মাকে পূজা করিয়া অপার আনন্দলাভের পর সীমাবদ্ধ বস্তুকে ভক্তিপ্রীতি দিয়া কি বাঁচিতে পারি? সাগরের মৎস্য কি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ক্ষণকালের জন্যও বাঁচিতে পারে?

হে পরমাত্মন্! তুমি আকাশ অপেক্ষাও মহান্, কিন্তু তোমার কি আশ্চর্য্য করুণা যে তুমি আমাকে তোমায় স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়াছ। তুমি আমার একমাত্র প্রাণের আরামস্থল। তুমিই একমাত্র আমার জীবনসহচর। তোমারই অতুল প্রভাব নামের জয়মন্ত্র হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়া সংসারের সমুদয় সম্পদ ও বিপদের অতীত হইয়া তোমারি পথে যেন চলিয়া যাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নারীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।—ফ্রান্সদেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। মেম ডেনিজার্ড নামক একটি নারী এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট (শাসনকর্ত্রী) হইতে যত্নবতী হইয়াছিলেন। ইনি এমিয়েন নগরে বাস করেন এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবার জন্য যত ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মেম ডেনিজার্ডও ছিলেন। এক জন তাঁহার

এই যন্ত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি চান? তিনি বলিলেন, নারী দেশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে না কেন? লোকে এখন ঠাট্টা করিতে পারে; কিন্তু ক্যাথেরাইন এবং ভিক্টোরিয়া কি রাণী হন নাই?

অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের সভা।—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ৪নং মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তুরস্কদেশীয় আহত সৈন্যগণের সাহায্যার্থ দানসংগ্রহের জন্য অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের এক সভা হইয়াছিল। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে মিসেস আর্ এস্ হোসেন তুরস্কের আহত সৈন্যদিগের সম্বন্ধে দুঃখোদ্দীপক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দান করেন। তিনি সভাস্থলেই "Sultana's Dream" নামক তাঁহার ২০০ শত খণ্ড পত্রিকা দান করিয়া তুরস্কসাহায্যভাণ্ডারে চাঁদাদানে অগ্রবর্ত্তিতা প্রদর্শন করেন।

ফরাসী মহিলার সংস্কৃত উপাধি।—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মিস্ কার্পেলিন নামক সংস্কৃতভাষানুরাগিণী ফরাসী মহিলাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে "ভারতী" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিজ দেশে কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ফরাসী অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ভারতে আসিয়া সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি রামায়ণ ও সীতা চরিত্র পাঠ করিয়া অতীব মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যম অতীব প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় বটে। ভারতে এক সময়ে সংস্কৃত বিদুষী অনেক রমণী ছিলেন, যাঁহাদের গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত ছিল। অধুনাতন ভারতীয় মহিলাগণ কি সে গৌরব আরও বাড়াইয়া তুলিবেন না?

মাঘোৎসব—পলে পলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রিয় মাঘোৎসব আমাদের নিকট আসিল এবং চলিয়া গেল; কি সুসংবাদ দিয়া গেল, কাহার অশ্রু মুছিল, কাহার প্রাণের দারুণ ক্ষত শুকাইল, এ সব বিচার্য্য বিষয় বটে। বৃথা কি উৎসব আসিল এবং চলিয়া গেল? আশাকরি, এ নিষ্ফলতা কাহারও জীবনে ঘটে নাই। বিশেষতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারী হৃদয়ে এ সফলতা অধিকতররূপে কার্য্যকারিণী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোমলহৃদয়া ভক্তিপ্রীতির উৎসরূপিণী মহিলাবৃন্দ বাস্তবিকই উৎসবানন্দের প্রকৃত রসমাধুরী পান করিয়া আপনারা যেমন কৃতার্থ হন, তেমনি স্ব স্ব পরিবারে আনন্দ ধারা ছড়াইয়া সকলকে কৃতার্থ করেন। আমরা ভারতীয় লোক, আমাদের স্বাভাবিক একটা বিশ্বাস এই যে, পরিবারের ধর্ম্ম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যাদি যাহা কিছু নারীগণ কর্ত্তৃকই রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। ভারতীয় মহিলাকুলে তাদৃশী আদর্শরমণীর ভূরি প্রমাণ বিধাতা দেখাইয়াছেন। এখন যে তিনি নারীগণের সে সৌভাগ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কখনই নহে। কুসংস্কারবর্জ্জিতা শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে এই সৌভাগ্য আমরা আরও অধিকতররূপে দেখিতে চাই। আমাদের ব্রাহ্মিকাগণের হাতে বিধাতা যে পরম সম্পদ দিয়ে গুরুতর দায়িত্বের জন্য আহ্বান করিতেছেন, আশাকরি, তাঁহারা সে আহ্বানধ্বনি শুনিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবেন। তাঁদের ভিতর দিয়াই বিধাতাপুরুষ এবার পরিবার, সমাজ ও দেশ তাঁহার মনোমত রূপে গড়িবেন, এই ইঙ্গিত করিতেছেন। এবার এই উৎসবে যে প্রসাদ তাঁহারা পাইলেন, এবং তাঁহার ভিতরে যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা অন্তরে অন্তরে বুঝিয়া এই নূতন বৎসরের জন্য সকলেই প্রস্তুত হউন।
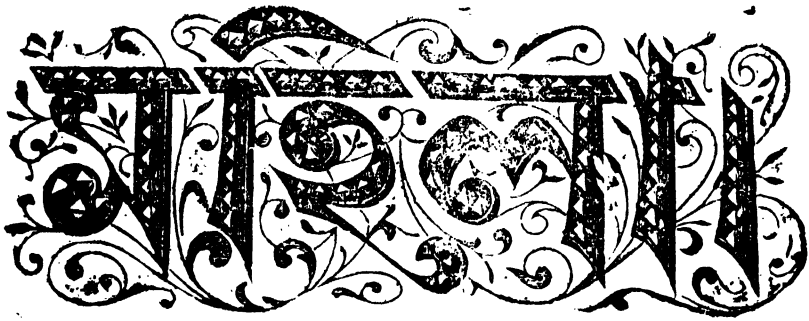
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৮শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩১৯। মার্চ্চ, ১৯১৩। [৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মনোবুদ্ধির অতীত পরম দেবতা, নরনারী কখনও তোমাকে জানিতে পারিবে না তাহা সত্য, কিন্তু তোমাকে জানিতে পারিবে না বলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াও শান্তি পায় না। এই জন্যই সকল ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যসন্তান তোমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। আমরা তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে এই শ্রেণীর করিয়া লও। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মনে না করি যে, আমরা তোমাকে জানিয়া ফেলিয়াছি; আর যেন কখনও মনে না করি যে, তোমাকে যখন কখনও আয়ত্ত করা যায় না, তখন তোমার অন্বেষণ ত্যাগ করিয়া কেবল সংসার লইয়াই থাকি। এই প্রার্থনা করি, যেন আমরা চির দিন তোমাকে জানিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া নিযুক্ত থাকি এবং তুমি কৃপা করিয়া যখন যেরূপে প্রকাশিত হও সেইরূপে তখন তোমাকে পাইয়া পুনরায় যেন নব নব প্রকাশের জন্য বিনীত ও ব্যাকুল হইয়া অগ্রসর হই।

বঙ্গে বালিকাশিক্ষার সঙ্কট।

বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজস্থ পুরুষ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক লাভে যত কেন জ্ঞানে, পদে, ধনে সমুন্নত হউন না, তাঁহাদের হিন্দুসমাজের বিষম বিভীষিকা ত্যাগের ক্ষমতা নাই। হিন্দুসমাজের আচার রীতি নীতি অনুসরণ করিলে হিন্দু বালিকাদিগের সুশিক্ষা কিংবা উচ্চ শিক্ষা হইতে পারে না। বালিকাবিবাহ বালিকাশিক্ষার বিষম পরিপন্থী। বালিকাদিগকে তাহাদের মতের কোন অপেক্ষা না করিয়া অভিভাবকের সুবিধা এবং ইচ্ছানুসারে পাত্রস্থ করা হইয়া থাকে। শিক্ষিতা হইলে বালিকাদিগের স্বাধীনতা এবং

বিচারক্ষমতা প্রস্ফুটিত হইবার কথা। সেরূপ শিক্ষিতা কোন বালিকা কি যাকে তাকে পতিরূপে বরণ করিয়া সুখী হইতে পারে? নব্য শিক্ষিত অভিভাবকগণ কি বিবাহকালে কন্যার মতামতের প্রতি অনু-মাত্র লক্ষ্য করেন? তাঁহারা শিক্ষিত হইলেও কন্যাদানকালে প্রাচীন বর্ব্বর-প্রথা পরিহার করিতে অসমর্থ। গুরু, পুরোহিত, সমাজ তখন খড়্গহস্ত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। সমাজের মন-স্তুষ্টি না করিয়া কন্যা বা স্বকীয় বিবেকের তুষ্টিসাধনে তাঁহারা দৃকপাতও করেন না। অশিক্ষিতা হিন্দু বালিকা বিবাহসূত্রে যে অবস্থাতেই কেন পতিত হউক না, তাহারা পুরুষ পরম্পরাগত অদৃষ্টবাদের উপর ভর করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করে। বিচারক্ষমতাযুক্ত শিক্ষিতা বালি-কার পক্ষে ঐরূপ অদৃষ্টে ভর করা দুঃসাধ্য।

হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ এবং বিবাহ-প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে হিন্দুসমাজস্থ বালিকাবৃন্দের সুশিক্ষা হওয়া অসম্ভব। এইক্ষণ হিন্দুসমাজে কন্যার শিক্ষা কেবল বিবাহজন্য। যাহারা বিবাহ করে সেই সকল যুবকেরা একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে খোঁজে। সেই জন্য বালিকাদিগকে কিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া পিতা মাতার আগ্রহের বিষয় হইয়াছে।

আমাদের বাল্যকালে এ উৎপাত ছিল না। মেয়ে লেখাপড়া জানে কি না সেকালে কোন বরপক্ষ এ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করিত না। মেয়ে রান্না বাড়া করিতে পারে কি না? আলেপনা দিতে এবং পীঁড়ি চিত্র করিতে জানে কি না, পিঠা প্রস্তুত করিতে, কাপড়ের পাখা তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে কি না এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইলেই তখনকার লোক কন্যার সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইত। অধুনা-তন কালে যুগান্তর ও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বরেরা বিদেশে থাকেন। কন্যা যদি পত্র লিখিতে না পারেন তবেত পত্রদ্বারা আলাপ চলিবে না। সুতরাং পত্র লেখা কন্যার অভ্যাস হইয়াছে কি না, নাটকাদি পাঠ করিয়া শুনাইতে পারিবে কি না এজন্য লেখাপড়ার প্রশ্ন কন্যাসম্বন্ধে উঠিয়া থাকে।

যে লেখা পড়ায় জ্ঞান জন্মে, কুসংস্কা-রের অন্ধকার দূর হয়, মূর্খ ও চরিত্রহীন গুরুপুরোহিতের পদরজে ভক্তি থাকে না, সে লেখাপড়াকে অদ্যাবধি হিন্দুসমাজ অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে। শিক্ষিত যুবারা স্কুল কালেজে জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখন পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে পরিপক্কতা লাভ করে। ছাত্রাবাসগুলিতে চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা হইতেছে, মহা আড়ম্বরের সহিত মৃণ্ময়ী সরস্বতীর পূজা হইতেছে। এবম্প্রকার শিক্ষিত যুবাগণ কি কোন কালে হিন্দু-সমাজসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইবে?

বঙ্গীয় নারীকুলও যদি এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা দেশের যে কি হিতসাধিত হইবে তাহা প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রে বুঝিতে পারেন। জ্ঞানে যদি অজ্ঞা-নতা দূর না হয়, ধর্ম্মে যদি অধর্ম্ম দূর না

করে, সমাজের মূঢ়তা যদি শিক্ষিত লোকেরও ভয়ের কারণ থাকে, তবে সে জ্ঞান সে ধর্ম্মের সার্থকতা কি?

হিন্দুসমাজ রমণীর মূর্খতা আজও বাঞ্ছনীয় বোধ করিতেছে। মহাপরাক্রমশালী ঈশ্বরের কৌশলে বঙ্গদেশে যে সমাজসংস্কার এবং জ্ঞানধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে অল্পসংখ্যক লোক সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজস্থ বালিকাগণ নানারূপ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া এদেশে রমণীকুলে উচ্চ শিক্ষা গৃহীত হইতেছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজ যদি বালিকাদিগকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত না করে, তবে দেশময় মহিলাসমাজে উচ্চ শিক্ষা প্রবেশ করিবে না।

শিক্ষার যে অল্প কিরণ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে ইহারই প্রভাবে কুসংস্কারান্ধকারের ঘনত্ব হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীন প্রণালীর পূজার্চ্চনায় অনেক মহিলার পূর্ব্ববৎ আস্থা নাই। তবে সমাজভয়ে পুরুষ নারী সকলেই আড়ষ্ট হইয়া আছে। বিবেকের সম্মান নাই। সত্য ঈশ্বরের উপাসনাদিতে দৃঢ়তা দেখা যায় না। অনিচ্ছায়ও গুরুর পাদোদক পুরোহিতের পদরজঃ গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেক অর্থহীন কার্য্য করিতে অনেককেই বাধ্য হইতে হয়। জ্ঞান এবং স্বাধীনতা মনুষ্যমাত্রের মহাশক্তি। এ শক্তি হিন্দুসমাজে আদৃত হইবার নহে। প্রচলিত প্রথার আনুগত্য পুরুষ নারী সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। যে বিষয়ে যাহার আস্থা নাই, পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমাজের সন্তোষ সাধনার্থ তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রকৃত শক্তি লোপ পায়।

হিন্দুর শাস্ত্রে সত্যনিষ্ঠা এবং ব্রহ্মপূজা বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। আবার মূর্ত্তিপূজা ও লোকাচারের অনুবর্ত্তন বিষয়েও বহু অনুশাসন দেখা যায়। সুতরাং হিন্দুসমাজের প্রাচীন অবস্থানুসারে বর্ত্তমানকে চালাইতে হইলে বুদ্ধিমানকেও হতবুদ্ধি হইতে হইবে।

আমরা জানি হিন্দুসমাজস্থ বহু মহিলা বর্ত্তমানকালের প্রভাবে অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা এবং সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলে অনেক শিক্ষিতা হিন্দুমহিলা সভ্য আছেন। তাঁহারা কি আপনাদের বিষম সঙ্কটের বিষয় কখন চিন্তা করেন না? এ সঙ্কটে যে মিথ্যা এবং কপটতাই বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনেক পদস্থ পুরুষ উন্নতির স্রোতে গা ভাসাইতে না পারিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পৌত্তলিকতা ও নানারূপ কপট ধর্ম্মভাব দ্বারা স্বীয় পরিবার পরিজনকে ভুলাইতে চেষ্টা করেন। অনেক পরিবারে কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ চেষ্টা একেবারে পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কালের গতির বিরুদ্ধে কতকাল এরূপ সংগ্রাম চলিতে পারে? বঙ্গদেশে মহিলাকুলে জ্ঞানের স্রোত প্রবেশ করিতেছে, আরও করিবে। আলোকের প্রকাশে অন্ধকার

যেমন স্বতঃই দূর হইয়া যায়, তেমনই জ্ঞানের প্রকাশে অন্ধকার ও কুসংস্কার চলিয়া যাইবে। অশিক্ষিতাদিগের এক প্রকার দুরবস্থা। তাহা সকলেই স্বীকার করে এবং বুঝিতে পারে। কিন্তু সমাজের প্রভাবে শিক্ষিতা মহিলাগণও যে এক প্রকার দুরবস্থা ভোগ করে তাহা কি বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকদিগের মনে প্রকাশ পায় না? শিক্ষায় যদি জীবনের পরিবর্ত্তন না করে তবে সে শিক্ষায় উপকার কি? হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তিত না হইলে হিন্দুসমাজে নারীর শিক্ষার ফল ফলিবে না এ কথাটি শিক্ষিত এবং শিক্ষিতাগণের ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

নারীশিক্ষার সেকাল একাল।

মৈত্রেয়ী গার্গী খনা লীলাবতী প্রভৃতি জন্মপরিগ্রহদ্বারা যে দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সে দেশের লোক স্ত্রীশিক্ষার নামে খড়্গহস্ত হইয়াছিল, সে দেশে মহিলামাত্র অক্ষরজ্ঞানশূন্য ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অন্যদেশে হইয়াছে এমন শ্রুতিগোচর হয় নাই। নব যুগপরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশে প্রায় ষাট বৎসর হইল বালিকা শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। এদেশে নারী শিক্ষার সহিত মহামতি বেথুন সাহেবের নাম চিরকাল গ্রথিত থাকিবে। যখন লর্ড ডেলহাউসি ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং বেথুন মহোদয় কাউন্সিলের মেম্বর তখনও সমস্ত বাঙ্গালী স্ব স্ব প্রাণসমা দুহিতাগণের জ্ঞানোন্মেষের ভয়ঙ্কর বিরোধী, কচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য লোক সাহস পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার পক্ষসমর্থন পূর্ব্বক কোন কোন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এসময়ে মহাত্মা বেথুন সাহেবের মনে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রবল সংকল্প জাগ্রত হইল। তিনি কলিকাতাতে আপনার নামে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বেথুন বিদ্যালয়ের ভূমি দান করেন। মহাত্মা বেথুন সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে সেই স্থানে বিদ্যালয় বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কলিকাতায় বিখ্যাত হইয়াছে। তিনিও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। তাঁহারই যত্নে কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লোক বেথুন-বালিকাবিদ্যালয়ে স্ব স্ব কন্যাকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রেরণ করাতে তাঁহারা সমাজ-চ্যুতও হইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষা-প্রাপ্তা কন্যাদিগের উদ্বাহব্যাপারেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে হইত। কেন না শিক্ষিতা কন্যাদিগকে কেহ স্ব স্ব পুত্রবধূ করিতে চাহিত না।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশে সেই এক কাল গিয়াছে, অধুনা ঈশ্বরকৃপায় আবার এই এক কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন সকলেই শিক্ষিতা বধূ পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি শিক্ষিত দিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লোক নাই বলিলেও বোধহয় মিথ্যা হয় না। স্ব স্ব কন্যা ও ভগিনীগণকে কে অধুনা মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে

ইচ্ছুক? এদেশের গবর্ণমেণ্টও নারীশিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং নানারূপ উপায়াবলম্বন করিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনে পূর্ব্বে যে সকল দোষ ঘটিয়াছে সে সকল দোষ এখন সংশোধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বহু শিক্ষিতা মহিলা এখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণার্থ আমরা বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর কয়েকটী দোষ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

১। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি, আবারও উল্লেখ করিতেছি যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইতে পুরুষের আদর্শানুসারে মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা হওয়া কখনই উচিত নহে। বঙ্গদেশে যখন নারীশিক্ষার বহুল বিস্তার হইতেছে তখন মেয়েদের আদর্শও স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। শীঘ্রই ঢাকা নগরে ভিন্ন ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটীর প্রস্তাব বিষয়ক প্রকাণ্ড গ্রন্থমধ্যেও নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ে স্বতন্ত্র আদর্শের কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেশীয় শিক্ষিতমণ্ডলীর কিম্বা শিক্ষাসদস্যগণের মনোযোগমাত্রও আকৃষ্ট হইতেছে না। ঈশ্বর নরনারীর শরীর ও হৃদয় মন কি পরস্পর হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন করেন নাই? তাহাদের সংসারে কি বিভিন্ন কার্য্যসাধনে জীবন যাপন করিতে হয় না? নারী নরের কিংবা নর নারীর প্রতিযোগী নহে। তাহারা পরস্পরের সহায়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতিযোগী করা হয় কেন? ঢাকা ইউনিভার্সিটী যদি নারীশিক্ষার ভিন্ন আদর্শ স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশে নারীজাতির শিক্ষাবিধায়িনী বিধির একটি গুরুতর দোষ সংশোধিত হইতে পারে।

২। নারীজাতির বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় দোষ শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। এ অভাব যে কিরূপে উন্মোচিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করাও দুঃসাধ্য। কারণ এক বঙ্গদেশেই হিন্দুধর্ম্ম নামে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত। সেই প্রচলিত ধর্ম্মগুলি আবার নানারূপ কুসংস্কারে বিজড়িত। যাঁহারা বালিকাদের শিক্ষাকার্য্যে রত তাঁহারা কেহ বা হিন্দু, কেহ বা ব্রাহ্ম, কেহ বা খ্রীষ্টান, কেহ বা মুসলমান, কেহ বা কোন ধর্ম্মের ধার ধারেন না এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোক। এরূপ অবস্থায় কিরূপে কে কি ধর্ম্ম বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবেন? ধর্ম্মেতে প্রগাঢ় আস্থা এবং এক বিন্দু অনুরাগ না থাকিলে অন্যের ধর্ম্মের অভাবের ক্লেশ কাহারও অনুভূত হইতে পারে না। অথচ নারী যদি বাল্যাবধি অভ্যাসে, ব্যবহারে এবং শিক্ষাবিষয়ে ধর্ম্মহীন হয় তবে সমাজের বা পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কে করিবে? নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি ধর্ম্মেতে। সুতরাং ধর্ম্মে ঔদাসীন্য যে নারীর পক্ষে অতিশয় অনিষ্টজনক, দেশের পক্ষে ভয়াবহ তাহাত যুক্তিদ্বারা বুঝান যায়। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায়

নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যাহা হউক আমরা এ গুরুতর অভাবের বিষয় উল্লেখ করিলাম, নারীহিতৈষিগণ এবিষয়ে প্রণিধান করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

৩। বালিকাগণ জ্ঞান শিক্ষার সহিত যদি নানারূপ গৃহকর্ম্মে শিক্ষালাভ না করে তবে গৃহিণী হইবার উপযুক্ততা কোথায় লাভ করিবে। পুরুষদিগের এবিষয়ে শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। অথচ মেয়ে নানারূপ গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভ না করিলে গৃহরক্ষা করিতেই সমর্থ হয় না। মেয়েদের স্কুলে কিম্বা কলেজে নানারূপ গৃহধর্ম্মের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা কি অত্যাবশ্যক নহে? আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের অধ্যক্ষগণ বিদেশী। এবিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান বা সহানুভূতি আছে কি না তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু তাঁহারা নারীজাতির শিক্ষাবিষয়িণী ব্যবস্থা কার্য্যে এদেশীয় শিক্ষিত নরনারী-দিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ সুযোগ এতদ্দেশীয় শিক্ষিত পুরুষ বা মহিলা কাহারও উপেক্ষা করা উচিত নহে।

বালিকাশিক্ষার যাহাতে বিশেষরূপ বিস্তার হয় এবং বালিকাদিগের শিক্ষা যাহাতে তাহাদের জীবন ও কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগীরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত লোকমাত্রের সে চেষ্টা করিবার বিশেষ সময় সমুপস্থিত। ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষ নারীদিগকে বুঝান কঠিন হইত যে তাঁহাদের আশ্রিত বালিকাদিগকে জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তখনকার মহারথিগণের ঐরূপ চেষ্টাতেই সময় গিয়াছে। এখন যে জননী স্বয়ং মূর্খ সে জননীও আপন কন্যা সন্তানকে জ্ঞানদানের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে। এ সময়ে যে রাজা প্রজার যুগপৎ বালিকাশিক্ষার আবার বিশেষরূপে চিত্ত ধাবিত হইয়াছে ইহা বিধাতা প্রেরিত শুভক্ষণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। এ সময়ে সকলের সমবেত যত্ন যেন বঙ্গীয় বালিকাগণের উপযোগিনী শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে পারে ইহাই প্রার্থনীয়।

"মহিলার" ক্ষীণকণ্ঠধ্বনি বঙ্গদেশের শিক্ষাবিষয়ে নিযুক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কর্ণগোচর হইবে কি না জানি না আমরা চাই বঙ্গদেশের আপামর সাধারণে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়। বঙ্গদেশের মহিলা-প্রকৃতিতে স্বতঃই ধর্ম্মভয় ও ধর্ম্মানুরাগ বর্ত্তমান। ইহা যেন শিক্ষালাভে পরিপুষ্ট ও পরিশুদ্ধ হয়। বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণ অসংখ্য প্রকার কুসংস্কারে অদ্যাপি বিজ-ড়িত। জ্ঞানালোকে যেন সে সকল কুসংস্কার-শৃঙ্খল স্খলিত হইতে পারে। পুরুষের প্রতিযোগী হওয়া নিবন্ধন বঙ্গীয় নারীজাতির স্বাভাবিক সদ্গুণ রাশির যেন ব্যত্যয় না হয়। স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে যত প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে কিম্বা ঘটিতে পারে তাহা শিক্ষাসদস্যদিগের নেত্রপথে পতিত হউক। সে সকল ত্রুটি ও অভাব দূরীকরণের উপায় যেন এ সময়ে অব-ধারিত এবং কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

ব্রহ্মকন্যার অধিকার *।

যখন এবার ব্রাহ্মিকা উৎসবের উপাসনার ভার এই দীন অকিঞ্চনের উপর ন্যস্ত হইল, তখন ভাবিয়া ছিলাম, উপাসনা করিব, কিন্তু আমি আবার কি উপদেশ দিব, আচার্য্যদেবের উপদেশের পুস্তক হইতে একটী উপদেশ পাঠ করিলেই ভাল হইবে, এই চিন্তার পরমুহূর্ত্তেই হঠাৎ "ব্রহ্ম কন্যার অধিকার" এই বাক্যটী আমার হৃদয় মধ্যে উত্থিত হইল। এই বিষয় চিন্তা করিয়া যা' দু' একটী কথা মনে আসিল, তাহা আজ ভগিনীদিগের নিকট না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বাহিরের সকল কোলাহল দূরে রাখিয়া যখন জীবনের দিকে তাকাই, তখন কি দেখি না সকলের স্রষ্টা নিয়ন্তা যিনি তিনি এই জীবনের মূলে রয়েছেন। এই জীবন তাঁর শ্রীহস্তগঠিত; কত সুন্দর ভাব দিয়ে যিনি এই জীবনকে গঠিত করিয়াছেন, কেন তিনি এমন সুন্দর ভাবে আমাদের জীবনকে গঠিত করিলেন, আজ তাহা একবার স্মরণ করি।

জড়রাজ্যে, প্রকৃতিরাজ্যে নিরন্তর প্রতিনিমেষে পলকে তাঁর অভিপ্রায় সংসাধিত হইতেছে। গোলাপ ফুলের ঐ ছোট গাছটী কি বলতে পারে, না আমি ফুল ফোটাব না, আকাশের ঐ সূর্য্য কি কোন দিন বলতে পারে, না আমি আজ আলো বিতরণ করিব না; না, ইহা কখনই হইতে পারে না, সবাই তাঁর শুভ ইঙ্গিত মানিয়া নিজ নিজ পথে চলিতেছে, নিজের অধিকার নিজের অজ্ঞাতে বুঝিয়া লইয়া নিজ নিজ পথে চলিতেছে।

আমরা ব্রহ্মকন্যা, আজ আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের কথা একবার স্মরণ করি। করুণাময় মঙ্গলময় পিতা কেন এত সুন্দর ভাবে সাজাইয়া তাঁর কন্যাদিগকে জগতে প্রেরণ করিলেন, আজ আমরা এ কথা একবার চিন্তা করি। সেই সনাতন ব্রহ্ম কি তাঁর কন্যাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র সংসারের স্বার্থ সাধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন? না। তিনি পরিবারের কল্যাণের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর কন্যাদিগকে স্বর্গের সুন্দর সুন্দর ভাব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সনাতন ব্রহ্ম তাঁর কন্যাদিগকে কত বড় উচ্চ অধিকার দিয়াছেন তাহা যখন এই হৃদয়ের মধ্যে একবার চিন্তা করি, তখন কি এক মহান্ ভাবেতে হৃদয় ডুবে যায়, তা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

আমাদের এই জীবন, আমাদের পরিবারের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, পৃথিবীর সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলী ও ভগ্নীমণ্ডলীর জন্য। এবার উৎসবের আরম্ভ হইতে বড় আশার কথা, বড় সুখের কথা আমরা শুনিতে পাইয়াছি, ব্রহ্মকন্যা তাঁর উচ্চ অধিকারের কথা, ব্রহ্মকন্যা তাঁর স্থান

* কটকের অশীতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকা উৎসবের উপাসনায় রচিত।

কোথায়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন ; ব্রহ্মকন্যা আর অবশ হৃদয় লইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিবেন না। ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে কত ভ্রাতার আকুল প্রাণের ভক্তি, প্রীতি, পূজার্চ্চনা যা' ব্রহ্মের চরণে অর্পিত হয়েছে, ব্রহ্মকন্যা তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া এতদিন কৃতার্থ হইয়াছেন, জীবন ধন্য করিয়াছেন; এখন ভগিনীর আকুল প্রাণের ভক্তি প্রীতি, ব্রহ্মোপাসনা শুনিয়া দেখিয়া ভ্রাতৃগণ সুখী হউন, তাঁদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হউক। ব্রহ্মকন্যার মুখে ব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতি, পুণ্যের প্রভা, ব্রহ্মের সুবিমল সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগৎ মোহিত হউক, ব্রহ্মকন্যার জীবন সফল হউক।

নদীতে বন্যা আসে, আবার বন্যার জল শুখাইয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই বন্যার জল কি কিছু দিয়ে যায় না? নদীতে যখন বন্যা আসে, তার দুই দিকের স্থলভূমিকে সিক্ত করিয়া সেই স্থলভূমিকে ফলপ্রদ করিয়া তুলে এবং সেই শুষ্ক নদীর বক্ষে কত স্থানে পলি জমিয়া সেই সমস্ত স্থানকে উর্ব্বরা করিয়া তোলে। তেমনি উৎসব বৎসরে বৎসরে আসে এবং যায়, কিন্তু আমাদের জন্য কি কিছু রাখিয়া যায় না? যায় বৈ কি, কত নীরস শোক পাপ জর্জ্জরিত প্রাণকে সরস করিয়া সমস্ত মলিনতা পাপ জঞ্জাল ধুইয়া দিয়া যায়, স্বর্গের কত কথা শুনায়, কিন্তু আমরা সেগুলিকে প্রাণে ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু আজ কেন মনে হচ্চে, এবার থেকে উৎসবে যা' পাব, তা' প্রাণে সযত্নে রাখ্‌বো, জীবনকে ব্রহ্মের ইচ্ছানুগত করিয়া চালাইব, আর সংসারের কলুষিত বাসনা, কামনা, স্বার্থের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিব না, ব্রহ্মদত্ত ধনে ধনী হব, নিজ নিজের অধিকার বুঝিয়া লইব।

কটক। রেবা রায়।

পৌত্তলিকতা।

মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেবতার আরাধনা করা কত দিন হইল এদেশে প্রচলিত আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এদেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে মূর্ত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই। প্রাচীন কালে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে দুই চারিজন ব্রহ্মবাদী ছিলেন অথবা উচ্চাধিকারিগণ পরমাত্মার আরাধনা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থে তাঁহাদিগের জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, সে সময়ের সকল লোকই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের উপাস্য দেবতা তাহার মনের অবস্থার উপযোগী হইয়া থাকে। অশিক্ষিত মনুষ্যকে উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিলেই সে ব্রহ্মোপাসনা করিবে তাহা সম্ভব নয়। তাহার জ্ঞানোন্নতি না হইলে নিরাকার উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেও সে আপনার মনের মত উপাস্য স্থির

করিয়া লইবে। এজন্য অনেক সন্দেহবাদী পণ্ডিত মনে করেন যে, সকল প্রকার উপাসনাতেই পৌত্তলিকতা আছে। এরূপ করিয়া পৌত্তলিকতার ভয় করা এবং পৌত্তলিকতার ভয়ে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া কোন কোন পণ্ডিতের মত। সৌভাগ্যের বিষয় যে, মনুষ্যসাধারণ সে মত কখনও গ্রহণ করিবে না। ইহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই এই জাতি পৌত্তলিকতা পরিহার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ঐ সময়ে চারিদিকের সমস্ত জাতি যে পৌত্তলিক ছিল তাহা নিশ্চয়, তবে একথাও সত্য যে, ঐসকল জাতির মধ্যেও সময় সময় ধর্ম্মসংস্কারক উপস্থিত হইয়া পৌত্তলিকতা পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। একমাত্র ইহুদী জাতিতে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপর দিকে ইহুদজাতি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াই যে নিত্য নিরঞ্জন সত্য ঈশ্বরকে পাইলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাঁহারা অদৃশ্য বা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা ক্ষুদ্রতা ও বিকার হইতে রক্ষা পাইলেন না। কেবল পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষ বদ্ধমূল রহিয়া গেল। ইহুদী ধর্ম্মের ভিতর দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম আসিল, অবশেষে খ্রীষ্ট ও ইহুদী ধর্ম্মের সংঘর্ষণে মুসলমানধর্ম্ম উপস্থিত হইল। এই তিন ধর্ম্মের লোকই সেই আদি স্বভাব অর্থাৎ পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ চিরদিন রক্ষা করিয়াছে। ইহারা অন্য সকলপ্রকার বিকৃত ধর্ম্মের প্রতি ক্ষমাশীল হইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তিপূজাকে ক্ষমা করিতে পারে না। আমরা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া খৃষ্টিয়ানদিগের মজ্জাগত ভাব মূর্ত্তিপূজার প্রতি ঘোর বিদ্বেষ শিক্ষা করিয়াছিলাম। নূতন ভাবাপন্ন ধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মের নামে সকল প্রকার অযৌক্তিক কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু পৌত্তলিকতাকে অসহ্য গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। ইহার ভিতরে কতগুলি মিথ্যা ধারণা আছে সে সকলের আলোচনা করা সুখকর ও শিক্ষাপ্রদ।

জগতের কারণ, সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর কখনও মানবমনের গোচর হন নাই, কখনও হইবেন না। তিনি সৃষ্টির অতীত, কাজেই মানববুদ্ধিরও অতীত। যাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পরমেশ্বরের বিষয়ে যিনি যে শব্দ ব্যবহার করেন, যে কল্পনা পোষণ করেন, কিম্বা ধ্যানে বা জ্ঞানে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা আংশিক, অযোগ্য বা অপূর্ণ। যত স্তব স্তুতি করা হয়, যত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, কিছুই উপযুক্ত রূপে অনন্ত পূর্ণব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেনা। এই জন্য তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে তিনি নিত্য অব্যক্ত, অনন্ত, অগম্য। উপনিষদ্ তাই বলিলেন, যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই। সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মকে কেহ

জানিতে পারে না, কাজেই মানুষের প্রদত্ত কোন নাম তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা পরমেশ্বরের মহত্ত্বের বিষয় যত চিন্তা করি ততই আমাদের শক্তির অযোগ্যতা ও তাঁহার অনন্তত্ব দর্শন করিয়া অবাক হই। সত্য ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাকে জানা যায় না। এই অশক্তি আমাদিগকে একভাবে নিরাশ করিতে পারে, কিন্তু নিরস্ত করিতে পারে না। তাঁহাকে কখনও পূর্ণরূপে জানিতে পারিব না, আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বিষয় উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের স্বভাব ও আমাদের জীবনের নিত্য নব নব সুখ দুঃখের অনুভূতি আমাদিগকে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিতে ও তাঁহার লীলার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত করে। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে সকল মানুষকেই এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়। কাজেই তাঁহারা যাহা বলেন তাহাতে জ্ঞানীকে কতকটা জ্ঞানদান করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার উপাস্য দেবতাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও তৃপ্তি অনুভব করিতে ব্যাকুল তাহার কোন সাহায্য করিতে পারেনা। সংক্ষেপতঃ, ভক্তি বিশ্বাসের নিকট বাক্য মনের অগোচর অনন্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব কখনও গ্রহণীয় হইবে না। ভক্তের মন এবিষয়ে নিস্ক্রিয় থাকিতে পারে না—চিরদিন মানুষ আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের পূজাবন্দনা করিয়াছে, এবং করিবে। কত জ্ঞানী পণ্ডিতগণ বলিয়া গেলেন যে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না কত লোক বলিয়া গেলেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া কোন লাভ নাই, কত বড় বড় লোক বলিলেন নিত্যনির্ব্বিকার ব্রহ্ম যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে মানুষের চেষ্টা বা সাধন বৃথা—কিন্তু ধর্ম্মজগৎ কোন পণ্ডিতের কথা শুনিয়া স্তব স্তুতি সাধন ভজন পূজা প্রার্থনা করা বন্ধ করেন নাই। চিরদিন ধর্ম্ম মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবে।

অতি উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের কথাও যেমন অধিকদিন ধর্ম্মপিপাসুকে তৃপ্ত করিতে পারে না সেইরূপ প্রস্তর, কাষ্ঠ, ধাতু বা ঐ সকল উপাদানে গঠিত মূর্ত্তিও প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুকে তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। এই উভয়বিধ আত্যন্তিক অবস্থার মধ্যে মনুষ্যকে স্থিতি করিতে হইতেছে। যাহারা অজ্ঞানতাবশত জড়বস্তু, নশ্বরবস্তু, বা সৃষ্ট জীবকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে নাই, কেবল আপনাদিগের ভাবে ও বিশ্বাসে একটা উপাস্য স্থির করিয়া লইয়া তাহার উপাসনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভাব ভক্তি চরিতার্থ করিতেছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ উচ্চ ধর্ম্মাক্রান্ত নরনারীর সহিত তাহাদিগের বাহ্যিক ভিন্নতা অতি সত্য, কিন্তু যিনি অন্তর দর্শন করেন, যিনি ভক্তবৎসল তাঁহার দৃষ্টিতে হয়ত অজ্ঞান ভক্তের অবস্থা অনেক পরিমাণে উচ্চ ও

শান্তিপ্রদ। মুসলমানসাধকগণের নিকট একটী আখ্যায়িকা শুনা যায় যে, হজরত ইব্রাহিম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ এক ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া একসময়ে তাঁহার মনে একটু অহঙ্কার হইয়াছিল। তিনি একদিন ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তোমার প্রকৃত বিশ্বাসী কে? ঈশ্বর বলিলেন, নিকটে অরণ্য মধ্যে এক প্রাচীন মন্দিরে অন্বেষণ করিলে আমার শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসীকে দেখিতে পাইবে। এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইব্রাহিম তথায় উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে জনমানব কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন যে, ঐ মন্দিরের মধ্যে এক বৃহৎ দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার সম্মুখ ভক্তিভাবে মগ্ন একটি মানুষ বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ যে মূর্ত্তিপূজক ইহাকে তুমি বিশ্বাসিশ্রেষ্ঠ বলিলে কেন? ঈশ্বর বলিলেন, তুমি ইহার সম্মুখস্থ মূর্ত্তি দেখিয়াছ, আমি ইহার অন্তরের বিশ্বাস দেখিতেছি। এই গল্পটিতে বাহিরের ও অন্তরের দর্শনের প্রভেদ উত্তমরূপে দেখাইতেছে। যদি জ্ঞান উজ্জ্বল না হয়, অন্তর শুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কেবল মূর্ত্তিপূজাতে বিশ্বাস না থাকিলেই কোনরূপ শ্রেষ্ঠতা হয় না।

ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। পূজা উপাসনার পদ্ধতি, ঈশ্বর ও জীবাত্মা বিষয় জ্ঞান, নীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সকল বিষয় ধর্ম্মের অঙ্গ এবং ধর্ম্মের বাহ্যপ্রমাণ মাত্র। যদি অন্তরে সত্যধর্ম্ম প্রতিভাত না হয় তাহা হইলে বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতাদির শ্রেষ্ঠতা সে অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না। যতদিন আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, যতদিন ভগবান্ লীলাময় ব্যক্তিরূপে, মানুষের পিতা মাতা গুরু বন্ধু উপাস্য ও আনন্দময় শেষগতিরূপে প্রকাশিত না হন ততদিন অপৌত্তলিকতার অভিমান করা লজ্জার বিষয়। যাহার অন্তরে সত্যধর্ম্ম নাই সে পৌত্তলিক কি অপৌত্তলিক তাহার সংবাদ লওয়া বৃথা। মূর্ত্তিপূজা শ্রেষ্ঠ পূজা নহে, একথা সকলেই জানে। যাহারা মূর্ত্তিপূজা করিয়া ধর্ম্মভাব চরিতার্থ করে তাহাদিগের মনপ্রাণ মূর্ত্তিদর্শনেই তৃপ্ত হয়—তাহাদের দর্শন অন্যের দৃষ্টিতে জড়দর্শন বা অত্যন্ত স্থূলদর্শন মনে হইবে, কিন্তু যে সত্যই মূর্ত্তিতে আপনার উপাস্য দেবতাকে দর্শন করে—সে তাহার ভক্তি বিশ্বাসের বস্তুকে উপস্থিত দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। যাঁহারা উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়া সত্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন, তাঁহারা যতদিন তাঁহাদের উপাস্য দেবতা সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বরকে উপাস্য দেবতা স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এখন প্রয়োজন যে তাঁহারা অশিক্ষিত সরল পৌত্তলিকের চক্ষুর সম্মুখ উপস্থিত উপাস্য দেবতার ন্যায় তাঁহার নিরাকার উপাস্য দেবতাকে বিশ্বাসচক্ষে দর্শন করেন। যতদিন নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন না করা হয় ততদিন ঠিক

উপাসনা করা হইতেছে বলা যায় না। যাহারা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া নিরাকার সত্য ব্যক্তি স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা পৌত্তলিকের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করিতে যদি শিক্ষা না করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগের পক্ষে পৌত্তলিক আদর্শ উপাসক হইলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে ছোট মনে করিতে পারেন না। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মকে যেমন মান্য করেন অন্য সকল সাত্বিক ধর্ম্মপথাবলম্বীর ধর্ম্মকেও শ্রদ্ধা করেন। পৌত্তলিককে যিনি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অদূরদর্শী।

জগদীশ্বরকে অনাদি অনন্ত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা যে উচ্চ ও সত্যধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মনে রাখিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের উপযোগী বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিতে হইবে। মনুষ্য-হস্ত-রচিত পুত্তল বা মূর্ত্তি, নদী, পর্ব্বত, তিপ, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উপাস্য হইতে পারে না, কিম্বা মনুষ্য মনুষ্যের উপাস্য দেবতা বা পরিত্রাতা হইতে পারে না, ইহা বুঝা কঠিন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান সময়ের সকল পুরুষ ও সকল নারীই এ সত্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা জানিয়া বুঝিয়াও এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তু বা ব্যক্তির পূজা করেন তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন, তাঁহারা অসরল বা ভণ্ড অর্থাৎ ধর্ম্মের নাম করিয়া লোকের প্রশংসা বা মান্য পাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধকের শ্রেণীতে গণ্য করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পৌত্তলিকতা কথার কথামাত্র। ধর্ম্মহীন লোকেরা কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য পুত্তল পূজা করে, তাহারা নাস্তিক। কিন্তু যদি কোন এরূপ সরল বিশ্বাসী থাকেন, যিনি মূর্ত্তিতেই জীবন্ত জাগ্রত পরিত্রাতা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া পূজা করেন তিনি অন্য সকল উপাসকের মান্যের পাত্র হইবেন। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে পৌত্তলিক বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নহে। প্রকৃত বিশ্বাসী পৌত্তলিক শ্রদ্ধার পাত্র এবং কপট পৌত্তলিক অপর সকল ধর্ম্মহীন লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত এবং কৃপার পাত্র।

আমাদের গল্প।

আমাদের একটা বদনামই আছে যে আমরা যেখানে যাই সেখানে কেবল দশ জনের সঙ্গে দেখা হইবে গল্প করিতে পারিব এই আশা করিয়াই যাই। আমাদের বর্ক্তৃতা শুনিতে যাওয়া ঐ জন্য আর মন্দিরে যাওয়াও ঐ জন্য। এই বদনাম ছেলেরা আমাদের রাগাইবার জন্য বলিলেও সহজ ভাবে দোষ স্বীকার করিতে হলে বলিতে হয় যে সত্য সত্যই গল্প করা রোগটা আমাদের আছে। অবশ্য ছেলেদের আমাদের দোষ ধরতে অন্য কোন অধিকার নেই, কেন না তাঁরা যদি আমাদের মত বাঁধা থাকতেন হপ্তায় একবার করে কি দুবার করে বেড়াতে

পেতেন, তাহালে তাঁদের গল্প করিবার অভ্যাসটা কি রকম হতো তা ভাব্বার বিষয়। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, কোন এক জায়গায় একদিন বেড়াইয়া আসিয়া আবার দু তিন দিন পরে যাইতে চাইলাম; বাবা বলিলেন, "রোজ রোজ আবার যাওয়া কি?" কিছু বলিলাম না, কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা বাবা রোজ রোজ কেন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যান, আমাদের বুঝি ইচ্ছা করেনা"? বাবার কানে এ কথা উঠিল; তার পর হতে ওরকম ভাবের কথা আর কখনও বলেন নাই।

আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে ও হচ্ছে এটা সকলেই অনুভব কচ্ছেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নয় বরং খুব স্বাভাবিক; কিন্তু এক পরিবর্ত্তন যে আর এক পরিবর্ত্তনের পথ খুলে দেয় জীবনের দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় সেটাও ভাব্বার কথা। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার Suffragist দের সম্বন্ধে মত কি?" আমার খুব হাঁসি পায়-মাথা নেই তখন আবার মাথা ব্যথা কিসের? একধারে ছবি দেখছি অধিকার পাবার জন্য, "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন", অন্য ধারে দেখছি ক্রমাগত ডাক পড়ছে এগোও না, এগোও না, কে এগোবে? উত্তর আসছে ওসব আমাদের দ্বারা হবে না বাপু। ওকি মেয়েদের কাজ। আগেই বলেছি অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে, আরও পরিবর্ত্তনের দরকার হলে তাও হবে। যে অধিকার হতে আমরা বঞ্চিত তা আমরা নিশ্চয়ই পাব, পাব কি পাচ্ছি, আমাদের ও রকম যুদ্ধ করবার দরকারও হবে না। আমরা যদি অগ্রসর হই ভাইদের, বাবাদের বোঝা একটু কমে যায়। তাঁরা আহ্লাদের সঙ্গে আমাদের পথ ছেড়ে দেবেন। সেদিন একজন সিন্ধি ভদ্রলোক বলছিলেন যে, "মিষ্টর সিরাজী এক জন গোঁড়া Suffragist;" কিন্তু Mr. Shirazir লেকচার শুনলাম এবং "গোঁড়া Suffragist" এরও বই পড়লাম, দেখলাম Mr. Shirazi আমাদের বেশী বাড়ালেন। তিনি গাছ ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে বল্লেন, স্ত্রী জাতিই বেশী ফল প্রসব করে ও কাজে আসে; কিন্তু Suffragist কি চাইছেন? তিনি স্ত্রী ও নারী যে দুই একেবারে "এক" "সমান" তা একটুও বলছেন না, তিনি বলছেন মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে না থাকিলে চলবে না, নূতন যুগে মেয়েরা পুরুষদের, কিম্বা পুরুষরা মেয়েদের সহানুভূতির চখে দেখবেন না, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে সহকর্ম্মী মনে করবেন এবং সহকর্ম্মী হতে গেলে যে অধিকার পাওয়া দরকার সেই সব নেওয়া হচ্ছেনা বলেই মেয়েদের এই যুদ্ধ। এঁরা যা বলছেন তাকি আমরা অনেক দিন হতে আমাদের দেশে শুনছি না? এখন থেকে শুনবার নয়, কিন্তু আমাদের ভাব্বার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবারও সময় হয়েছে। Suffragistদের গালাগালি দিলেও গৌরব হবেনা কিম্বা নিজেদের প্রশংসা শুনে সুখী হলেই চলবেনা। ইদানীং ক্রমাগত আমাদের প্রশংসাই শুনে আসছিলাম,

আর মনে হচ্ছিল ছেলেরা বেশ অল্প বার-করেছেন। যত প্রশংসা করবেন, যত আমাদের কাছ হতে প্রত্যাশা করবেন, ততই আমাদের দোষগুলো বেরিয়ে পড়বে; বেশ ভাল জব্দ করবার পন্থা।

বদনাম ও সুনামের ধারে বেশী দৃষ্টি না করে আমাদের অভ্যাস গুলোর কতটা ভাল কতটা মন্দ সেই বিষয়ে আলোচনা করে একটু একটু ছাড়তে চেষ্টা করলে খুব ভাল হয়। আমাদের গল্পর কথাই আরম্ভ করেছি। গল্প করাটা যে খুব খারাপ কথা তা একেবারেই নয়, কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের সময় ও স্থান আছে। যখন বাড়িতে কোন অতিথি অভ্যাগত আসিয়াছেন, কিম্বা বড়ীর ছেলেরা খাটিয়া খুটিয়া বাড়ী এলেন, কিম্বা বাড়ীর ছোট ছেলের একটু গল্প করিতে আসিল, তখন যদি আমরা গম্ভীর হইয়া একখানি বই নিয়ে বসে থাকি তাহলে কেমন লাগে? আমাদের যদি সকলকে আনন্দিত করবার—সুখী করবার সুযোগ বেশী করে দেওয়া হয়েছে, আমরা তা বদনামের ভয়ে করবই বা না কেন? খুব বেশী করে করবো এমন করে যে অচেনা চেনা হয়ে যাবে, অসুখী সুখী হয়ে যাবে, প্রাণের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাড়ীতে যখন ছেলেরা পড়ছেন সেই সময় নিজের পড়া দূরের কথা, গিয়া গল্প জুড়িয়া বসিলাম, বক্তা বক্তৃতা দিতে-ছেন তাঁহার সামনে বসিয়াই অনায়াসে ফিস্ ফিস্ করিয়া "তোমার বৌ কেমন" "কতদিন দেখা হয়নি" ইত্যাদি চলিতে থাকিবে। এরূপ গল্প অবশ্য ত্যাগ করতে হবে।

উৎসব চলিয়া গেল, প্রতি উৎসবের সময় একটা জিনিস খুব বেশী করে লাগে, সেটা মন্দিরে আমাদের গল্প। উৎসব মানেই আনন্দ, উৎসবে গম্ভীর সম্ভীর হইয়া সকলে আসিবেন ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নয়, কিম্বা উপাসনার আগে কি পরে একেবারে কথা বলিবেন না তাও নয়, কিন্তু তারই ভিতর খুব একটা সংযম থাকা দরকার, আমরা খানিকটা গোলমাল করে আনন্দ নিতে চাই কি? অনেক ভগিনীরা আসিয়া যোগ দেন বলিয়া যায়গাও একটু অকুলান হয় ও যাহাতে বেশী লোকে যোগ দিতে পারেন সেজন্য আরও যায়গা বাড়াইবার চেষ্টা করা হয় ও হচ্ছে। কিন্তু উপরে নবীনাদের দুম্ দুম্ করিয়া ছাত পেটা গোছ করিয়া চলা এবং প্রবীণদের কলরব, উপরে তো প্রায় কেহ যোগই দিতে পারেন না, নীচেও বিরক্তি-কর হইয়া উঠে বোধ হয়। তখন কি আমরা সব নীরবে করি, কথা বলি, হাঁটি? প্রশংসাগুলি তখন মনে পড়ে না? আর গল্প করার বদনাম মনে পড়ে না? নবীনা-দের বারণ করা যায় কিন্তু মাতৃস্থানীয়াদের বলাও দায়। আজকালকার মেয়েদের বদনামই আছে। কতকগুলি কথা আলোচনা করিতেও কষ্ট হয়, কিন্তু নিজেরা না বলিলে অন্য দশজনে বলিতেছে ও আলোচনা করছে, তখন নিজেদের দোষ স্বীকার করে শুধরাইতেই বা চেষ্টা কেন না করিব? অনেক সময় এমন দেখা

গিয়াছে যে. প্রচারকদিগের স্ত্রীরাই যখন তাঁদের স্বামীরা লোকেদের কাছে ভগবানের মহিমা প্রচার করছেন তখন শুনা, যোগ দেওয়া দূরের কথা গোল বাঁধিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁরা যে সব সময় এ রকম করেন তা নয়, কিন্তু একবার হোক কি আধবারই হোক এতে যে আমাদের কত অপরাধ হয়ে যায় তাকি আমরা ভেবে দেখি? মনে হয় আমরা যদি একটু সাবধান হয়ে চলিতাম তাহলে পৃথিবী আরও কত সুখের হত। আমরা এগিয়ে দেওয়া, সহজ করে দেওয়া, সাহায্য করা দূরের কথা, অনেক সময় কি পেছনে টেনে আনি না? উপাসনা আরম্ভ হবার পর আমাদের যদি নেহাত কথা বলা দরকার হয় তাহলে আমরা একটু বাহিরে গিয়া কথা বলিয়া আসি, কিম্বা আমাদের যাদের ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাঁরা যদি এমন যায়গায় বসি যে দরকার হইলে সহজে বাহিরে যাইতে পারি এবং আমরা যাহারা কেবল ঘুমাইবার জন্য কিম্বা গল্প করিবার জন্য আসি তাহারা যদি বাড়ী রহিয়া যাই তাহলে উৎসবের আনন্দ হইতে অন্যদের বঞ্চিত করা হয় না। উৎসবে হাঁসি আনন্দভরা মুখ দেখিতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া উপাসনার সময় গল্প করাতে কি আমাদের আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পায়?

আমাদের একসঙ্গে খাটবার ডাক চারিধার হতে আস্‌ছে। পারবো না, বলে চুপ করে বসে থাকাল হবে না কিন্তু আমাদের নিজেদের যা দোষ দুর্ব্বলতা দূর করতে চেষ্টা কর্‌তে হবে, উপযুক্ত হতে চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের অসুবিধার কথা ভেবে যদি অন্যেরা আরও বেশী যায়গার বন্দোবস্ত করেন তাহলে আমাদেরও কি আমাদের গল্প বন্ধ করে অন্যদের সাহায্য করবার কথা ভাবতে হবে না?

স।

প্রভাতে।

(বালিকার রচনা।)

১।

পূরব আকাশে অরুণ প্রকাশে
প্রভাত কিরণ ছুটিছে কিবা!
রক্তিমবরণ মানসমোহন
ঘোষিছে সকল আসিছে দিবা।

২।

আলোক পাইয়া সঙ্গীত ধরিয়া
উড়িছে আকাশে প্রভাত পাখী;
কুসুম ফুটিয়া সৌরভ ছুটিয়া
তোষিছে কেমন মানস আঁখি!

৩।

পাথারে প্রান্তরে সানন্দ অন্তরে
ছুটিছে রাখাল গোপাল লয়ে
তৃণপূর্ণ গোঠে ধেনুপাল ছোটে
কোন দিকে আর দেখেনা চেয়ে।

৪।

কৃষকের দল সঙ্গীত সরল
গাইতে গাইতে ছুটেছে সবে।
প্রভাতের পাখী প্রভাকর দেখি
গাইছে সুদূরে মধুর রবে।

৫।

প্রভাতের শোভা কিবা মনোলোভা
পকৃতির কিবা মধুর হাঁসি,
সরস সলিলে বায়ুর হিল্লোলে
দোলে থরে থরে কমলরাশি।

৬।

প্রকৃতির খেলা পভাতের মেলা
এসবে তাঁহার পেমের রেখা,
এসবে কেবল হেরি অবিরল
মহিমা তাঁহার রয়েছে লেখা।

বিধাননন্দিনী মজুমদার।
কোচবিহার।

প্রাচীন মিশর ও ভারত।

(গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে
'দেবালয়' এর অধিবেশনে পঠিত)

প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা একটু মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে একই যুগের সমস্ত সভ্যজাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত থাকিয়াও প্রায়ই একই ভাবে মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালনা করিয়া থাকে। ফলে সমসাময়িক সভ্যসমাজসমূহে প্রচলিত নিয়মাবলীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়; তাই আমরা প্রাচীন গ্রীকযোদ্ধা ও ভারতীয় ক্ষত্রিয়বৃন্দের সমসাময়িক আইনে অনেকগুলি ধারা একই রকম দেখিতে পাই। এইরূপ প্রাচীন জাতি সমূহের পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও চাল চলনে, এমন কি আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত ব্যাপার সমূহেও অনেকটা সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে যে জাতি যত প্রাচীন সে তত অধিক সংখ্যক দেবদেবীর পূজা করে। এই সকল দেবদেবীর অনেকেই প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত; কতকগুলি প্রাকৃতিক বস্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সর্ব্বদা জগতের উপকার করিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহারা পূজ্য; আবার কতকগুলি প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা অথবা জীববিশেষ দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে, কেননা তাহারা সহজেই মানব মনে ভীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ। এইরূপেই একদিকে ভারতে গঙ্গাপূজা ও প্রাচীন মিশরে নীল নদের পূজার সৃষ্টি, এবং অপর দিকে ভারতে নাগপূজা ও মিশরে কুম্ভীর পূজার প্রচলন। মিশরের সভ্যতা ১০,০০০ বৎসরের এবং মিশরই জগতে সর্ব্বপ্রথম উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল—ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এই আদিম সভ্যদেশের সঙ্গে ভারতের রীতিনীতির সাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের স্বতঃই মনে হয় ভারতীয় সভ্যতাও মিশরের সমসাময়িক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতাকে ৪,০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে

সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। যদিও এ বিষয়ে আমাদের জোর করিয়া কিছুই বলিবার যো নাই, তথাপি অন্যান্য দেশের ন্যায় ঐতিহাসিক প্রমাণ ভারতে কেন নাই তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথমতঃ ভারতবাসী চিরকালই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছে, পার্থিব জিনিষ তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই; সুতরাং এই পৃথিবীতে আত্মস্মৃতিরক্ষার একটা স্পৃহাও তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই। মিশরের ইতিহাসে দেখিতে পাই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইতে ব্যস্ত। ভারতে ও মিশরে এই প্রভেদ, এবং এই প্রভেদের ফলে আজ মিশর পিরামিডের গৌরবে গৌরবান্বিত, আর ভারতের সাহিত্য ও দর্শনের সম্মুখে জগতের সমস্ত সভ্যজাতি অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়তঃ মিশরের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা স্মৃতিরক্ষার সহায়, আর ভারতের জলবায়ু তাহার প্রতিকূল। মিশরের পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপিমালা আজও ৮ হাজার বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে, কিন্তু ভারতে দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন গিরিলিপি-গুলিও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ভারতের সভ্যতা আদিম না হই-লেও ইহা যে অতি প্রাচীন সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। এই দুই প্রাচীন জাতির অধিকাংশ বিষয়েই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পূজাপদ্ধতি ও পৌরাণিক ইতিহাসে।

যেমন রাজ্যশাসনে দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন, তেমনি আমাদের পৌরাণিক দেবতাদের প্রত্যে-কেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, এবং তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগের সুশৃঙ্খলার জন্য দায়ী। যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনি কেবল সৃজনই করিবেন; বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, তাঁহার কর্ত্তব্য জগত-পালন; আর মহেশ্বর ধ্বংসকর্ত্তা, অর্থাৎ যিনি পুরাতন—যাহার কর্ত্তব্য শেষ হই-য়াছে—তাহার ধ্বংস সাধন করেন। মিশরের দেবতারাও সর্ব্বদা আপন আপন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত।

এদেশে সন্তান জন্মিবার ষষ্ঠ দিবস রাত্রিকালে পূজা দেওয়ার প্রথা আছে। সেই দিন বিধাতাপুরুষ নবজাত শিশুর অদৃষ্টলিপি নির্ণয় করিয়া যান, তদনুসারেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হয়। মিশরেও আমরা ঠিক এইরূপ একটা প্রথা দেখিতে পাই। 'ম্যাস্‌কনিত্‌' প্রত্যেক শিশুর জন্ম সময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রসূ-তির যন্ত্রণা দূর করেন, আর 'রনিনিত্‌' নবজাত শিশুর নামকরণ ও লালনপালনে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে একস্থানের কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া যান।

আবার দেখুন ভারতে বিষ্ণুরূপে গোজাতির পূজা হয়। বিষ্ণুরূপে গোজাতির পূজার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই, অন্ততঃ আমাদের

ইহাই মনে হয়, যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, গোজাতিও আমাদের মহদুপকারী সুতরাং পালনকর্ত্তা। অতএব গোজাতি বিষ্ণুরই প্রতিবিম্ব। মিশরেও গোজাতির পূজা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে সমস্ত গোজাতিরই পূজা হয়, কিন্তু গাভীই বিশেষভাবে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। মিশরেও প্রথমাবস্থায় গাভীরই পূজা হইত। কালক্রমে ষাঁড় ও গাভী উভয়েরই পূজা প্রচলিত হয়। মিশরবাসী বিশ্বাস করিত যে ষাঁড় মানব ও দেবতার জন্মদাতা এবং গাভী উহাদের গর্ভধারিণী। মিশরবাসী আরও বিশ্বাস করিত যে গাভীর মস্তক জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের উপরি-ভাগে অবস্থিত; আমরা তারকাশোভিত যে নভোমণ্ডল দেখিতে পাই তাহা উহারই দেহের নিম্নভাগ; পৃথিবীর এই অপরিমেয় জলরাশি উহারই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, এবং উহার পদচতুষ্টয় এই বিশ্বজগতের চতুষ্কোণে অবস্থিত চারিটী স্তম্ভ বিশেষ। মিশরে যে কোন ষাঁড় বা গাভীর পূজা হয় না। তাহাদের বিশ্বাস দেববংশসম্ভূত গাভী বা ষাঁড় কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করে। মিশরবাসী সেই সকল চিহ্ন দেখিলে তাহার পূজনীয় গো-দেবতা নির্বাচন করে।

অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা আদিত্য-দেবের পূজা লইয়াই মিশরে অধিক মারামারি। যেখানে একই সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হয়েন। কেহ কেহ সূর্য্যকে হোরাস্ নামে পূজা করে; আবার সেখানে নভোমণ্ডলকেই 'হোরাস্' বলে, সেখানে সূর্য্যের পূজা হয় 'রা' নামে। হোরাসের দক্ষিণ চক্ষুর নাম 'রা' অর্থাৎ সূর্য্য এবং বাম চক্ষুর নাম চন্দ্র। হোরাস্ তাঁহার এই সূর্য্য-চক্ষু উন্মীলন করিলেই রাত্রি প্রভাত হয়, এবং বন্ধ করিলেই সূর্য্যও দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ডুবিতে থাকে। কোন কোন স্থলে নভোমণ্ডলকে দেবীরূপে পূজা করে। এই দেবীই 'রা' এর জননী, আর ভূমণ্ডলস্থ দেবতা তাঁহার জনক। প্রতিদিন তাঁহার জন্ম মৃত্যু হয়—সূর্য্যোদয় তাঁহার জন্ম ও সূর্য্যাস্ত তাঁহার মৃত্যু। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন পৃথিবীর পূর্ব্ব-প্রান্তে একটী উজ্জ্বল ডিম্ব অবস্থিত এবং রাজহংসীরূপী দেবতা তাহাকে তা দিতে-ছেন। ক্রমে সেই ডিম্ব ফুটিয়া সূর্য্যের উৎপত্তি হয়, এবং সূর্য্য তাঁহার অফুরন্ত কিরণরশ্মি লইয়া জগতে বিচরণ করিতে থাকেন। ডিম্ব হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকবৃন্দ সূর্য্যকে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সম্বন্ধে আরও একটা মত প্রচলিত আছে। সূর্য্য দেবতা হইলেও মানুষেরই ন্যায় জন্ম মৃত্যুর অধীন। প্রতিদিন তাঁহার জন্ম মৃত্যু হয়। দেবী নুইতের পাদ হইতে তাঁহার জন্ম হয়, এবং সারাদিন কিরণ বিস্তার করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে যখন তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন তখন দেবী নুইত্ই পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রাস করেন।

আকাশপথে সূর্য্যের বিচরণ সম্বন্ধেও একটা মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সক্তিত্ নামক ক্ষুদ্রতরী উদয়ের সময় বিশ্বমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে উপস্থিত থাকিয়া আদিত্যদেবকে গ্রহণ করে এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তরী বাহিয়া তাঁহাকে খ-মধ্যে লইয়া আসে। সেখানে 'ম্যাজিত্' নামক দ্বিতীয় তরী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সায়াহ্নে 'হাদিজ' অথবা পিতৃলোকের দ্বারদেশে আনিয়া উপস্থিত করে, এবং তখনই তাঁহার অস্ত হয়। সারারাত্রিও নৌকাপথে বিচরণ করিতে করিতে ঠিক প্রাতঃকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সক্তিতের নিকট উপস্থিত হয়েন। ইহাই দিবারাত্রি সম্বন্ধে মিশরবাসীর অভিমত।

সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে উহাদের মত কি, এবং তাহার সহিত আমাদের পৌরাণিক মতেরই বা কি সামঞ্জস্য আছে, এখন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রচলিত রাহুর গল্প আপনারা সকলেই অবগত আছেন। মিশরেও ঠিক এমনি একটি গল্প প্রচলিত আছে। আদিত্যদেব সুরধামের মধ্যদিয়া প্রবাহিত মিশর-মন্দাকিনী নীলনদবক্ষে অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার ক্ষুদ্র তরী নিরাপদে বাহিয়া চলিয়া যান, আর উভয়তীর হইতে দেবতাগণ তাঁহার মঙ্গল-ধ্বনি করিতে থাকেন। কিন্তু সময় সময় 'ঋ্যাপপি' নামক নাগবেশধারী প্রকাণ্ড রাক্ষস তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। 'ঋ্যাপপি' গভীর জলরাশির মধ্য হইতে অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া আদিত্য-দেবের সম্মুখীন হয়। দূর হইতে উহাকে দেখিয়াই আদিত্যদেব ও তাঁহার অনুচরবর্গ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও চলিতে থাকে। ক্রমে আদিত্যদেব হত-বীর্য্য ও নির্জ্জীব হইয়া পড়েন। এই সময় সূর্য্যের প্রখরতা কমিয়া যায়, এবং মর্ত্ত্যবাসী প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে। তাহারা তাহাদের প্রিয়দেবতার সাহায্য-কল্পে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। শত্রুকে ভয়প্রদর্শন হেতু তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, এবং ক্রোধে অস্থির হইয়া নিজ বক্ষে করাঘাত করে, ও তাহাদের আয়ত্তাধীন সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র এমন কি যে কোন ধাতব পাত্র সংগ্রহ করিতে পারে তাহা বাজাইতে থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শত্রু পলায়ন করিবে। যাহাই হউক আদিত্যদেব কিছুকাল নিস্তেজ থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববল প্রাপ্ত হয়েন, এবং আপন গন্তব্য পথে চলিতে থাকেন; আর এদিকে ক্ষতবিক্ষতদেহ অপপি দেবতাদের মায়াবলে শক্তিহীন হইয়া অনন্ত জলধিতলে নিমগ্ন হয়েন।

চন্দ্রের ক্রমবৃদ্ধি ও গ্রহণ সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। আদিত্য-দেবের শত্রু মাত্র একজন কিন্তু চন্দ্রের শত্রু তিনজন—কুম্ভীর, সিন্ধুঘোটক ও শূকরী। চান্দ্রমাসের ১৫ই তারিখ অর্থাৎ পূর্ণিমার শেষ মুহূর্ত্তে হোরীসের চন্দ্রচক্ষু শূকরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রাক্ষসী সেই চক্ষু উৎপাটন করিয়া মিশর মন্দাকিনী

স্বর্গীয় নীলনদবক্ষে নিক্ষেপ করে, এবং সেখানে চন্দ্র আস্তে আস্তে ডুবিতে থাকে ও শেষে একেবারে ডুবিয়া যায়। ইহাই হইল অমাবস্যা। কিন্তু আদিত্যদেব এই ভ্রাতৃবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্ধার সাধন করেন এবং হোরাসকে তাহা দান করেন। চন্দ্রও আপন বাসস্থানে ফিরিয়াই ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বতেজ ও বীর্য্য লাভ করিতে থাকেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। মিশরবাসী এই ভাবে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, ও পূর্ণিমা অমাবস্যা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

চন্দ্রের যে তিনজন শত্রুর কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে শূকরীই প্রধান। সে সর্ব্বদাই চন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা ও সুযোগ অনুসন্ধান করে। চন্দ্রও শত্রুভয়ে সর্ব্বদা রক্ষিবৃন্দে পরিবেষ্টিত থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁহার রক্ষিবৃন্দ একটু অন্যমনস্ক হয় তখনই রাক্ষসী তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। এই সময় চন্দ্রের আলোক হঠাৎ নিভিয়া যায়। ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। তারপর দেবতাদের সমবেত চেষ্টার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রদেব রাক্ষসীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে মিশরবাসীর এইরূপ ধারণা।

ক্রমশঃ

শ্রীগৌরসুন্দর রায়।
দেবালয়, চৈত্র, ১৩.৯।

নূতন যুগ *।

পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ আমরা মানচিত্রে দেখিয়াছি কিন্তু এই সব দেশের ইতিহাস আমরা জানিতাম না। মুসলমানরা আসার পর এই সব দেশের ভয়ঙ্কর দুরবস্থা হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তাও আমরা জানতাম না। কিন্তু শিরাজির আসাতে তাঁদের বিষয় কিছু কিছু আমাদের একটা নতুন দিক খুলে গেছে তাঁদের ওখানে যে বাহাই Movement হয়েছে তার বিষয় আমরা তাঁর কাছ থেকে অল্প অল্প জানিতে পারিয়া উপকৃত হইয়াছি। অনবরত যে পৃথিবীর একটা পরিবর্ত্তন ঘটছে তা কি কখনও অবিশ্বাস করা যায়? যেমন কত সময় একটা সুন্দর কবিতা পড়তে পড়তে মনের পুরণ ভাব গুল চলে গিয়ে একটা নতুন ভাব জেগে উঠে।

ইউরোপে একসময় New learning-এর বিষয় একটা প্রবল ভাব এসেছিল যার প্রভাবে ১৫০৯ থেকে ১৫২০ মধ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত করেছিল। তখন লোকেরা ইংলণ্ডের একটা মহা পরিবর্ত্তন দেখে ছল।

তারপর ১৮৯০—১৯১০এর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে এ ভয়ানক পরিবর্ত্তন।

"Punch" ব'লে একটা পত্রিকা আছে তাহাতে সমস্ত সময়ের ঘটনা ছবিতে

* ভিক্টোরিয়া স্কুলে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

চিত্রিত করা হয়। যদিও এই পত্রিকায় লেখকেরা অনেক সময় ঠাট্টা তামাসা করে ছবি আঁকেন কিন্তু তবুও পরে পরে ঘটনাগুলি ছবি দেখলে কেমন করে যে ক্রম পরিবর্ত্তন ঘটছে বেশ বোঝা যায়।

Times টাইমস্ কাগজ পড়লে তার ভেতর থেকে একটা ইতিহাস জানা যায়। তা ছাড়া খবরের কাগজ পড়লে তার ভেতর পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে তার বিষয় অনেক জানা যায়।

এই সময় বিশেষভাবে কয়েক খানা বই বেরিয়েছে যার ভেতর সমস্ত জগতের ইতিহাস জানা যায়। যেমন বিশ্বকোষ ও ঐ রকম কতকগুলি ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসও কিছু কিছু জানা যায়। ইতিহাস যত পরিবর্ত্তনের পরিচয় দেয়। পরিবর্ত্তন ক্রমাগত চলেছে আরও কত হবে তা আমরা বল্‌তে পারি না।

যিনি এখন ইতিহাস লিখছেন তিনি বল্‌ছেন যে যে লোক ১৮১০ সালে মারা গিয়েছে সে যদি ১৮৫০ সালে আবার বেঁচে ওঠে তাহলে এই রকম সব পরিবর্ত্তন দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে। কেননা আমরা এখন সচরাচর যে আকাশজাহাজ দেখি তাহা ১৯১০ সালের আগে ছিল না। বর্ত্তমান যুগে আমরা চারিদিকে যে সব মটরকার গ্রামোফোন ইত্যাদি দেখি তাহা যে ব্যক্তি ১৮১০ সালে মারা গিয়েছে সে যদি ১৯০০ সালে এসে দেখে যায় তাহলে এসব দেখে আর এখনকার লোকেদের আলাপ পরিচয় দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।

আগে একটা ক্লাবে গিয়ে দেখা যেত বুড়রা কেউবা ঘুমচ্ছে কেউবা শোক দুঃখের গল্প বলে হা হুতাশ করছে কিন্তু এখনকার Clubএ গেলে সে সবের যে একেবারে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ও একটা বদ্ধভাব ছিল। সে সময় ব্যবসা, বাণিজ্য পরিবার ধর্ম্ম বিষয় কিছু একটা পরিবর্ত্তন করতে হলে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হতো কিন্তু তাঁর ছেলের রাজত্বের সময় এসব কিছু সহজ হয়ে এসেছিল।

এখন যা কিছু আমরা দেখি এবং শুনি তা আগে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এখন যেমন মেয়েরা বসে লেক্‌চার শুনছে এ আগে কখনও সম্ভব ছিল না। Sunday Schoolএর প্রাইজে ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে বসে আমোদ আহ্লাদ কর্‌ছে গান কর্‌ছে এসব দেখে গুরুদাস বানার্জ্জি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন কুড়ি বৎসর আগে এসব তিনি দেখেননি। এই যে ৩০ বৎসরের মধ্যে এত সব বদ্‌লে গেছে দেখে কি মনে হয় না যে পৃথিবীতে কেমন অনবরত একটা পরিবর্ত্তন হয়ে চলেছে?

কিছুদিন আগে যখন পেশওয়ারে বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গেল তখন মনে হল এর চেয়েও বুঝি আশ্চর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই, মনে হল বুদ্ধ আবার নতুন হয়ে জীবন্ত হয়ে জাগ্রত হয়ে এলেন। বুদ্ধের ইতিহাস ভাল করে পাওয়া যায় না বলে মনে হতো এটা একটা গল্প কিন্তু এই অস্থি পাওয়ার পর থেকে সে ভুল ধারণা চলে গেল।

আবার এই যে অধ্যাপক J. C. Bose রোজ রোজ নূতন আবিষ্কার করছেন, দেখাচ্ছেন যে কাঠ গাছ লোহা এদের আঘাত করলে বেদনা অনুভব করে এতে আমাদের আরও জানতে কি ইচ্ছা হয় না?

কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, তারপর অনেকে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন বিলেতের লোকের এসব পড়ে নূতন ভাবের আভাস আসতে লাগলো তাদের বুদ্ধি জ্ঞান সব যেন খুলে যেতে লাগল তাঁরাও বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের একগুণ শক্তি দশগুণ হলো।

যুগে যুগে আমরা পরিবর্ত্তন দেখছি একটা পরিবর্ত্তন আর একটা নূতন পরিবর্ত্তনের পথ খুলে দিচ্ছে নূতন যুগ আবিষ্কারের যুগ, ছেলে মেয়ে যুবা বৃদ্ধ সকলেরই কিছু না কিছু করবার আছে এই পরিবর্ত্তনের যুগে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে প্রত্যেককে নূতন পথ নিতে হবে এবং কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে হবে। মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে বাড়ী পাওয়া গেলে কেউ কেউ গ্রাহ্য করেন কেউ কেউ করেন না। যাঁরা গ্রাহ্য করলেন তাঁরা তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস মাটির নীচে হইতে বাহির করিলেন। সকল পরিবর্ত্তন ও আবিষ্কারকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, ভাবতে হবে, Suggestions দিতে হবে এগিয়ে যেতে হবে।

সেই তুমি।

যবে মোর আঁখি কোণ হ'তে
ঝ'রে পড়ে তপ্ত আসার,
কে তখন সুকোমল করে
মুছায় গো সে জল আমার।
চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ খানি
রাখি যবে উপাধান পরে,
কে আমার শিয়রে বসিয়া
রাখে হাত অতি স্নেহভরে?
সুখে দুঃখে মরম মাঝারে
কার মুখ জাগে স্নেহময়ী,
সংসারের দুর্ব্বিপাক মাঝে
বল কার মুখ পানে চাই?
সেই তুমি জননী আমার
চির স্নিগ্ধ শান্তির নির্ঝর,
তপ্তহিয়া জুড়াবার লাগি
আছে তব সুশীতল কর॥

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।
দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

তুরস্কের সহিত বুলগেরিয়া, মণ্টিনিগ্রো, সরভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা এখনও শেষ হয় নাই। লণ্ডন নগরে সকল ক্ষমতাশালী জাতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা সভা করিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। ফলে মিলিত বিরোধিদল ইচ্ছা করেন না যে ইউরোপে মুসলমানের রাজ্য থাকে। তাঁহারা এপর্য্যন্ত এড্রিয়ানোপল

অধিকার করিতে পারেন নাই অথচ সন্ধি করিবার সময় তাহাও দাবী করেন। তুরস্ক তাহাও দিতে একরূপ প্রস্তুত হইয়াছেন এখন আবার বিরোধিগণ যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় তুরস্কের নিকট হইতে আদায় করিতে চাহিতেছেন। তুরস্ক দুর্ব্বল, তুরস্কের রাজশক্তির মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কোন ভাব প্রবল হইবে তাহা বলা যায় না, এখন তুরস্ককে জব্দ করিবার সময় বটে, কিন্তু তুরস্কের নিকট হইতে যে সকল রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে তাহা বিভাগ করিবার সময় আত্মকলহ উপস্থিত হইবে। এখন সেই সময়ও উপস্থিত। আমরা রাজ্যসম্বন্ধে কোন তত্ত্ব জানি না তবে মনে হয় আজ বারশত বা তেরশত বৎসর মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত রাজাগণ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপে রাজ্য করিবার যোগ্য নহেন একথার কোন মূল্য নাই, তবে খৃষ্টিয়ান জাতিগণ যে সকল আধুনিক সংগ্রাম সহায়ক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। নূতন প্রণালী অনুসারে শাসন করিতে হইবে এবং সকল প্রকার ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অত্যাচার ত্যাগ করিতে হইবে।

বঙ্গের গৌরব আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের কার্য্য শেষ করিয়া আমেরিকায় স্থিতি করিতেছেন। আমেরিকার ইউনিটী নামক পত্রিকাতে তাঁহার চিকাগো মহানগরে স্থিতির বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ গোপনে চিকাগো নগরে প্রবেশ করেন, অপ্রকাশিত থাকিতে চেষ্টা করেন এবং নীরবে চলিয়া যান। তিনি চিকাগো নগরে দুই স্থানে দুইদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বহু পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। একদিনের বক্তৃতার বিষয় "দুঃখের সমস্যা—ভারতীয় আদর্শ অনুসারে" ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন মিষ্টর ঠাকুর সর্ব্বাংশেই কবি, তাঁহার আকৃতি, ভাবভঙ্গী এবং বক্তৃতা সকলই কবিত্বপূর্ণ।

দেশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন যত রাজ্য আছে তাহাদের মধ্যে মহীশূর রাজ্য অত্যন্ত সুশাসিত ও উন্নত। বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ে মহীশূর ভারতীয় ইংরাজ রাজ্য অপেক্ষাও উন্নত বলিতে হয়, কারণ রাজকীয় ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদান হইতে পারে কিনা আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ এখনও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইল মহীশূর রাজ্যে কোন বেতন না লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা এখন এক প্রকার বাধ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। মহীশূরের রাজধানী ত্রিবাঙ্কোরে উকিল মিঃ কে, জি, শেষ আইয়ার একটি অতি উত্তম নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি একটি যুক্তিপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এখন মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিবাহিত বালকগণকে ছাত্ররূপে

গ্রহণ করা বন্ধ করা প্রয়োজন। তিনি দেখাইয়াছেন এদেশের প্রাচীন শাস্ত্র বিদ্যার্থীকে ব্রহ্মচারী ব্রতধারী হইয়া গুরু-গৃহে বাস করিবার বিধান করিয়াছেন। উক্ত নিয়ম স্থাপন করিলে প্রাচীন শাস্ত্রের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এজন্য সকল ব্রাহ্মণগণ এ নিয়ম আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবেন। মিঃ শেষ আইয়ার দেখাইয়াছেন যে অল্পবয়সে বিবাহ হইলে বিদ্যার্থীর মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এজন্য বারানসীর সেণ্টাল হিন্দুকলেজে বিবাহিত ছাত্র লওয়া হয় না, অথচ এ কলেজে বহু-সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে।

আমাদের মনে হয় এইরূপ নিয়ম হইলে শিক্ষা অতি উত্তম হইবে এবং বাল্যবিবাহ চলিয়া যাইবে। বাল্যবিবাহের বিবিধ প্রকারের ভয়ানক অনিষ্টকর ফল জ্ঞাত হইয়া এখন অনেকস্থলে উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আজও শত শত বালক বালিকার বিবাহ হইতেছে এবং তাহারা অকালে আপন আপন উন্নতির পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। অনেক সময়ে দেখিতে পাই পিতামাতাগণ ১০।১২ বৎসরের বালিকাকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেন। বালিকা অতি আনন্দের সহিত নূতন নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল হঠাৎ তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যদি মহীশূর রাজ্যে নিয়ম হয় যে মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে বিবাহিত ছাত্র প্রবেশ করিতে পারিবে না তাহা হইলে আশা করা যায় আমাদের সমাজের নেতাগণ এবং কর্তৃপক্ষগণও এই বিধি এদেশে স্থাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষার পথ খুলিয়া দিবেন এবং বাল্যবিবাহের অপকারিতা হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যগণ কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণরের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এবিষয়ে সকল বেসরকারী সভ্য একমত হইয়াছেন। অপর মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের নগরে ও গ্রামে বালিকা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলিয়াছেন যে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় অনেক বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন এবিষয়ে মাননীয় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল করিলেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় কুকলার সাহেব এ প্রস্তাবে একরূপ সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর মত শুনিয়া দুঃখ হয়। তিনি কি এখনও বঙ্গের বালিকাগণকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন না? বর্ত্তমানে বালিকাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকল শিক্ষিত পরিবারেই উপলব্ধি হইতেছে। এখন যত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বালিকাদিগের উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে যত ব্যয় হইবে সমাজ তাহার উপযুক্ত ফল পাইবে না।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০শ ভাগ] চৈত্র, ১৩১৯। এপ্রিল, ১৯১৩। [৯ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময়, তুমি স্বয়ং নরনারীর সকল ভার বহন করিতেছ ও তাহাদিগের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করিতেছ। তুমি নারীর হৃদয়ে আপনার কোমল প্রেমের এক বিন্দু বিধান করিয়াছ সেই প্রেমের উপর সমস্ত পরিবার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকল ভ্রাতা, স্বামী, সন্তান, পীড়িত, দুস্থ, এই প্রেমের ভিতর দিয়া তোমার নিত্য প্রেমলাভ করেন। আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে, আমাদের পৃথিবীতে নারীর হৃদয়ের ভিতর দিয়া তোমার কত মঙ্গলভাব প্রবাহিত হইতেছে তাহা যদি পরিমাণ করিবার সামগ্রী হইত অবশ্যই তাহা সমুদ্রের জলের ন্যায় অগাধ ও বিস্তৃত হইত। তোমারই লীলায় প্রেম আকার হীন ও প্রেম চিরদিন আত্মগোপন করে। এ সকলই তোমার মঙ্গল নিয়ম কিন্তু তোমার কন্যাগণ তোমার এত প্রেম পাইয়াও তোমার নিত্য ও অনন্ত প্রেম দর্শন করিতে পারেন না ইহা বড় দুঃখের কারণ। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম যে তোমার নিত্য প্রেম হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা ভয়ে, নিরাশায়, সংকীর্ণতায় ও শোকে মুহ্যমান হন। তুমি তাঁহাদিগকে প্রাকৃতিক প্রেমে পূর্ণ করিয়াছ, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তি চক্ষে তোমার পরম সুন্দর অপ্রাকৃত প্রেমমুখ দেখিতে দেও নাই, তাই তাঁহারা প্রেম সাগরে সন্তরণ করিয়াও অপ্রেমের দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন। এই জন্য তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তুমি দয়া করিয়া তাঁহাদিগের নিকট তোমার অপ্রাকৃত অবতীর্ণ প্রেমমুখ প্রকাশিত কর যে তাঁহারা তোমার অনাদি অনন্ত মঙ্গলস্বরূপে নিত্যসুখে সন্তরণ করিতে করিতে তোমার নির্দ্দিষ্ট প্রেমলীলা পরিবারে ও সমাজে সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত ও চিরসুখী হইতে পারেন। আমরা তব পাদপদ্মে

এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণিপাত করি।

——

মহিলাদের জ্ঞান ধর্ম্ম।

সমাজের শ্রেষ্ঠাঙ্গ নারীজাতি। নারীজাতি যে জনসমাজে জ্ঞান ও ধর্ম্মে হীনাবস্থ সে সমাজ জগতে নিতান্ত হীনদশাপন্ন। পুরুষজাতি বল শক্তি ও বাহিরের বিষয়ে প্রাধান্য পাইয়া নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে ইহা মনে করিলে আমরা ভ্রান্তিজালে জড়িত বুঝিতে হইবে। নারী স্বভাবতঃ ঐশ্বরিক ভাবে পরিপূর্ণ। নারীর হৃদয় ঈশ্বর প্রবণ এজন্য নারী হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম সততা ও সহানুভূতি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্যের মধ্যে গমন কর, কিম্বা উন্নত সুসভ্যজাতির দ্বারে উপনীত হও, সর্ব্বত্র রমণী হৃদয় তোমার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিবে; কুত্রাপি তোমার রোগ দুঃখে রমণীর করকমল সেবাব্রত পালনে অলস হইবে না।

ভারতবর্ষ অতি পুরাতন সভ্যজাতির আবাসভূমি। সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতা ও জ্ঞান ধর্ম্ম পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এ হেন ভারতবর্ষ কোন্ মহাপাপে কতকাল হইতে নিতান্ত অধঃপতিত হইয়াছে! ভারতের রমণীগণ জ্ঞানের সমুজ্জ্বলকিরণে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ভারতমহিলা পুণ্যে, ধর্ম্মে এবং সেবাব্রতে হীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। বলিতে পার যে ভারতের রমণীকুলের ধর্ম্ম নিতান্ত কুসংস্কারে বিজড়িত, এবং সেবাও সংকীর্ণতার গণ্ডীতে নিবদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলেও পুণ্যের উজ্জ্বল শ্রী ভারতমহিলার মুখমণ্ডলকে সকল অবস্থাতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং সেবাব্রত পালনের ফল।

ইংরাজজাতি ভারতের আধিপত্য পাইয়া অবধি ভারতরমণীকে অজ্ঞানান্ধকার বিমুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এজন্য ভারতীয় জাতিসকল চিরকাল ইংরাজ জাতির নিকট কৃতজ্ঞতায় অবনত থাকিবে। ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈনাদি সম্প্রদায়বর্গের কন্যাকুল যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় ইংরাজরাজ নানা প্রকারে সে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমান সময়ে নারীশিক্ষার পথ কণ্টকশূন্য করিবার জন্য বিবিধ পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। এদেশের পুরুষগণ নারীশিক্ষার নিতান্ত বিরোধী ছিল। হিন্দুর শাস্ত্রও নারীশিক্ষার তত পক্ষপাতী নহে। প্রচলিত রীতি নীতিসকল স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অধুনা শাস্ত্রের বচনের সে তীব্রতা নাই। রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পুরুষজাতি পাশ্চাত্য আলোক লাভে স্ব স্ব ভগিনী ও কন্যাদিগের মুখ অন্ধকার দূর করা প্রধান কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে অমানিশার অন্ধকার দূর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারীজাতির শিক্ষার শুভদিনের প্রকাশ দেখা যায়। সৌভাগ্যের কথা যে,

এ হেন সুদিনে বঙ্গদেশে মহিলাগণও স্বজাতির দুর্গতি বিমোচনে কর-প্রসারণ করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দী মাত্র কালের পূর্ব্বাবস্থার সহিত অধুনাতন কালের তুলনা করিতে গেলে কত আহ্লাদ এবং আশার তরঙ্গ হৃদয় সরোবরে উত্থিত হয়। ভারতে নারীজাতির জ্ঞানশিক্ষার দ্বার আর অবরুদ্ধ হইবার নহে। এখন চিন্তা হইতেছে নারীর জ্ঞান যদি ধর্ম্মের সহিত সংস্রব শূন্য হয় তবে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রের পবিত্রতা ও প্রাধান্য কোন শক্তিতে রক্ষা করিবে?

ইংরেজ জাতি খ্রীষ্টান। তাঁহাদের ধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্ম। ভারতীয় জাতিগুলি হিন্দু প্রধান। হিন্দুধর্ম্মের নানা শাখা। সে সম্প্রদায় শাখাতে ধর্ম্মপালনের প্রণালী নানারূপ। পাশ্চাত্য প্রণালীতে এদেশে যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা ঐ সকল কারণে কোনরূপ ধর্ম্মের প্রভাব শূন্য। জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞানতা দূর হয়। অজ্ঞানতা না থাকিলে মনের কুসংস্কারও থাকিতে পারে না। হিন্দু বৌদ্ধ জৈনাদি ধর্ম্মে যতভাবে যত কুসংস্কার আছে তাহা শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর অন্তরে স্থান পায় না। এ অবস্থায় জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে কি প্রকারে হইবে? এই কঠিন সমস্যা বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা বিষয়ে উত্থাপিত দেখা যাইতেছে।

বিজ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত ও সুসভ্য পাশ্চাত্য মনুষ্যগণ যে কারণে তদ্দেশে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব পরিশূন্য থাকিবার জন্য যত্ন করিতেন, সেই কারণে নব্য-শিক্ষালোকপ্রাপ্ত লোকের অন্তরে অস্ম-দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থা জন্মে না। তবে ধর্ম্মবিষয়ে বিদ্যালয়ে কোন উপদেশ না পাওয়াতে এবং শিক্ষকদিগকে ধর্ম্মে উদাসীন দেখাতে ধর্ম্মেতে শিক্ষিতদিগের দৃঢ়তা জন্মে না। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে মদ্যপায়ী খ্রীষ্টান শিক্ষকের দৃষ্টান্তে অনেক যুবককে মদ্যপায়ী চরিত্রহীন এবং খ্রীষ্টানও হইতে দেখা গিয়াছে। আনা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে সে অবস্থা অন্তর্হিত হইয়াছে। মদ্যপানে অনেক শিক্ষিত লোক ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিছুকাল এদেশে শিক্ষিত যুবাপুরুষদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে পরাক্রম দেখা গিয়াছে দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা তাহা নাই। শিক্ষিত-গণও অনেকে পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিতে-ছেন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির পূজা ও পুত্তল পূজা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রও এখন অবজ্ঞা বোধ করেন না। কিন্তু ইহা করাতে বুঝা যায় যে শিক্ষাদ্বারা যুবাদিগের সত্যের প্রতি গতি, সচ্চিন্তা ও খাঁটিরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত হয় নাই।

পৌত্তলিকতা ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতির পতনের মূলীভূত কারণ। মানুষ হইয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলকে ঈশ্বরজ্ঞান-পূর্ব্বক পূজা করার মত অধঃপাত জনক পাপ কিছুই নহে। ভারতীয় হিন্দু নরনারী এই পাপে নিমগ্ন। এ পাপ হইতে উদ্ধারার্থ পাশ্চাত্য জাতি, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এদেশে আগমন। এদেশীয় নারীগণ পুণ্য প্রেম ভক্তিতে

পরিপূর্ণ হইয়া এক পৌত্তলিকতার কুহেলিকা ছন্ন হওয়াতে জড়ভাবাপন্ন। জড়ের পূজা করিলে জড় হইতে হয়। উপাস্য লোকের পক্ষে কেবল উপাস্য নহেন, তিনি আদর্শও হইয়া থাকেন। এ জন্য গাছ পাতর মাটি ও মানুষ মনুষ্যের পূজা হইতে পারে না। পুরাতন বাইবেলে মূসার প্রতি ঈশ্বর এজন্য আদেশ করিয়াছিলেন যে "আমার সমক্ষে অন্য কোন দেবতা রাখিতে পারিবে না। তুমি আপনার নিমিত্ত কোন খোদিত মূর্ত্তি অথবা উপরিস্থ আকাশ কিংবা অধঃস্থ পৃথিবী কিংবা তন্নিম্নবর্ত্তী সলিলস্থিত কোন পদার্থের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে না।" এ অনুজ্ঞা পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি। সুতরাং বঙ্গবাসী প্রত্যেক নরনারীর প্রতিও ঈশ্বর উক্ত আদেশ করিতেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা কি জড় জীব উদ্ভিদ দি সৃষ্ট পদার্থ যে সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন সে জ্ঞানও জন্মে না? যদি জ্ঞান লাভে এ জ্ঞানই না হইল তবে জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন কি? আমাদের দেশে নারী জাতির পক্ষে পৌত্তলিকতাকে আন্তরিক অবজ্ঞা করা প্রার্থনীয়। অথচ অদ্যাবধি সমধিকরূপে নারীজাতি দ্বারাই এদেশে পুত্তলের পূজা রক্ষা পাইতেছে। নববক্ত কেশব চন্দ্র দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা এক দল লোককে পৌত্তলিকার প্রশ্রয়ে যেন সমুৎসাহিত করিয়াছেন। কোন কোন শিক্ষিত পদস্থ লোক ঐ ওজুহাতে এখন হিন্দুর কালীমন্দির শিবমন্দিরাদিতেও মস্তক নত করে, আবার ভাবভক্তির সহিত ব্রহ্মোপসনা এবং ব্রহ্মনামকীর্তনেও যোগদান করে। এ যে কতদূর সত্যের অপলাপকারী ও লজ্জাকর ব্যবহার তাহা উঁহাদের মনেই ধারণা হয় না। উঁহাদের বিবেচনাতে যাহারা কেবল ব্রহ্মমন্দিরের গোঁড়া তাহারা অনুদার সংকীর্ণ, এবং উঁহারা অতি উদার ভাবাপন্ন। পৌত্তলিকতার সহিত একেশ্বর বিশ্বাসের সামঞ্জস্য হয় না। যদি শিক্ষাদ্বারা অস্মদ্দেশে নারীদিগেরও এরূপ একটা ভ্রান্তি জন্মে যে পুত্তল পূজা করা দ্বারা জ্ঞানশিক্ষার অপমান হয় না, তবেই দেশের পতনের বীজ দৃঢ়তর রূপে প্রোথিত রহিল। যথাকালে ইহার ফল ফলিবে।

জ্ঞান সত্যের পূজা করে, সত্যের অনুসরণ ও সত্যের অনুসন্ধান করে। তাহার সত্যের প্রতি ভক্তি এবং প্রেমের দিকে গতি শিক্ষা দ্বারা সত্য কি, ন্যায় কি পবিত্রতা কি এবং পুণ্য কি তাহা বুঝিতে না পারিলে শিক্ষা এবং অশিক্ষাতে তারতম্য কি? অশিক্ষিত লোকই গতানুগতিক। সুশিক্ষিত লোক স্বাধীন বিচারশক্তিসম্পন্ন। নারী জাতি ভারতে দীর্ঘকাল হইতে নানা রূপে পরপদানত এবং যে রূপ তর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অভিভাবক প্রতিবেশী গুরু, পুরোহিত সকলেই মূর্খ নারীর বিভীষিকা উৎপাদক। যদি নারী পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষার পরেও সেইরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকেন তবে বরং অশিক্ষাই ভাল ছিল। অনেক শিক্ষিত পুরুষেরও এদেশে

নিতান্ত কাপুরুষের অবস্থা। নারীর ও যদি সেই দশা ঘটে তবে এদেশের দুর্দ্দশা কিরূপে বিমোচিত হইবে? আমরা শিক্ষিতা মহিলাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অসত্য অন্যায়ের অধীনতাবিমুক্ত দেখিতে চাই। অথচ তাঁহারা সত্য ন্যায় এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট খাঁটি রূপে বিনত থাকুন ইহাই প্রার্থনীয়।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ। এদেশে পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যে সামান্য নরনারী সত্য নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অধিকারী নহে। একালে ঈশ্বর দয়া করিয়া সে সংস্কার দূর করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বরের পূজা ও প্রার্থনা করিবার জন্য কোন গুরু, পুরোহিত কিংবা মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যক নাই। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, পাপী পুণ্যাত্মা যে তাঁহাকে সরল ভাবে ডাকে সেই তাঁহাকে পাইতে পারে। এ সুযোগ কি রমণীবৃন্দ ছাড়িবেন? শিক্ষার নামই জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা; ধর্ম্মের নামই সত্যধর্ম্ম। সত্যকে জানাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। সত্য স্বরূপকে পূজা করাই মনুষ্য জীবনের স্বার্থকতা। নারীগণ স্বভাবিক ধর্ম্মভাবের জন্য শিক্ষা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবেন আমরা ইহা বিশ্বাস করি। নারী জাতি জ্ঞান শিক্ষার সহিত ধর্ম্মে অর্থাৎ সত্যধর্ম্মে উদাসী হইবেন না এ আশা কি দুরাশা? আমরা শিক্ষিতাদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সুগৃহিণী।

সমাজে শত সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যত্নে বা অযত্নে শিক্ষিত হইতেছেন বা অশিক্ষিতই থাকিয়া যাইতেছেন। প্রতিজনেই সমাজের কোন না কোন কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে অন্যথা হয়ত আপনার অন্ন বস্ত্রের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতেছে। মাতা প্রকৃতির প্রসবিনী শক্তি হ্রাস হয় নাই, পৃথিবীর অন্নদায়িনী শক্তিও ক্রমবর্দ্ধনশীল। এজন্য আমরা আমাদিগের জন্মের জন্য যেমন গৌরব করিতে পারি না, তেমনই জীবন যাপন করিতেছি বলিয়াও অহংকার করিতে পারি না। আমরা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া সকলেই অযাচিত দানে অনেক পাইয়াছি এবং নিশ্চয় জানি যে যাহা পাইয়াছি তাহা চিরদিন বা দীর্ঘকাল রাখিতে পারিব না। যাহার যে অবস্থায় বর্ত্তমানে স্থিতি তাহার জন্য অন্য কাহাকেও অপরাধী বা গৌরবের পাত্র বলা যায় না কিন্তু আপন আপন অবস্থার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কিরূপ করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা দ্বারা প্রত্যেকেই বিচারিত হইবে। সমাজে যে পুরুষ বা নারী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত তিনি সেই স্থানে আপনার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে বাধ্য। যিনি আপনার কার্য্য উত্তমরূপে করিলেন না, তিনি সমাজের নিকট ও তাঁহার স্বর্গের প্রভুর নিকট অপরাধী হইলেন। এইরূপ অপরাধের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় ও তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়।

আমরা সাধারণত মনে করি যে, যে রাজ্যে যত স্থায়ী সৈন্য আছে, যে রাজ্যে যত নৌসৈন্য আছে, বা যে রাজ্যে যত

মূল্যের বাণিজ্য চলিতেছে. অথবা যে দেশে যত শ্রমজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয় অথবা যে দেশে যত শস্য বা ধাতু সামগ্রী পাওয়া যায় সে রাজ্য তত ধনী। এ সকল সামগ্রী অপত্যক্ষ ভাবে দেশের ধনের পরিচয় প্রদান করে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সার কথা এই যে. যে রাজ্যে যত সুব্যবস্থিত পরিবার আছে সে রাজ্য তত ধনী। পরিবারের উপরেই মনুষ্য সমাজের মূল ভিত্তি স্থাপিত। মনুষ্য শত শত বিভাগে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিতেছেন; আপনার পরিবার ও জন্মভূমিকে হয়ত চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া আপনার ও সমাজের মঙ্গলোদেশে দূরদেশে জীবনপাত করিতেছেন. কিন্তু চির জীবন শীঘ পরিবারের বিশেষত্ব শিক্ষা, শক্তি, প্রভৃতি তাঁহার প্রধান সম্বল হইয়া রহিয়াছে। এজন্য জনসমাজে পরিবারের স্থান সর্ব্বোচ্চ এই পরিবারের অধিষ্ঠান গৃহে। গৃহ পুরুষ ও নারীর মিলনে রচিত। প্রত্যেক স্বামী ও স্ত্রী সমাজের শিক্ষা. শাসন. দৃষ্টান্ত. ধন ও সহায়তা লইয়া আপনাদিগের পারিবারিক জীবন আরম্ভ করেন। গৃহে সুগৃহস্থের যেমন প্রয়োজন সুগৃহিণীর প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে।

পাঠিকাগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে প্রতিগৃহে সুগৃহিণীর একান্ত প্রয়োজন। সকল গৃহিণীই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন এবং সুগৃহিণীর যশ পাইতে ইচ্ছুক কিন্তু সুগৃহিণী কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত দুজনের বর্ণনা একরূপ হইবে না। লক্ষ লক্ষ নারী গৃহিণী হইয়া জীবনযাপন করিতেছেন তাহার মধ্যে সুগৃহিণী বলিলে কতগুলিকে বুঝায় তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কিন্তু এবিষয়ে প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানকালের আদর্শে অনেক প্রভেদ আছে, দেশভেদে ও শিক্ষাভেদে বর্ত্তমান সময়ের আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে ইহা নিশ্চয়। 'মহিলার' পক্ষে এরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু সে আলোচনা অনেক পাঠিকার অনুমোদিত না হওয়াই সম্ভব। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এজন্য আমরা এবিষয়ের কতকগুলি কথা আমাদিগের পাঠিকাদিগের নিকট অদ্য উপস্থিত করিব।

মহাভারতের নিকট শ্রেষ্ঠ নারীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সত্য লাভ করা যায়। মহাভারত বলেন সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতি ধর্ম্ম পালন করিবেন স্বামীর বশ হইয়া সেবা করিবেন স্বামী কঠোর কথা বলিলে. ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও তাঁহার প্রতি প্রসন্নমুখী হইবেন। যে নারী প্রীতমনে বিনীত ভাবে. সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে পতির সেবা ও শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হয়েন। যে নারী অন্নদান করিয়া কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন, যে গুণসম্পন্না নারী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করেন ও মাতা পিতাকে নিত্য ভক্তি করেন. তিনিই ধর্ম্মভাগিনী ইত্যাদি। আমাদের দেশের শাস্ত্রে এরূপ শত শত উক্তি আছে এবং আমাদের দেশের গৃহিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাঁহারা বলিবেন যে ইহাই

অতি সুন্দর আদর্শ, আমাদের সকল গৃহিণী এইরূপ হইলেই অতি সুন্দর হইবে, দেশের দুঃখ অনেকাংশে দূর হইবে। আমরাও বলি যে এরূপ আদর্শ ভাল। উপরে যে কয়েকটি মহাভারতের শ্লোকের সংক্ষেপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক গৃহিণীর চরিত্র তাহার অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। তবে আমরা বলিতে পারি যে আমাদের দেশের প্রত্যেক ভদ্রমহিলা অল্পাধিক পরিমাণে উপরোক্ত গুণভূষণে ভূষিতা আছেন। ফলে প্রাচীনকালে যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এদেশের স্ত্রীগণ সমাজের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এখন দেশের সকল ভদ্রপরিবারে ততদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে এদেশের গৃহিণীগণের যে অবস্থা লাভ হইয়াছে তাহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা তাঁহাদিগকে আমাদের দেশের গৃহস্থ পরিবারের প্রকৃত অবস্থা একবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের গৃহিণীগণ সেবানিরতা ও পতিব্রতা একথা সত্য কিন্তু তাঁহাদের মন কতটুকু? তাঁহারা আপন আপন গৃহ পরিবারের অন্নবস্ত্র ও উপস্থিত অভাব দূর করা ভিন্ন আর কিছু কি জানেন? তাঁহারা পুত্র কন্যার মাতা হইয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন, কিন্তু জননী যে সন্তানগণের স্বাভাবিক শিক্ষয়িত্রী সে কার্য্য কি তাঁহারা সম্পন্ন করিতে পারেন? শিশু-চরিত্র গঠনের ভিত্তিস্থাপন মাতার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের জননীগণ কি সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বাধ্যতা, দয়াশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বীজ শিশুর হৃদয়ে বপন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন? এই বিষয়টির অপরদিক যদি আমরা পরীক্ষা করি অর্থাৎ যদি বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় অবস্থার হীনতার বিষয় যদি আলোচনা করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই না যে আমরা যে এত দরিদ্র, দুর্ব্বল, সাহস ও উৎসাহ হীন হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের নীতিবল ও ধর্ম্মবল যে এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা যে মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে পতিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা আমাদের জননী, ভগিনী ও কন্যাগণের হীনাবস্থার জন্য কতকটা সংঘটিত হইয়াছে। আরও চিন্তা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই যে যেমন নর ও নারী দুজনে মিলিত হইয়া উন্নতিশীল দেশে উন্নতির শিখরে ক্রমে আরোহণ করেন, আমাদের দেশে নরনারী সমাজের যুগল পদের ন্যায় হইয়া অবনতির পথে চলিয়াছেন। কোন বিষয়ে গৃহস্থ নিম্নগামী হইয়া গৃহিণীকে সেই অবস্থায় অবনীত করিয়াছেন অপর কোন বিষয়ে গৃহিণী সংকীর্ণ ভাবাপন্ন হইয়া গৃহস্থকে তদ্‌ভাবাপন্ন করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের অবনতি আমাদের স্ত্রীজাতির অবনতিরও পরিচায়ক। যদি আমাদের গৃহিণীগণ সুগৃহিণী হইতেন তাহা হইলে আমরা এত অধঃপতিত হইয়া পড়িতাম না। একথা বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে আমাদের গৃহিণীগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে সুগৃহিণী হইতে হইবে। গৃহিণীগণের দোষ কীর্ত্তন করা

আমাদের অভিপ্রায় নহে, তবে যাঁহারা মনে করেন যে আমাদের গৃহিণীগণ ঠিক আছেন, তাহাদের আর কোন উন্নতির প্রয়োজন নাই, কেবল পুরুষগণের উন্নতি হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই আলোচনা করিতে হইতেছে।

প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের ও স্পার্টা প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বীরনারী না হইলে বীরমাতা হইতে পারেন না। যে সকল দেশে জননীগণ শিশুকে স্তন্যদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সাহস, বল, বীর্য্য, দেশের জন্য জীবনদানের ভাব প্রভৃতি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সন্তানগণই বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সুশিক্ষিতা নারীগণ আপনাদিগের সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পৃথিবীর মহাপুরুষ ও ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলে জননীর জীবনের ধর্ম্মভাব সন্তানের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। ফলে আমাদিগকে এই সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা যে শস্য ক্ষেত্রে বপন করি নাই আমরা তাহা ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব না। যদি আমরা আমাদিগের গৃহকে সুব্যবস্থিত, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ, ও সুখপ্রদ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের গৃহিণীগণকে সুশৃঙ্খলা, সুরুচি, চরিত্রের মধুরতা ও দৃঢ়তা এবং ধর্ম্মজীবনের সুখদান করিতে হইবে। যদি আমরা সভ্যজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া জ্ঞানের বিমলানন্দ, বিজ্ঞান কৌশলের অভাবনীয় সাহায্য, মানুষের সহিত মঙ্গলময় ভগবানের বিচিত্র লীলা সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে সুগৃহিণীকে কেবল পতিব্রতা থাকিলে চলিবে না। তাঁহাকে পৃথিবীর বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে এবং সহানুভূতিতে হৃদয়টাকে সমস্ত জগতের সহিত এক করিতে হইবে।

আমরা আপনাদের দেশের গৌরব করিতে যাইয়া মৈত্রেয়ী গার্গী খনা লীলাবতী সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি দুই চারিটা নাম উচ্চারণ করিয়া মনে করি জগৎ ধন্য ধন্য বলিবে। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে প্রাচীনকালে নাহয় কোটি কোটি নারীর মধ্যে ২।৪টি নারী দুএক বিষয়ে ভাল হইয়াছিলেন, তাহা হয়ত ব্যক্তিগত বিশেষত্ব মাত্র, কিন্তু এখন যে গৃহে বাস করা হইতেছে, যে গৃহে ভবিষ্যতের নরনারী শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতেছে সে গৃহে কয়জন সুগৃহিণী আছেন যাঁহারা প্রত্যেক বলিতে পারেন যে এদেশে অতীত কালের যাহা কিছু ভাল তাহা তাঁহাতে আছে এবং বর্ত্তমান সময়ের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহার লাভ করা হইয়াছে। আমরা একথা বলি না যে কেবল গৃহিণীগণকে উন্নতি লাভ করিতে হইবে, গৃহস্থগণ যথেষ্ট রূপ উন্নত হইয়াছেন। আমরা কেবল ইহাই দেখাইতে চাই যে বর্ত্তমান সময়ে সুগৃহিণী হইতে হইলে বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ ভাব সকল লাভ করিতে হইবে। পরিবারের বা দেশের

নারীদিগের যে সকল মহদ্‌গুণ আছে তাহা দ্বারা সুগৃহিণী অবশ্য ভূষিতা হইবেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষত্ব, প্রত্যেকের আত্মার অবাধোন্নতি পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের আত্মদানের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেককে লাভ করিতে হইবে। এখন যে গৃহিণী কেবল আপনার গৃহে প্রেম ও সহানুভূতিকে আবদ্ধ রাখিবেন, এখন যিনি পুত্র কন্যাগণকে কেবল মনোমত আহার ও বস্ত্র দান করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবেন, এখন যিনি কেবল ধনমানের আকাঙ্ক্ষা সন্তানগণের মনে রোপিত করিবেন তাঁহাকে সুগৃহিণী বলা যাইবে না। এযুগের সুগৃহিণীর গৃহ দীনদুঃখীর আশ্রয়স্থান হইবে, তিনি সন্তানগণের মনে উদার প্রেম ও জ্ঞানস্পৃহা জন্মাইয়া দিবেন। এমন সুগৃহিণীর গৃহ মঙ্গলময়ের মঙ্গলালয় হইবে।

এ যুগের পতিব্রতা সাধ্বী সতীগণ কেবল পতির সেবিকা হইবেন তাহা নয়। তাঁহাকে পতির জীবনের উচ্চশিক্ষার গুণগ্রাহিণী হইতে হইবে এবং যদি সম্ভব হয় তাঁহাদিগকে আপনার জীবনের কোন বিশেষ দর্শন বা জ্ঞানদ্বারা পতির জ্ঞান লাভের সাহায্য করিতে হইবে। এখন পতিব্রতা সতী কেবল পতি সেবাকে জীবনের ব্রত করিবেন তাহা নয়, পতির জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তাহাকে আপনার জীবনের লক্ষ্য করিয়া এক ব্রতে ব্রতী হইয়া উভয়ে জীবনের উচ্চ ব্রত সাধনের জন্য একত্র জীবনসংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবেন। সতী ও পতির সম্পর্ক বিষয়ে পূর্ব্বে একটা অপরিস্ফুট ভাব ছিল; যেন পতিই সতীর গতি বা গম্য বা জীবনের লক্ষ্য—এইরূপ একটা ধারণা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে অতি উজ্জ্বল নূতন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন মানুষ কোন মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না, প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী ভগবানের পুত্র ও কন্যা—ভগবান্ নরনারীকে স্বামী স্ত্রীরূপে মিলিত করিয়া পবিত্র প্রেমশিক্ষা দান করেন। নরনারীর আত্মা পরস্পরের প্রেমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের পূর্ণতা এখানে হইবে না, যিনি সকল প্রেমপ্রস্রবণ, যিনি অনন্ত মঙ্গলালয়, সেই পরম দেবতাকে পূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দান করিয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের প্রাণ প্রেমসাগরে ডুবিয়া যাইবে। পতি-পত্নীর প্রেম অতি শ্রেষ্ঠ প্রেম, কিন্তু শ্রীভগবান্ এই পৃথিবীতে জন্মদান করিয়া যত যত প্রেমলীলা করিয়াছেন সে সকলের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহাকেই প্রেম করিতে হইবে এবং চিরজীবনের সকল প্রেমের বিনিময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রেমে মত্ত হইতে হইবে। এখন যাঁহারা পরম পতিকে বিস্মৃত হইয়া কেবল মনুষ্য পতিতে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা মহাভ্রম করেন, শুধু তাহা নয়, তাঁহারা পতির সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা যে পতিবিচ্ছেদে বা পতিবিয়োগে শোকে দুঃখে নিরাশায় অবসন্ন হইয়া

পড়েন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বর্ত্তমান যুগের সতী যেমন পতিব্রতা হইবেন, তেমনই তিনি পরমপতিব্রতা হইবেন। পতিভক্তি তাঁহাকে ভগবৎ ভক্তিতে লইয়া যাইবে, পৃথিবীর গৃহ তাঁহার পক্ষে ভগবানের প্রেমলীলা প্রকাশের আধার মাত্র হইবে। যিনি এ যুগের সুগৃহিণী তিনি আপনার গৃহের সামগ্রী, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক ঘটনাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া আপনি তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন। প্রিয়তম স্বামীকেও সেইরূপ পরম মঙ্গলময়ের দান জানিবেন এবং সকল গৌরব শ্রীভগবানকে দান করিবেন।

যে গৃহিণী স্বামী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব দাস দাসীর প্রতি সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, যিনি গৃহের সুশৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য বিধান করেন, যিনি গৃহকে সুখনিকেতন করিতে যত্ন করেন অথচ গৃহে সর্ব্বসুখদাতা পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের পূজার ব্যবস্থা করেন না; যে গৃহিণীর মস্তক ধন্যবাদ ও প্রার্থনাতে ভগবৎ চরণে প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রণত হয় না, যে গৃহিণীর সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কাল আছে কেবল পরম দেবতার পূজার জন্য কোন সময় নাই বা কোন ঘর নাই তাঁহাকে কি সুগৃহিণী বলা যাইতে পারে? সকল সুখ যাঁহা হইতে দিবানিশি আসিতেছে, যিনি সেই সকল মঙ্গলাধারকে জানিলেন না তাঁহাতে সুগৃহিণীর দেবভাব কোথা হইতে আসিবে?

সুগৃহিণী কাহাকে বলে এবিষয় অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এযুগে সুগৃহিণীর আদর্শ প্রত্যেক গৃহিণীর অন্তরে উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত থাকিলে তাঁহারা এই পবিত্র ব্রত সাধনে অনেক সাহায্য পাইবেন। যদি পাঠিকাগণ সুগৃহিণীর আদর্শ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা করেন তাহাতেও মঙ্গল হইতে পারে।

যোদ্ধ্ৃবেশ ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাহার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে Suffragist দের কার্য্যকলাপ ও তাহার ফলাফল দেখিয়া অনেকেই বোধ হয় ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন না। অনেকেই এই কার্য্য কলাপ গুলিকে "পাগলামী' বলিয়া বুঝিয়াছেন। এই সমালোচনা হয়তো সত্য, কিন্তু এই "পাগলামী" যে কেবল Suffrage movement এ নয় কিন্তু সব রকম কাজের ভিতর কি রকম প্রয়োজন তা কি সমালোচকেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

এই "পাগলামী" কি নূতন যুগের নূতন জাগরণের ভাব প্রকাশ করে না? বর্ত্তমান কার্য্যকলাপে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু কাজ আরম্ভ করিবার সময় একটু ভুলতো হইবেই, ছোট ছেলে বার বার পড়িয়া তবে হাঁটিতে শিখে।

রমণীরা কোন্ নিঃস্বার্থ ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া বীর সৈনিকের বেশে দাঁড়াইয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবার সময়

কি এখনও আসে নাই? বেশী দিনের কথা নহে, এই অর্দ্ধশতাব্দী আগে এই জাগরণের ভাব কি ইতালীকে স্বাধীন করিয়া দেয় নাই? যাঁরা ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁরা কি বলিবেন যে ইতালীয়েনেরা কেবল গায়ের জোরে ইতালী স্বাধীন করিলেন? কখনই না! নূতন জাগরণের ভাব সকলকার মনে এমন একটা শক্তি আনিয়া দিয়াছিল যে অনেক পরাজয় ও বিফলতার ভিতর দিয়া যাইয়াও অবশেষে তাঁহারা জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবেন উহা স্বদেশ ভক্তি এবং তাঁহারা পুরুষ! কিন্তু নূতন দেশ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা—পবিত্রতাকে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা কি বর্ত্তমান সময়ে Suffragist দের আকুল করিয়া তোলে নাই? আর উৎকট মানসিক চেষ্টার ভিতর পড়িয়া অনেকে কিছু সময়ের জন্য তাঁরা যে কেবল আত্মা ও প্রত্যেক আত্মার যে একটা শক্তি আছে এই কথা ছাড়া আর সব ব্যবধান, স্ত্রী পুরুষের ব্যবধান, কি ভুলিয়া যান না?

Suffragist দের এই ভাব সকলে বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া প্রায় অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিতেছেন। শত অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও ইহা আধ্যাত্মিক উত্থানের চেষ্টা সুতরাং ইঁহাকে কেহ দমন করিতে পারিবেন না। মেয়েদের ভিতর যে একটা নূতন জাগরণের ভাব আসিয়াছে Suffragist দের সৈনিক ভাব তাহাই জগতে ঘোষণা করিতেছে, যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জন্য যে দায়িত্ব বাড়িতেছে সেই অনুভূতিই আজ তাঁহাদের "পাগল" সাজাইয়াছে।

তিনটী বিষয়ের জন্য রমণীবৃন্দ আজ দলে দলে সৈনিকের বেশে দণ্ডায়মান। তাঁহারা সঙ্কীর্ণ শিক্ষা, ক্ষমতা ও প্রেম ছাড়াইয়া উদার শিক্ষা, ক্ষমতা ও প্রেম চাহিতেছেন। প্রাচীনকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা সামাজিক দুরবস্থার কথা জানিতেন না ও বুঝিতেন না কিন্তু উচ্চ শিক্ষা এখন তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, যখন জানিতাম না, বুঝিতাম না তখন যন্ত্রণা ছিল না, জ্বালা ছিল না কিন্তু জানিয়া বুঝিয়া নিজে বিবেক ও প্রেমে স্বাধীনতা লাভ করিয়া চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা যে অসম্ভব, বসিয়া থাকা যে পাপ। ক্রীতদাসের ব্যবসা, শিশুদের শরীররক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে ভয়ানক অসম্পূর্ণতা, ব্যবস্থাপক সভার ঔদাসীন্য ও এই প্রকারের অনেক বিভীষিকা একবার দেখিয়া ও বুঝিয়া কি কোন দেশের মাতৃকুল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? যদি তাঁহাদের কেহ কেহ এই সব অত্যাচার নিবারণের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে ভগবৎ প্রণোদিত হন তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? পুরুষের যেরূপ সম্মান রক্ষা করা, সাহসী হওয়া, ইত্যাদি স্বাভাবিক সেইরূপ রমণীরও কতকগুলি স্বাভাবিক দাবী আছে, যেমন পবিত্রতা রক্ষা, দয়াবতী হওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, মাতৃনামের উপযুক্ত হইতে হইলে এই

স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে কিছুতেই চাপিয়া রাখা যায় না। Suffragistদের "স্ত্রী স্বভাবের বিপরীত" উপাধি অনেকে দিয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা মাতৃজাতি হইয়াও দুঃখ যন্ত্রণার কথা উদাসীন ভাবে শুনিতে পারেন আর যাঁহারা নিজের বোনেদের— যাঁরা যদিও তাঁহাদের অনেক ভুল আছে তবুও একটা উচ্চ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতেছেন ও সংগ্রাম করিতেছেন বিদ্রূপ করিবার সুযোগ অন্যদের দেন তাঁহারা কি মাতৃজাতির স্বাভাবিক ঈশ্বর দত্ত বৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন?

মনের ভাব প্রকাশের উপায় হয়তো খুব ভাল না হইতেও পারে কিন্তু যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া আজ রমণীবৃন্দ সমর সজ্জায় সজ্জিত সেইভাব সকলকার ভক্তি করিবার জিনিষ। এই ভাব একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে এই ভাবকে চাপিবার সকল চেষ্টা যে কত বৃথা কত হাস্যাস্পদ ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। জানালা ভাঙ্গা ইত্যাদি "পাগলামীর" ভিতরে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা পুলিশের কিম্বা বিচারকর্ত্তার বুঝিবার শক্তির বাহিরে।

এই নূতন জাগরণের ভাব যাহার জন্য ইংরাজ ভগিনীরা কারাগার ভোগ করিতেছেন প্রায় সকল দেশেই আসিয়াছে তবে দেশের ও সমাজের বিভিন্নতায় সকলে ভোট দিবার জন্য সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। যাঁহারা ভোট দিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন না তাঁহারাও ভগিনীদিগের দুরবস্থা, ছেলেদের কষ্ট অনুভব করিতেছেন এবং সেই সকল কষ্ট দূর করিবার জন্য পুরুষদিগের উদাসীনতা দেখিয়া পুরুষজাতিকে 'পর' ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ভাব দৃঢ় হইতে সুযোগ দেওয়াতে সমাজের কতদূর মঙ্গল তাহাও ভাবিবার সময় হইয়াছে। মেয়েদের ভোট দিবার অধিকার দিলে মতবিচ্ছেদে গৃহে অশান্তি হইবার ভয় অনেকে করেন কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কতকগুলি অন্যায়ের জন্য, পুরুষদের উদাসীন ব্যবহারের জন্য, এবং নিজেদের কোন প্রতিকার করিবার শক্তি নাই বলিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যে যে একটা ভাব আসিয়াছে সে রকম ভাব কোন রকম বিভিন্নতাই সৃষ্টি করিতে পারে না। নিজেদের অসহায় দেখিয়া আজ মেয়েরা 'পাগলিনীর' বেশে দাঁড়াইয়াছেন। অনেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন "যতদিন না এই সব অত্যাচার নিবারণ হয় আমি স্ত্রী হইব না, মা হইব না।" বিবাহিতা ও কুমারী উভয় দলেই এই ব্যবধানের ভাব আসিয়াছে। এই "নীরব প্রতিজ্ঞা" নীরবে জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি "হিবার্ট জারনল" নামে একটী সাময়িক পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে লেখক চিরকুমারীর সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহার উপর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তিনি মাতৃত্বের অবনতিই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যদি সমাজ বুঝিত ইহার কারণ মাতৃত্বের অবনতি নয় মাতৃত্বের বিকাশ। নব যুগের

নূতন স্ত্রী আত্মা নব যুগের নূতন পুরুষ আত্মার সঙ্গে মিলিয়া পৃথিবীর দুঃখ ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চাহিতেছে কিন্তু যদি এইরূপ মিলন না হয় তবে মিলিয়া কাজ নাই। জনালা ভাঙ্গা মনের ভাব সমুদ্রের একটী তরঙ্গ, এই তরঙ্গটী বিশেষ চেষ্টায় হয়তো প্রতিরোধ করা যাইতে পারে কিন্তু পশ্চাতে সমুদ্রের গতি কে রোধ করিবে?

এই যুদ্ধ পুরুষদের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু সামাজিক কোন কোন প্রথা যাহা অসহ্য তাহার বিরুদ্ধে। নারীজাতি উচ্চ প্রেমের ভিখারী হইয়া আজ "মাতৃত্বের অবনতির" কলঙ্ক মাথায় করিয়াছেন।

ধীরতা ও নম্রতাই যে স্ত্রীলোকের ভূষণ ইহা সকলেই বলিয়া থাকেন এবং ইহা খুব সত্য কিন্তু ইহা খুব উচ্চ আদর্শ। এই উচ্চ আদর্শের ভিতর পুরুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমান হওয়া চাই, এখানে এমন সমাজ দরকার যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নাই। এই আদর্শ সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন হয়তো যাঁহারা আজ রণবেশে সজ্জিত তাঁহারাই ধীরতা ও নম্রতার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবেন ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাদের দোষ ত্রুটী আলোচনা করিবেন না কিন্তু তাঁহারাই যে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ হইয়াছেন ইহা জানিয়া ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইঁহাদের কষ্ট ইঁহাদের নিপীড়নই ইঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে কণ্টক মুকুট গৌরব মুকুটে পরিণত হইবে। *

* Lucy Re-Bartlett এর 'Sex and Sanctity' বইয়ের "Militancy its place in our century" অবলম্বনে লিখিত।

সহধর্ম্মিণী।

(W. Irving লিখিত The sketch Book হইতে অনুমোদিত)

"অতল সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছন্ন রতন রাজি,
মূল্যবান নহে তো তেমন—
রমণী হৃদয় তলে সযতনে সুরক্ষিত
পুরুষের আনন্দ যেমন।"

—Middleton.

মর্ম্মভেদী ভাগ্যবিপর্য্যয়ের নিষ্ঠুর পীড়ন নারীকুল কিরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে বহন করিয়া থাকেন—তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে বিপদে পুরুষের হৃদয় দুঃখে বিধ্বস্ত ও শোকে ভগ্ন হইয়া যায় যে দুর্ঘটনায় পুরুষের মন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে সেই বিপদে ও সেই দুর্ঘটনায় নারীর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সহসা জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং তাহার চরিত্রে এরূপ অভূতপূর্ব্ব নির্ভীকতা ও মহত্ত্বের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় যে নারীমূর্ত্তি সহসা যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী ও মহীয়সী শ্রীতে ভূষিতা হইয়া উঠে। যে নারী সৌভাগ্যের পথে বিচরণ করিবার কালে একান্ত কোমলহৃদয়া ও পেলব (মৃদু), যে সম্পূর্ণ পরাশ্রিতা ও শক্তিহীনা, সেই নারীই দুর্ভাগ্যের দুর্দ্দিনে অলোকসামান্য মানসিক বলে বলবতী হইয়া তাহার দারিদ্রপীড়িত দয়িতের সহায় ও সান্ত্বনাদায়িনী হইয়া উঠে—ইহা

দেখিয়া কাহার হৃদয় না ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

যে লতা বনস্পতিকে আপনার সুকোমল শাখাপল্লব দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার আশ্রয়ে সূর্য্যালোকে উন্নীতা হয়, বনস্পতি বজ্রাহত হইলে সেই লতা যেমন তাহাকে কোমল পল্লব দ্বারা আরও অধিকতর নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরে,—তেমনি যে নারী সুখ সৌভাগ্যের মুহূর্ত্তে পুরুষের আশ্রিতা ও কেবল ভূষণ স্বরূপা থাকে, সেই নারীই পুরুষ আকস্মিক দুঃখ দুর্ভাগ্যের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইলে তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনাস্থল হইয়া দাঁড়ায়—তখন তাহার সুকোমল হৃদয় আরো নিবিড়ভাবে দয়িতের ব্যথিত হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরে এবং তাহার দুঃস্থ হৃদয়কে পরম যত্নে প্রীতির ডোরে বন্ধন করিয়া থাকে।

আমার একজন বন্ধুর আনন্দ ও শান্তি পরিপূর্ণ পরিবার দেখিয়া আমি একবার তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিলাম। বন্ধু বলিলেন—"সখে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি যেন তুমি অভিমতা স্ত্রী ও বিনীত সন্তান লাভ কর; ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আশীর্ব্বাদের কথা আমি কিছুই জানি না। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং তুমি সুখ সৌভাগ্য লাভ কর, তবে তোমার পত্নী ও সন্তানগণ তোমার সহিত সানন্দে সে সুখের অংশ গ্রহণ করিবে; আর যদি ভাগ্যবশে তুমি কখনও দুঃখেও পতিত হও, তবে তাহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে তোমার দুঃখের ভার বহন করিয়া তোমার আরাম ও সান্ত্বনাস্থল হইবে।"

প্রকৃত পক্ষেই আমি দেখিয়াছি যে বিবাহিত পুরুষ দুর্ভাগ্যে পতিত হইলে অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা সহজেই আপনার নষ্ট সুখের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহার একটী কারণ এই যে সে তাহার দুঃখপীড়িত প্রিয় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ ও অভাব দর্শন করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে উত্তেজিত হয়। কিন্তু ইহার অন্য কারণ এই যে তাহার ব্যথিত চিত্ত প্রিয় জনের প্রেম ও স্নেহ পরিচর্য্যা প্রযুক্ত সান্ত্বনা ও আরাম লাভ করিয়া থাকে এবং সেই কারণে তাহার আত্মসম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়; কারণ সে দেখে যে যদিও তাহার চতুর্দ্দিকে কেবলই অন্ধকার এবং নির্য্যাতন, কিন্তু তথাপি এই যাবতীয় লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করিয়া তাহার জন্য তাহার দীন ভবনে একটী প্রেমের রাজ্য বিরাজ করিতেছে—যে রাজ্যের সে গৌরবান্বিত অধীশ্বর। কিন্তু সংসারে যে পুরুষ নারী-সহচরী-বিরহিত তাহার একক জীবন শীঘ্রই উপেক্ষায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে এবং অধিবাসীর অভাবে পরিত্যক্ত প্রাসাদ যেমন শীঘ্রই ধ্বংশ ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় তেমনি তাহার হৃদয়ও সত্বর নৈরাশ্য ও অন্ধকারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

এই সকল কথা বলিতে গিয়া আমার একটী বন্ধুর ক্ষুদ্র পারিবারিক ঘটনার কথা মনে হইতেছে—এই ঘটনার আমি

একজন প্রধান সাক্ষী ছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু একটী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রমণী সুখ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত পালিতা হইয়াছিলেন—আমার বন্ধুরও যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। তিনিও সযত্নে তাঁহার পত্নীকে সকল প্রকার সুকুমার কলায় সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সেই সমস্ত শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন যাহা নারী চরিত্রকে মাধুর্য্যে ও কোমলতায় মণ্ডিত করিয়া তুলে। বন্ধু প্রায়ই বলিতেন, "আমার স্ত্রীকে আমি একটী মনোমোহিনী পরীতে পরিণত করিতে চাই।"

তাঁহাদের প্রকৃতির পার্থক্য তাঁহাদের মিলনকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। বন্ধুর প্রকৃতি কতকটা গম্ভীর ও চিন্তাশীল ছিল; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ছিলেন উৎসাহ ও আনন্দের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। বন্ধুর স্ত্রী যখন কোন সামাজিক সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া তাঁহার সুকুমার বিদ্যায় সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিতেন তখন বন্ধু একাগ্রচিত্তে তন্ময়ভাবে পত্নীর দিকে কি গভীর আনন্দের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন! আবার পত্নী যখন নিজের পারদর্শিতার জন্য জনমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইতেন তখন তিনি নিরন্তর কোমল ও আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইতেন—যেন সেই মুখই তাঁহার প্রকৃত প্রশংসার অন্বেষণ স্থল! যখন পত্নী আসিয়া প্রিয়পতির পার্শ্বে উপবেশন করিতেন—তখন তাঁহাদের উভয়কে কি সুন্দর দেখাইত—প্রকৃতই যেন "তমাল পাশে কনকলতা!" প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবতী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—আর স্বামীর হৃদয় এমন গুণবতী স্ত্রীরত্ন লাভের আনন্দে উৎফুল্ল ও গৌরবান্বিত। সুখময় বিবাহিত জীবনের কোমল পুষ্পিত পথে এই দুইটী আনন্দোৎফুল্ল যাত্রী হৃদয়ে কি মধুময়ী আশা লইয়াই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন!

কিন্তু সৌভাগ্যের সূর্য্য অচিরেই দুর্ভাগ্যের ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বন্ধু তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি একটী ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার মনে মনে আশা ছিল যে এই উপায়ে সম্পত্তির আয় পরিবর্দ্ধিত করিয়া তিনি পত্নীকে আরও সুখসাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই দৈব দুর্ঘটনায় উক্ত ব্যবসায়ে বন্ধুর সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল, তিনি সহসা ভিক্ষুকের অবস্থায় অবনমিত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন তিনি পত্নীর নিকটে এ অবস্থা গোপন করিয়া রাখিলেন। এই দুঃখের বহ্নিকে নিজের অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি দগ্ধ হৃদয়ে ও মলিন মুখে সংশয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবন তখন তিক্ত ও বেদনার আকরভূমি। আবার এই সমস্ত দুঃখের বেদনাকে গুপ্ত রাখিয়া স্ত্রীর সম্মুখে সহাস্যবদনে বিচরণ করিতে হইবে—এইজন্যই তাঁহার ক্লেশ আরও তীব্রতর বোধ হইতেছিল।

বন্ধু সাহস করিয়া পত্নীকে এই আকস্মিক বিপদপাতের কথা শুনাইতে পারিলেন না—ভাবিলেন স্ত্রী এ বেদনা বহন করিতে সমর্থা হইবেন না। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি চিরদিনই তীক্ষ্ণ—সে দৃষ্টি হইতে প্রিয়জনের দুঃখ বেদনা লুক্কায়িত রাখা কখনই সম্ভবপর নহে। অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন তাঁহার স্বামীর সেই পূর্ব্ব প্রফুল্লভাব আর নাই, কি যেন গুপ্ত বেদনা তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার জীবনের হাস্য আনন্দ ও উৎসাহকে হরণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি বিষাদপূর্ণ; দীর্ঘনিঃশ্বাসকে যেন তিনি বলপূর্ব্বক প্রশমিত করিতেছেন—তাঁহার অস্বাভাবিক হাস্য মালিন্যে মসীময়। পত্নী প্রাণপণে পতির চিত্তবিনোদনের জন্য কত প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, প্রেমের পরিচর্য্যায় তিনি দয়িতের দুঃখভার লঘু করিবার জন্য যত্নপরায়ণা হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ পরিচর্য্যায় পতির হৃদয়ের বিষশল্য আরও গভীরতর ভাবে তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল। এমন গুণবতী স্ত্রী, হায়! তাঁহাকেই দুঃখের কূপে নিমজ্জিত করিয়া তাঁহার জীবনকে চিরদিনের জন্য শান্তিহারা করিলাম. বন্ধু ভাবিলেন হায়! আর দুই এক দিন অতীত হইলেই, তাহার আনন্দ প্রতিমার দিব্য মুখের ঐ প্রসন্ন হাস্য বিষাদের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে! তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের ঐ সুধাময় সঙ্গীত চিরদিনের জন্য নীরব হইবে—প্রেমময় কোমল দৃষ্টির ঐ আনন্দ জ্যোতিঃ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে! যে সরল সুপবিত্র হৃদয় এক্ষণে পূর্ণ আনন্দে ঐ সুন্দর বক্ষের নিম্নে নৃত্য করিতেছে—সেই হৃদয় দুঃখ বেদনার দুর্ব্বহ প্রস্তরভারে চিরদিনের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে!!

ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

গত ২৫শে মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ পাঁচটার পর ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের গৃহের প্রাঙ্গনে একটি অতি সুন্দর সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় পী, সী, লায়ন মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন এবং আমাদের উদার হৃদয় গবর্ণর মহোদয়ের পত্নী মহামাননীয়া লেডী কার মাইকেল পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ বিস্তৃত সভামণ্ডপ পূর্ণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে বালিকাগণ পিয়ানো যোগে 'অয়ি, ভুবনমনোমোহিণী' সঙ্গীতটি গান করে, তারপর ৩৪ প্রকারের ড্রীল প্রদর্শন করা হয় এবং ধ্রুবচরিত্রের একদৃশ্য অতি সুন্দররূপে অভিনীত হয়। বালিকাগণ এসকল গুলিই অতি উত্তম রূপে সম্পন্ন করিয়াছিল। এই অংশ শেষ হইলে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন।

মহিলার পাঠক পাঠিকাগণ এই বিদ্যা-

লয়ের বিষয় সাধারণত সকল সংবাদ জ্ঞাত আছেন এবং সময়ে সময়ে ইহার কার্য্য বিবরণীর সংবাদও মহিলাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে এজন্য বার্ষিক কার্য্য বিবরণীর কোন কোন অংশ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বিদ্যালয়ের আদি প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের উচ্চ আদর্শ অনুসারেই এই বিদ্যালয় চিরদিন মহিলা শিক্ষার উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন। রোগীর শুশ্রূষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য নীতি, রন্ধন, সীবন, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিম্ন শ্রেণীতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্ত্তমানে ২০ নং বীডন ষ্ট্রীট ভবনে স্কুলটি স্থাপিত আছে, ইহাতে ভিন্ন২ ক্লাসের জন্য স্থান আছে, তদ্ব্যতীত ৩ টি বোর্ডার থাকিবার স্থান আছে। গত বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৪০ জন ছিল এবৎসর ১৭০ জন হইয়াছে। কিণ্ডারগার্টেন বিভাগে কয়েকটি শিশু বালকও আছে। বালিকাদিগের ছাত্রবৃত্তির সরকারী পরীক্ষাতে ৪টি বালিকা প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটী বালিকা বার্ষিক ২০৲ টাকা ও একটি ১৮৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। এবার দুইটি বালিকা মেট্রীকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে ফল এখনও প্রকাশ হয় নাই। বর্ত্তমানে ১০টি শিক্ষয়িত্রী আছেন ইহাঁদের দুই জন বি, এ উপাধিধারিণী; বোর্ডিং বিভাগে একজন অভিভাবিকা আছেন। এতদ্ব্যতীত কুমারী মেবেল ওয়ালটার নাম্নী একটি ইংরাজ মহিলা এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি আগামী মে মাসেই এদেশে উপস্থিত হইবেন স্থির হইয়াছে। এই মহিলা শিক্ষা কার্য্যে সুশিক্ষিতা এবং বহুদিন প্রসংসার সহিত একার্য্য করিয়াছেন, আশা হয় যে তিনি আসিলে বিদ্যালয়ের অনেক উপকার হইবে। এই বিদ্যালয়ের অপর একটি বিশেষ কার্য্য গৃহিণীগণের জন্য বিবিধ উপযোগী বিষয় বক্তৃতা দান। গত বৎসর একার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বিবিধ বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ৩, অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক ৭, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী ১, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু ৬, ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর, ৩, শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন, ৬, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ৩, শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার দত্ত, ১, মিষ্টার সিরাজী — ১।

আজ কাল এই বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য সহিত মোট এক হাজার টাকা আয় কিন্তু মাসিক ব্যয় ১২৫০৲ টাকা, ইহা ব্যতীত তিন হাজার টাকা ঋণ আছে। অপর দিকে দিন দিন ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, তবে সম্পাদক আশা করেন যে সরকার বাহাদুর ও দানশীল মহোদয়গণ এই উন্নতিশীল বিদ্যালয়ের সকল অভাব মোচন করিবেন। বিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী না থাকাতে নানারূপ অসুবিধা ও অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে এজন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ইহার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে

প্রস্তুত হইয়াছেন। এজন্য দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এজন্যও উদার গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ নারীকুলহিতৈষিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

বার্ষিক বিবরণ পাঠ শেষ হইলে লেডী কারমাইকেল মেডেল, পুস্তক, খেলানা ইত্যাদি পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিতরণ শেষ হইলে সভাপতি লায়ন সাহেব স্কুল কমিটিকে উৎসাহ দান করিয়া একটি বক্তৃতা করেন অতঃপর মহামাননীয়া লেডী কারমাইকেল একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। আমরা মহিলার পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য ইহার মর্ম্ম বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি, কারণ আমরা দেখিতেছি আমাদের গবর্ণরপত্নীর এই সময়োপযোগী উক্তি দ্বারা উচ্চতর আদর্শনারী শিক্ষা সম্বন্ধে এদেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে লেডী কারমাইকেল মহোদয়ার বক্তৃতার সারমর্ম্ম :—

অদ্য ভিক্টোরিয়া বিদ্যলয়ের পুরস্কার বিতরণ কার্য্যে যোগদান করিতে পারিয়া ও বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বিদ্যালয় বর্ত্তমান সময়ের অভাবাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত এবং সর্ব্বথা উৎসাহ পাইবার যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে হয়ত প্রথম উৎসাহে কেবলমাত্র মানসিক বৃত্তি বিকাশের দিকেই দৃষ্টি থাকে ; কিন্তু আমার মনে হয় যে তাহাদিগকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যেন তাহাদের পারিবারিক জীবন কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং এদেশীয় মাতা ও গৃহকর্ত্রীরা যে জন্য প্রসিদ্ধ সে সকল রমণীসুলভ গুণ যেন তাহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে পারে। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বালিকাদিগকে যে সকল বিষয় জীবনে সকল অবস্থায় প্রয়োজনীয় হইবে না তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যাবলী শিক্ষা দানের উপকারিতা ও গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। অনেক সময় স্ত্রী শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় উপেক্ষিত হয়। বালিকা ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমাজে বাস করিবে তাহার সকলকে যদি সুখী ও পরিতৃপ্ত করিতে পারে তবে তাহাই তাহার জীবনের সার্থকতা তাই বলি, বালিকাদিগের বিশেষতঃ যাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জন বিদ্যাভাসের উপর নির্ভর করে না তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে এবিষয়ে উপেক্ষা করা চলে না। তৎসঙ্গে আরও বলিয়া রাখি যে প্রত্যেক কার্য্যই সম্যকরূপে সম্পন্ন করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অল্প কয়েকটী বিষয় লইয়া সে গুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। বড়ই আশার কথা যে, এই শিক্ষালয়ে আগামী বর্ষের জন্য ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত গৃহকর্ত্রী ও মাতা হইতে বালিকাদিগের পক্ষে আর কি অধিক প্রয়োজনীয় ? বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালিকা ও বিবা-

হিতা রমণী দিগের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহা অতি চমৎকার এবং মহিলারা ইচ্ছা করিলেই উহাতে যোগদান করিতে এবং তদ্বারা উপকৃত হইতে পারেন! কিন্তু আমার বোধ হয় এবিষয়ে আরও অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে এবং আশা করি যে ইহার অনুকরণে আরও কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বালিকাদের জ্ঞান লাভের সময় যখন তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে, তখন যদি কেহ পরোপকারের জন্য ধাত্রী কার্য্য অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের সম্মুখে একটী মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন তবে ভারতের কল্যাণের জন্য নারী কিরূপ কার্য্য করিতে পারেন, সেবিষয়ে তাহাদের ধারণা জন্মিবে ও তদ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এদেশে অনেক বিধবা আছেন যাঁহারা সমস্ত জীবন অন্যের সেবা করেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ ধাত্রীর কার্য্য গ্রহণ করেন তখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে পরোপকারের কি বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। মহিলা চিকিৎসকগণ এবিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু শুশ্রূষা কারিণী ব্যতিরেকে চিকিৎসক নিরুপায়। এই কার্য্যের ভার নারী জাতির উপর ন্যস্ত। তাঁহাদিগকে এই পথে অগ্রসর হইয়া অন্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে হইবে। যদি এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্রত গ্রহণ করেন তবে তাহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বড়লাটপত্নী।—আমাদের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং মহোদয় যখন এবার রাজকীয় শোভাযাত্রা করিয়া নূতন রাজধানী দীল্লিতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন কোন দুরাত্মা তাঁহার প্রাণ নাশের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের হাতীর উপরে এক বোম ছুড়িয়াছিল। তাহাতে বড়লাটবাহাদুর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, অজ্ঞান হইয়া পড়েন অথচ শোভাযাত্রা তাঁহারই আদেশে যথাযথ সম্পন্ন হয়। এই সময় লেডি হার্ডিং যে প্রত্যুৎপন্নমতি সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়াছেন ইহাতে সমস্ত ভারত তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেছে। বড়লাট বাহাদুরের আরোগ্য লাভ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দেশের ধনী মানী সদাশয় অনেক লোক অর্থ দান করিয়াছেন সেই সকল অর্থ বড়লাটপত্নীর হস্তে আসিয়াছে। তিনি এই সকল টাকার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া ডাক্তার লিউকিসকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছেন আমরা মহিলার পাঠিকাগণের জন্য তাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভাইসরয়ের (বড়লাটসাহেবের) আরোগ্যলাভে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দপ্রকাশস্বরূপ যে টাকা উঠিয়াছিল সেই দানের টাকা কিভাবে খরচ করিলে বেশী লোককে সুখী করা যাবে আমি সেই কথাই ভাবছি। প্রথমে ভেবেছিলুম যে ভাইসরয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ২০শে জুন ভারতবর্ষের সকল ছোট বালকবালিকাদিগকে ছুটি দিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান যাবে; ভগবানের কৃপায় ভাইসরয় যে এত দিন

পরে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন আমার সাধ এই যে সে আনন্দ অন্যকে দিতে পারি কিন্তু যখন ভারতবর্ষের বালকবালিকাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম তখন দেখিলাম ইহা সম্ভব নয়। অবশ্য যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বালকবালিকাদিগকে এই জন্ম দিন উপলক্ষে খাওয়ান হতো তাহা হলে খুবই ভাল হইত, কিন্তু আমার হাতে যে টাকা আছে তাহাতে কুলিয়া উঠবে না। সেই জন্য এই ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো এবং নানা রকম উপায় চিন্তা করতে লাগলাম। একবার ভাবলাম যদি এই ভোজ বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে কিম্বা দিল্লী, কলিকাতা, এবং সিমলার—যে যে স্থানে ভাইসরয় নিজে ছিলেন সেই সেই স্থানে যদি হয় তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু ইহাতে অন্য অনেক স্থান বাদ পড়ে যায় বলে এটাও ছেড়ে দিতে হলো। তারপর ভাবলাম যে ভারতবর্ষের সব হাঁসপাতালের রুগ্ন বালকবালিকাদিগকে আমি নিজেই জন্মদিনের ভোজটা দোবো। কেননা এই সময়ে এদের কথাই স্বভাবতঃ মনে আসে। এই গরমের সময় রোগ শয্যার ভেতরে একদিনের জন্য যাতে তাদের একটু সুখী করতে পারি তাই ইচ্ছে। এই দানের টাকাটা নিয়ে এমন এক ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, বছর বছর একরকম ভাবে কিছু খরচ করা যেতে পারে। এই সকলের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা মনে হচ্ছে আমার ইচ্ছা এই যত দিন আপনি ভারতবর্ষে থাকেন ততদিন এই টাকা আপনার নিকট থাক ও ইহা বিতরণের ভার আপনার উপর থাকবে। কিন্তু আমি আমার প্রথম ইচ্ছাটা একবারে ছেড়ে দিতে চাই না। আমি জানি যে অনেক মুস্কিল আছে এবং কি করে এটা সম্পন্ন করা যায় তাহা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তবুও আমি আশা করি যে সব অনুরক্ত ভারতবাসিরা এত সহানুভূতি দেখিয়েছেন যে তাঁরাই এটা সুসম্পন্ন করে তুলবেন। আমি নির্ভর করে তাঁদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি এবং অনুরোধ কচ্ছি যে বছরে বছরে ২০শে জুন ভাইসরয়ের জন্মদিন বলে সমস্ত বালকবালিকাদিগকে খাওয়ান হবে।

ভাগলপুর ব্রাহ্মিকা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই সমিতি বহুদিন হইল স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। বিগত বর্ষে ১৬ জন মহিলা ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্তা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে আরও কেহ কেহ আসিয়া যোগ দিয়াছেন।

সমিতির উদ্দেশ্য।

১ম আত্মোন্নতি। ২য় পারিবারিক উন্নতি। ৩য় সামাজিক উন্নতি। ৪র্থ সেবা।

আত্মোন্নতির জন্য ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অল্পাধিক আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়েই অধিক আলোচনা হইয়াছে। প্রায় প্রতিবারেই

কেহ কেহ এ সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়াছিলেন। পারিবারিক উন্নতির জন্য পরস্পরের দাসদাসীর ও সন্তানের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সামাজিক উন্নতির জন্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এ বিষয় লইয়া আলোচনা ও প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। এবং একবার একটা সান্ধ্যসম্মিলন হইয়াছিল। তাহার পর সেবা অর্থাৎ দরিদ্রদিগের জন্য অবস্থানুসারে দান, রোগীর শুশ্রূষা অজ্ঞ লোকদিগকে সাধ্যানুসারে শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট কথাবার্ত্তা ও লেখা হইয়াছে অনেক প্রস্তাব ও ঠিক করা হইয়াছে কিন্তু বিশেষ কিছুই কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এবার শীতের প্রারম্ভে পুরাতন বস্ত্র সেলাই করিয়া দরিদ্রদিগকে একত্র করিয়া সেগুলি বিতরণ করা হইয়াছে।

আমাদের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু মহাশয় আমাদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা জীবনে কত দূর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই যে অল্লাধিক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাদের জীবনকে বাহিরের কাজে লাগাইবার জন্য অনেক পথ দেখাইয়া দিয়াছেন ও অনেক সাহায্য করিবেন বলিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত, কিন্তু আমরা কাজের এমন সুযোগ অবহেলা করিয়া মানুষ ও ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছি।

সভ্যগণকে জাগ্রত হইয়া নবভাবে ও নবোৎসাহে কার্য্য করিতে হইবে। সমিতির উচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য গুলি সফল করিতে হইবে।

সম্পাদিকা শ্রীসুনীতি বালা ঘোষ।

আলুর বীজ রক্ষা করিবার উপায়।

ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে আলুর চাস হয় সেই সমস্ত প্রদেশের কৃষকেরাই কতকগুলি আলুকে পুনর্ব্বার বীজের জন্য কয়েক মাস অত্যন্ত যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে সেই বীজগুলিকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে অধিকাংশ বীজই রোগাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই সেইগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া উঠে। বহুবৎসর পূর্ব্বে ইটালি হইতে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে আলুর বীজ আমদানী হইয়াছিল, এবং ইটালি প্রভৃতি দেশে আলুর কীট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া, আমদানির সময় বীজের সহিত আনীত সেই সমস্ত কীট বর্ত্তমানে এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত পোকাগুলি যে কেবল আলুর গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা নহে, তাহারা বীজের জন্য রক্ষিত আলুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে ও সেই বীজ আমদানি রপ্তানির সহিত দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কীটের কবল হইতে আলুর বীজ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়। যাহাতে কীটগুলি বীজের ভিতর প্রবেশ

না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। সেই জন্য আলুর বীজগুলিকে প্রথমতঃ ভাল করিয়া বাছিয়া লইয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে আলুর বীজ বদ্ধ স্থানে রক্ষা করিলে প্রায় সমস্তগুলিই রোগাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অতএব কিরূপ উপায়ে বীজগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় :—

প্রথমতঃ আমরা কীটগুলির জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ক্ষেত্রে আলুর চাষ হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই সহস্র সহস্র কীট উড়িয়া বেড়ায় এবং যে স্থানে আলুর বীজ রক্ষা করা হইয়াছে, সেই স্থানেও বহুল পরিমাণে উহারা বিদ্যমান থাকে। পোকাগুলি বীজ আলুর চক্ষুর ভিতর ছিদ্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করে, সময়ে সময়ে আলুগাছের পাতার নিম্নেও তাহাদের ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কীটগুলি শৈশবাবস্থায় গাছের পাতায় বাসা করিয়া থাকে এবং গাছের কোমল ডাল কিম্বা পাতা কাটিয়া গর্ত করে। সেই জন্য মাঝে মাঝে গাছের ডগা ও পাতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও পোকা গুলি আলুর চক্ষুতে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে এবং থাকিবার স্থান প্রস্তুত করে। একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই কীটগুলির আবাস স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়, কারণ তাহাদের পরিত্যক্ত মল কৃষ্ণ বর্ণ দানার ন্যায় আলুর গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বের অবস্থা হইতে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত একটি কীটের প্রায় এক মাস কাল সময় লাগে। একটি কীট ২৫টি হইতে ৩০টি ডিম্ব প্রসব করে, কখনও কখনও অধিক সংখ্যকও প্রসব করে দেখা যায়। এমন কি একটি কীট ৮৭টি ডিম্ব প্রসব করিয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে।

আলু যখন ভারতবর্ষের একটি প্রধান খাদ্য, তখন উহার রোগ বীজ হইতে সমূলে বিনষ্ট করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,যখন আমদানির সময় কীট আসিয়া এদেশের এমন সর্ব্বনাশ করিতেছে তখন তাহাদিগকে নষ্ট করা সম্ভবপর। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে রোগ দূরীভূত নাই হউক অনেক পরিমাণে যে হ্রাস হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পুসার কৃষিবিদ্যালয়ের প্রধান কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Imperial Entomologist) অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল লেফরয় (Prof. Maxwell Lefroy) কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে আলুবীজকে কীটের বিষম আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অনেক গুলিতে কৃতকার্য্য হইয়া উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন,তন্মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি সহজ-সাধ্য তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

প্রত্যেক বারে ২৫ সের বীজ আলু লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছিল।

(১ম) ২৫ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই বা মাদুরের উপর ছড়াইয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৫ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া ওজনে আরও প্রায় ৫ সের কমিয়াছে। অবশিষ্ট ১৪ সের ১ ছটাক আলু উপযুক্ত সময়ে বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ ২৪ সের আলু উৎপন্ন হইয়াছে।

(২য়) ২৫ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই এর উপর ন্যপথালিন (Naptha-lene) ও বালি দিয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল ৩ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুকাইয়া গিয়া ১৫ সের ৮ ছটাক অবশিষ্ট আছে। বপনের পর তাহা হইতে ৫ মণ ২২ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩য়) ২৫ সের বীজ আলু চাটাই বা মাদুরের উপর কাঠকয়লা বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল, ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৩ সের ২ ছটাক নষ্ট হইয়াছে এবং শুকাইয়া গিয়া ১৩ সের ১২ ছটাক অবশিষ্ট আছে, বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ ৩৬ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত তিনি অনেক স্থানে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ও অধিক ফলদায়ক উপায় গুলিই বর্ণিত হইল।

যাঁহারা আলুর চাষ করিয়া থাকেন ও যাঁহাদিগকে কীটের উৎপীড়নে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাঁহারা সকলেই উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

শ্রীআশুতোষ দে।
(বিজ্ঞান)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক।—গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-সভা প্লেগ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

(১ম) শস্য ভাণ্ডার সমূহ হইতেই প্লেগ বিস্তৃতি লাভ করে।

(২য়) এক বৎসর প্লেগ যে পল্লীতে সর্ব্বশেষে দেখা দেয়, পর বৎসর সেই স্থান হইতেই প্লেগ প্রথম আরম্ভ হয়। "প্যারেল ল্যাবরেটরীতে" পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে প্লেগ বীজ শস্যাদির মধ্যে নিহিত থাকে এবং মূষিকের দ্বারা সংক্রামিত হয়। শস্য নষ্ট না করিয়া কি প্রকারে প্লেগ বীজাণু নষ্ট করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। যে পল্লীতে শেষে প্লেগ দেখা দিয়াছে সেই পল্লীর উপর প্লেগ কর্ম্মচারীগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

কালাজ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। সারজেন্ জেনারল ব্যানারমেন ইহার সভাপতি। পরীক্ষা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে ছারপোকাই এই রোগের বীজাণু বহন করিয়া থাকে। এই রোগসম্বন্ধে কোন বিষয়েই আমাদের ভালরূপ জানা নাই।

মেজ'র গ্রীগ্ কলেরা সম্বন্ধে এই স্থির করিয়াছেন যে, রোগী আরোগ্য হইবার পরও তাহার মলে কলেরার বীজাণু নির্গত হয় এজন্য এরূপ ব্যক্তি কলেরা সংক্রামণের সহায়তা করে।

সুস্থব্যক্তি কলেরা রোগীর সংস্পর্শে আসিলে নিজে পীড়িত না হইয়াও কলেরা রোগ ব্যাপ্ত করিতে পারে। মক্ষিকার দ্বারাই কলেরা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

সরকারের শুভ অনুষ্ঠান।—আমাদের দেশের প্রধান অভাব তিনটি:—স্বাস্থ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব ও পানীয় জলের অভাব। এই গ্রীষ্মকালে ভাল জল প্রচুর পরিমাণে না পাইলে কি কষ্ট হয় কলিকাতাবাসীগণ তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। একদিন কলে জল না আসিলে তাঁহাদের যে বিরক্তি ও দুঃখ উপস্থিত হয়, মফঃস্বলে পল্লীগ্রামে এ কয় মাসই সেই দুঃখ। তবে পল্লীগ্রামবাসিগণ বিরক্ত হইবেন কাহার উপর। নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করেন এবং সুযোগ পাইলে সরকার বাহাদুরকে দুঃখ জানান। আমাদের উদার হৃদয় গবর্ণর ও তাহার সচীবগণ এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। ম্যালেরিয়া ও প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পল্লীগ্রামে কত পরিবার নির্ব্বংশ হইয়াছে, কত বাস্তু ভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, দেখিলে চক্ষে জল আসে। যাঁহাদের দেশ ত্যাগ করিবার উপায় আছে তাঁহারা আর এখন পল্লীগ্রামে বাস করিতে সাহস করেন না, কার্য্যত বঙ্গদেশবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাঁওতালদের দেশ বা অন্য কোন বিদেশকে আপনাদের দেশ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু দেশকে উৎসন্ন করা একটা সুপথ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গভীররূপে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে আমাদের দুঃখ কষ্ট অধিক পরিমাণে আমাদের অশিক্ষা বা অজ্ঞানতা হইতে উপস্থিত হয়। এজন্য সরকার বাহাদুর ও মাননীয় মেস্তর গোখলে প্রভৃতি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন যে এদেশের উন্নতির জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

ইহা আমাদের অত্যন্ত আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার বিষয় যে আমাদের গবর্ণর মহোদয় এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। এবার সরকার বাহাদুর উপরোক্ত তিন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করা স্থির করিয়াছেন। বহু দিনের মহা মহা অভাব এক বৎসরেই দূর হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই তবে প্রতি বৎসর চেষ্টা করিলে অচিরেই যে দেশের শুভদিন আসিবে তাহার সন্দেহ নাই।

অনৃশংস গুলি।—যত গুলি গোলার আবিষ্কার হইতেছে ততই মানুষের প্রাণ নাশের ভয় বাড়িতেছে। সম্প্রতি একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম যে নূতন এক প্রকারের গুলি আবিষ্কার হইয়াছে তাহা দ্বারা আহত ব্যক্তি কতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান হইয়া থাকিবে ও তাহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু কাহারও প্রাণহানি বা অঙ্গহানি হইবে না। এইরূপ গুলি প্রচলিত হইলে বিশেষ উপকার হইবে।
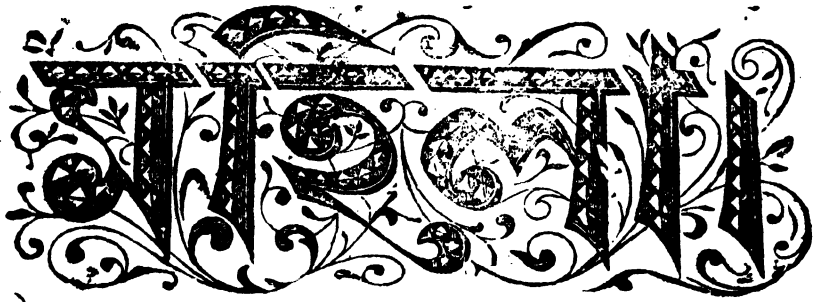
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১০শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩২০। মে, ১৯১৩। [১০ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে স্বর্গের দেবতা, আমরা সামান্য মানুষ, অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি, হীনমতি জীব, আমরা আপনার জ্ঞানের বলে অথবা সাধনার বলে তোমাকে লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারি না। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের মত নরনারীর জীবনে তোমার প্রেমরূপ, মঙ্গল রূপ, পুণ্যরূপের আলোক অল্প অল্প প্রকাশ কর—সামান্য সামান্য মানুষের মধ্যে অসামান্য স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ কর, তাহা দর্শন করিয়া আমাদেরও আশা হয় যে, আমরাও তোমার কৃপায় উচ্চ ভাব, স্বর্গীয় ভাব কিছু কিছু লাভ করিয়া ভাল হইতে পারিব। তোমার এই দয়ার বিধান দর্শন করিয়া আমরা আর হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না—তাই তুমি যে সকল ভাল লোককে আমাদের নিকট উপস্থিত কর আমরা তাঁহাদিগকে আদর করি, মান্য করি, তাঁহাদের মত হইতে চেষ্টা করি। আবার যখন তোমার ইচ্ছাতে তাঁহারা সংসার হইতে চলিয়া যান তখন আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের জীবনের ভিতর দিয়া তুমি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে উপদেশ, আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পাঠাইয়াছ তাহা তোমার আশীর্ব্বাদরূপে—আমাদের জীবনের ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকিবে ইহাই তোমার ইচ্ছা—তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তোমার যে সকল সুসন্তান আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তুমি আমাদিগকে কি কি মঙ্গলাশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছ তাহা বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন করিয়া যেন অন্তরে চিরদিন ধারণ করিতে পারি, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

যদিও বঙ্গদেশে নারীর সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্টরূপে বিস্তৃত হইয়াছে

বলা যায় না, তথাপি অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে বহুল উন্নতি হইয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এক দিকে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রাচুর্য্যও যেমন চক্ষুর উপর রাখা উচিত, অপর দিকে কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইল এবং কি কি কারণে উন্নতি হইয়াছে তাহাও দেখা আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষা যে পারিবারিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, এ বোধ যাহাদের নাই তাহারা অদ্যাপি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। সেদিন আমাদের একটী প্রাচীন আত্মীয় তাঁহার পুত্রের জন্য বধূ নির্ব্বাচন করিতে আসিয়াছিলেন। বধূ মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা একথা শ্রবণে তিনি অতি উদাসীন ভাবে বলিলেন, ওসকলে আমাদের কি বা আসে যায়, ভাল পাক করিতে জানে কি না, গৃহস্থালীর কাজ গুছাইয়া করিতে পারিবে কি না এ সকল দেখিতে হইবে। যেন একটু লেখা পড়া ভাল জানিলে ও সব কাজে দক্ষতা লাভের বিঘ্ন জন্মে, এখনও অনেকের এরূপ ধারণা রহিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের অদ্যাবধি ঐরূপ কুসংস্কার দেখা যায়। বহুসংখ্যক বঙ্গবাসিনী রমণী যে গভীর অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাস করিতেছে তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র, তথাপি বঙ্গদেশে এখন অনেক শিক্ষিতা মহিলা অগ্রবর্ত্তী বঙ্গীয় সমাজের ভূষণস্বরূপ হইয়াছেন। অনেক মহিলার জ্ঞানতৃষ্ণা সভ্যদেশ মাত্রেই প্রশংসিত হওয়ার কথা।

বঙ্গদেশে বহু নগরে এখন বালিকা বিদ্যালয় গুলি শিক্ষিতা মহিলাদিগকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। অনেক বালিকা বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধান কার্য্য বঙ্গীয় মহিলারাই নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহা ভাবিলে মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। বঙ্গীয় স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতা মহিলা ধর্ম্মগত সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-শৃঙ্খল বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন; তাঁহারা পুণ্য প্রেমময় নিরাকার জগৎপতিকে হৃদয়াসনে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিভরে আরাধনা প্রার্থনা করিতেছেন ইহা যে বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এসকল নব পরিবর্ত্তনকে ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ বলিয়া কি গ্রহণ না করিয়া পারি?

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন বঙ্গীয় কুলবালাগণের নিদারুণ লোকবহির্ভূত অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা তন্মোচনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাঁহারাও ঈশ্বরের হস্তে ব্যবহৃত হইয়াছেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের চিত্তপটে সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা চিরতরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। সেই সকল মহানুভবদিগের মধ্যে পূজনীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ দেশের রমণীজাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিত, বিদ্যাসাগরের পুণ্যময়ী জননী ভগবতী দেবী তাহার অন্যতম কারণ। সুতরাং ভগবতী দেবীর প্রতিও বঙ্গীয় নারীজাতির

কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। ইয়োরোপীয়গণ দিগের মধ্যে মহামতি বেথুন সাহেব এবং তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেল হাউসী ও তাঁহার পত্নী এবং বঙ্গের প্রথম লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে মহোদয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। এ সকল লোক কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে নারীজাতিমধ্যে জ্ঞানজ্যোতি বিস্তারের জন্য প্রাণগত ইচ্ছাতে বহু যত্ন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর সেই সময়ে স্পেশ্যাল স্কুল ইনস্পেক্টর রূপে নগরে নগরে গিয়া স্থানীয় লোকদিগের প্রতি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে শতাধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এসকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চারি সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে বিদ্যাসাগর ভিন্ন বালিকাদিগের শিক্ষা বিস্তারার্থ এরূপ উৎকট চেষ্টা এবং অর্থদণ্ড অপর কেহই স্বীকার করিবার লোক ছিলেন না। বিদ্যাসাগর সাহেব মহোদয়গণকে নানারূপে এবিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। পক্ষান্তরে গবর্ণর জেনেরল এবং লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের দ্বারা কার্য্যতঃ নারী শিক্ষা প্রচার করাইতেন। সুতরাং এদেশের লোকের পক্ষে বিদ্যাসাগরকে এবং বেথুন, হেলিডে, লর্ড ও লেডী ডেলহাউসীকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মৃতিপটে মুদ্রিত রাখা উচিত। দেশীয়া শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দেরও আত্মোন্নতি ও জ্ঞানলাভের মূলে যে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের শুভেচ্ছা এবং যত্ন বর্ত্তমান, তাহা ভুলা কর্ত্তব্য নহে।

অধুনা শিক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্বজাতির শুভাশুভ চিন্তায় রত হইয়াছেন। ইহা সময়ের বিশেষ শুভলক্ষণ। বঙ্গদেশে হিন্দু বালবিধবার সংখ্যা আজও কত অধিক। তাহারা যে অবস্থায় জীবনযাপন করে তাহা শিক্ষিতাগণ যদি চিন্তা করেন তবে তাহাদের দুরবস্থা বিমোচনের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। আমরা দেখিয়া আহ্লাদ বোধ করি যে, "ভারত মহিলা" পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরযুবালা দেবী দেশীয় বিধবাগণের দুঃখ বিমোচন এবং তাহাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ ঢাকা নগরে একটী বিধবা আশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক আশ্রিত বিধবাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতাতেও শিক্ষিতা মহিলাদিগের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে একটী বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল আশ্রম হইতে যাহাতে বিধবাগণ জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি এবং শিল্পবিষয়ে সমুচিত শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহা সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় বটে। সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যেমন, বঙ্গদেশে বিধবাগণের সংখ্যার তুলনায় এ চেষ্টাও তৎসদৃশ। তবে ইহাই আরম্ভের পক্ষে সন্তোষ ও আশাজনক। একটীর উপরে আর একটি বালুকাকণা স্থাপিত হইয়া ক্রমে বড় বড় দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নির্ম্মিত হইতেছে। তবে বর্ত্তমান সময়ের যৎসামান্য চেষ্টা হইতে কালে

মহতী চেষ্টা সমুদ্ভূত এবং কার্য্য সকল প্রকাশিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে আশা করা যায়।

ঈশ্বর সকল সন্তানের প্রতিই করুণা-পূর্ণ, তাঁহারই অপার করুণা গুণে যে বঙ্গীয়া বালিকা এবং দুঃখিনী বিধবাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প ও কলাবিদ্যা শিক্ষার বিবিধরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারই অনুগ্রহে যে বঙ্গনারী স্বাধীনতার আস্বাদন পাইবার অধিকারিণী হইতেছে ইহা দেখিয়া সকলেরই সর্ব্ব শুভদাতা পুণ্য-ময় ঈশ্বরের নিকট অবনত ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলচরণে বঙ্গীয়া নারী-দিগের প্রণিপাত করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আত্মার সন্তোষের ও জীবনের আশার কারণ বটে। শিক্ষিতা মহিলাগণ এ অলঙ্কার বিহীন না হন ইহা আমাদিগের হৃদ্গত বাসনা। হিতৈষী মনুষ্যগণ এবং সর্ব্বহিতকারী ঈশ্বর আমাদিগের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও পূজার পাত্র। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও সত্যভাবে পূজা শিক্ষা যেন অবহেলিত না হয়। আমাদের জন্মদাতা ও জীবন-পোষিণী জননী যেমন আমাদের ভক্তির চির আস্পদ, যাঁহারা আমাদের জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিয়াছেন—যাঁহাদের প্রসাদে আমরা অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা পাই, তাঁহারাও তেমনি আমাদের শ্রদ্ধা-ভাজন। বালিকা এবং যুবতীগণ বঙ্গদেশে পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত যেন এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাধন হৃদয় ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চয় করেন।

সহধর্ম্মিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অবশেষে একদিন বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে গভীর নিরাশা ও বিষাদ-সূচিত। আমি সমুদায় ঘটনা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার স্ত্রী এসকল কথা জানেন?" এই প্রশ্নে বন্ধু একেবারে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন—তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বন্ধু বলিলেন—"ভাই, যদি আমার প্রতি তোমার সামান্য পরিমাণও দয়া থাকে তবে আমার স্ত্রীর কথা তুমি উত্থাপন করিও না—তাঁহারই চিন্তা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"কেন উত্থাপন করিব না? বিলম্বেই হউক বা সত্বরই হউক তোমার স্ত্রী এ সংবাদ জানিবেনই জানি-বেন। তুমি বহুদিন তাঁহার নিকট হইতে এ সংবাদ গোপন রাখিতে পারিবে না। কিন্তু তখন হয়তো এ সংবাদ এরূপ ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে যে তিনি তাহার আকস্মিক আঘাত বহন করিতে সমর্থা হইবেন না। তাহা অপেক্ষা তোমার নিজেরই এ সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে কি? বন্ধু, তুমি কি জান না যে, প্রিয়জনের কণ্ঠের স্বর অতিশয় কঠোর সংবাদকেও কোমলতা অর্পণ করে? এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট এ সংবাদ গোপন রাখিয়া তুমি

নিজেকে তাঁহার সুমধুর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিতেছ। শুধু তাহাই নহে, তুমি ইহা দ্বারা সেই পবিত্র বিশ্বাসবন্ধনকে শিথিল করিতেছ যে বন্ধনই কেবল পতি-পত্নীর হৃদয়কে সংযুক্ত রাখিতে সমর্থ—সে বন্ধন, অকপটভাবে পতি ও পত্নীর মধ্যে ভাব এবং চিন্তার বিনিময়। তোমার স্ত্রী শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, তোমার মনের মধ্যে কোন একটী গভীর বেদনার কারণ উপস্থিত হইয়া তোমাকে নিরন্তর ব্যথিত করিতেছে—এবং এ কথা তুমি নিশ্চিত জানিও যে, প্রকৃত প্রেম কখনও গোপন বা কপটতা সহ্য করিতে পারে না। প্রিয়জন যদি প্রিয়জনের নিকট আপনার দুঃখ বেদনার কথা ও পর্য্যন্ত গোপন করে তবে প্রেম আপনাকে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত মনে করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকে।"

বন্ধু আমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন —"বন্ধু, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য, কিন্তু যখন আমি ভাবিতেছি যে, তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশ করিয়া আমি তাঁহার ভবিষ্যতের সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত করিব, যখন ভাবিতেছি যে 'স্বামী ভিখারী' এই কথা জানাইয়া আমি তাঁহার জীবনের সকল সুখ সকল আনন্দকে নিমেষে ধূলি-সাৎ করিয়া দিব—তখন প্রাণ যে অসহ্য বেদনায় ও আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে! আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে জানাইব যে, সুখশান্তিপূর্ণ আনন্দলোক হইতে আমি নিজের দোষে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিলাম! সেই সদাপ্রফুল্ল সোণার প্রতিমা, সেই সর্ব্ব-জনমনোমোহিনী কোমলহৃদয়া ললনা—কেমন করিয়া তিনি সুভীষণ দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করিবেন? তিনি যে আজীবন সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা! কেমন করিয়া তিনি সংসারের নিষ্ঠুর উপেক্ষা সহ্য করিবেন? হায়! হায়! এ সংবাদে নিশ্চিতই তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—এই সুভীষণ—"

আমি দেখিলাম শোকে বন্ধুর হৃদয় দুর্দ্দমনীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত। আমি এই প্রবাহের গতিরোধ করিলাম না—আমি জানি উচ্ছ্বাসে শোকের তীব্রতা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। যখন শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হওয়ায় বন্ধু সহসা নীরব হইয়া পড়িলেন, তখন আমি উপযুক্ত সাবধানতার সহিত ঐ প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীর নিকট সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলাম। বন্ধু শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলেন।

আমি বলিলাম—"বন্ধু, তুমি বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। তুমি আমাকে বল কিরূপে তুমি এই কথা স্ত্রীর নিকট গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে। তোমার পূর্ব্বাবস্থার বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে—এখন এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুযায়ী তোমাকে সংসারের যাবতীয় কার্য্যের পরিচালনা করিতে হইবে—এরূপ অবস্থায় তোমার স্ত্রীকে এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সংবাদ জ্ঞাপন করা তোমার একান্ত

কর্ত্তব্য। তুমি আমার এই কথায় দুঃখিত হইও না—কিন্তু ইহা সত্য যে তুমি আর এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না—পূর্ব্বের অনেক সুখকে এখন তোমায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সংসারে তোমার অনেক অকৃত্রিম বন্ধু আছেন; তাঁহারা এই ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতু তোমার প্রতি কখনও উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না; তোমাকে জীর্ণ কুটীরে বাস করিতে দেখিলেও তোমার প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব স্নেহভাবের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আর তোমার স্ত্রীর ন্যায় গুণবতী রমণীকে লইয়া সুখী হইবার জন্য তোমার রাজপ্রাসাদেরও প্রয়োজন নাই।"

বন্ধু উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিলেন—"এমন গুণবতী স্ত্রী লইয়া আমি পর্ণকুটীরেও রাজ-অট্টালিকার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ—এমন গুণবতীকে সঙ্গিনী করিয়া আমি দারিদ্র্যের অতলতলে নিমজ্জিত হইতেও পশ্চাৎপদ নহি। উঃ ভগবান, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

আমি বন্ধুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম—"বন্ধু আমার দৃঢ় ধারণা যে তোমার স্ত্রীও তোমার সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ বিশ্বাসই পোষণ করেন, তোমার সহবাসে থাকিয়া তিনি দুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনার কোন ক্লেশ অনুভব। করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, দুঃখের দুর্দ্দিনে পড়িয়া তিনি সমুন্নত মস্তকে হৃদয়ের সকল শক্তি ও তেজ প্রকাশিত করিয়া পরিপূর্ণ মহিমায় বিপদের সম্মুখীন হইবেন। তিনি যে রূপ ও ধনসম্পদকে ভাল না বাসিয়া প্রিয়তমের অন্তরের মানুষটীকেই ভাল বাসেন, জগতের সম্মুখে ইহার প্রমাণ দিতে তিনি হৃদয়ে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশীলা নারীর হৃদয়ে স্বর্গীয় দেববহ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে—এই স্ফুলিঙ্গ সৌভাগ্যের দীপ্ত দিবালোকে হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্যভাবে লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু বিপদ ও দুঃখের ঘনঘোর তামসী নিশায় যখন চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হয়, তখন সেই নিবিড় অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া এই প্রচ্ছন্ন দেবাগ্নিকণিকা সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যত দিন পুরুষ পত্নীর সহিত সংসারের পীড়ন ও অত্যাচার বহন না করেন, তত দিন পত্নী যে কি মহীয়সী দেবী সে কথা তিনি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

মহিলার পাঠিকা ও পাঠকগণের নিকট অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ অপরিচিত নহেন। কারণ ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে তিনি যে সকল শিক্ষা দিয়াছেন ও সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন, মহিলাতে মধ্যে মধ্যে তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণ তাঁহার পরলোকগমনে কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ, বহু শিক্ষিত লোক এবং সকল ব্রাহ্ম-

সমাজের লোক শোক করিতেছেন। এ সময়ে মহিলাতে তাঁহার বিষয় কিছু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হুগলীর নিকটস্থ প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রাম-নিবাসী স্বর্গগত মধুসূদন সেন মহাশয় বিষয়কার্য্যের অনুরোধে কলিকাতায় বাস করিতেন। ক্রমে তিনি সপরিবারে কলিকাতাবাসী হয়েন। তাঁহার ৬টি পুত্র ও ৫টি কন্যা হয়—বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় সন্তান। মধুসূদন সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া ক্রমে সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। বিনয়েন্দ্র এলবার্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের যত্নের ধন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিজ্ঞ নববিধানতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন এই সময়ে এলবার্ট স্কুল ও কলেজের পরিচালক ছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশ হইয়াছিলেন। পরে তিনি জেনেরেল এসেম্‌ব্লী কলেজে পাঠ করেন। তিনি মনোবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম্‌, এ, পাস করেন ও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া এম্‌, এ, পাস করেন। কিছুদিন বহরমপুর কলেজে ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া আপনার প্রতিভাবলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য লাভ করেন। এই কার্য্যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অদীর্ঘ জীবনের শেষ পীড়া হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অনেক যুবক বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া উচ্চ পরীক্ষাতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন, এখনকার যুবকগণ সাধারণত নির্দ্দোষ চরিত্র, আজকাল বক্তৃতা অনেকে করেন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য অনেকে পরিশ্রম করেন। প্রাচীন সমাজে ও ব্রাহ্ম সমাজে এ সকল সদ্‌গুণ সম্পন্ন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বিনয়েন্দ্রনাথও এই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব সকল বিষয়েই প্রকাশ পাইত। পরীক্ষা পাস করা মাত্র যাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির পরিচয়, তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করেন মাত্র। কিন্তু বিনয়েন্দ্র চিরজীবন বিবিধ প্রকারের জ্ঞানোপার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রতিভা-প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান দ্বারা আপনার অন্তরে যেন একটি অতি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে নিত্য নব নব জ্ঞান লাভ হইত। তাঁহার নিকট সকল শাস্ত্রের সকল শিক্ষার জন্য আদরের স্থান ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এখন চরিত্রগত দোষ প্রায় নাই আমরা তাহা দেখিয়াই কৃতার্থ হই, কিন্তু আমরা আজ যাঁহার চরিত্রের আলোচনা করিতেছি তিনি বাল্যকাল হইতে সকল বিষয়ে সুন্দর ও সুগন্ধ একটি ফুলের মত ছিলেন, শুধু তাহা নয় তাঁহার চরিত্রের

সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন আপনার পবিত্রতার প্রভা বিস্তার করিতেন এবং যাহাদিগের অন্তরে কোনরূপ হীনতা থাকিত তাহারা হীনতা ত্যাগ করিত, অন্যথা দূরে পলায়ন করিত। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র জগদ্বিখ্যাত সুবক্তা ছিলেন; বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার দৈবশক্তি বলে একজন প্রধান বক্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবপূর্ণ সুমধুর বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করিত, বিশেষতঃ দর্শন বিজ্ঞানালোক দ্বারা উদ্ভাসিত কবিত্বপূর্ণ তাঁহার নববিধান ব্যাখ্যান শত শত শিক্ষিত যুবককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। ফলে যাঁহারা একবার তাঁহার বক্তৃতা বা ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন তাঁহারা চির দিনের জন্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। অধ্যাপকের কার্য্যেই তাঁহার বিশেষত্ব সর্ব্বদা প্রকাশ হইয়া পড়িত, তিনি দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাস বিষয়টি ছাত্রগণের নিকট শুষ্ক মনে হয়, কিন্তু বিনয়েন্দ্র নাথের নিকটে যাঁহারা একদিন ইতিহাসের ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন চিরদিনের জন্য ইতিহাস তাঁহাদিগের নিকট জীবন্ত বর্ত্তমান মানব চরিত্রের বিভিন্ন ভাব ও শক্তি প্রকাশের বর্ণনা হইয়া রহিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি ছাত্রগণ বিনয়েন্দ্র নাথের ক্লাসে যাইতে একান্ত উৎসুক হইত এবং তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ ও সুখী হইয়া ক্লাস হইতে ফিরিয়া আসিত।

বিনয়েন্দ্রনাথের বাল্যকালের শিক্ষা কেবল বিদ্যা অভ্যাস মাত্র ছিল না। তিনি কতকগুলি মহৎচরিত্রের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের প্রভাব অন্তরে অনুভব করিয়া তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সময় ইঁহার অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল বস্তুর ও জীবনের অনিত্যতা জ্ঞান এবং চরিত্রের মহত্ত্ব তাঁহার অন্তরে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া ২। ৩ সহস্র লোক নিমতলা ঘাটে লইয়া যান, বিনয়েন্দ্র সেই শোকযাত্রার সঙ্গে ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার প্রথম শ্মশান দর্শন। এই দিন তিনি যে গভীর ভাবের প্রথম আন্দোলন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সমস্ত জীবনে তাহারই উন্নতি ও পরিপক্বতা লাভ করিতেছিলেন। সমবয়স্ক অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়াছিল—তাহার মধ্যে ৫।৭টির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। স্বর্গগত মোহিত চন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ লাল সেনের সহিত যোগ এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইঁহাদের তিন জনকে নববিধানের ভাবী প্রকৃত সাধক ও প্রচারক এবং দেশের আদর্শ শিক্ষিত যুবক রূপে অনেকেই দর্শন করিতেন।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইঁহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সকল উন্নতির চেষ্টায় ইহাদিগকে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহারা এই দুস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য যে মহৎ কার্য্য ভগবানের ইঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে কার্য্য

যে বংশ পরম্পরা চলিবে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ এবং সুখী হইতেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে মোহিত চন্দ্র চলিয়া যাইবেন, তাহার কয়েক বৎসর পরেই বিনয়েন্দ্র চলিয়া যাইবেন বিধাতার এ বিচিত্র লীলা কে পূর্ব্বে ভাবিতে পারিয়াছিল?

বিনয়েন্দ্র নাথ ব্রাহ্মসমাজের সন্তান, ব্রাহ্মসমাজের শিষ্য, ব্রাহ্মসমাজের সাধক, ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টা, সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের আপনার লোক। বাল্যকাল শেষ না হইতেই আপনার সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রার্থনাসভা ও জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করেন। সময়ে যখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হইলেন তখন এই যুবকদিগের প্রার্থনা সভা অবলম্বন করিয়া কলিকাতার শত শত যুবকের সহিত পরিচিত হইলেন। ৯২নং হ্যারিসন রোড বাটী যুবকদিগের যে কি আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বিনয়েন্দ্রনাথ এই বোর্ডিং গৃহে ছাত্রগণের সঙ্গে বাস করিতেন, যুবকদিগের প্রার্থনা সমাজের জন্য এই গৃহের একটি প্রশস্ত কুটরী লওয়া হইয়াছিল, এখানকার উৎসব যুবক বৃদ্ধ সকলের সম্ভোগের বিষয় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ মহাশয় এই সময়ে দলে যোগ দিয়া সঙ্গীত রচনা ও গান করিতে লাগিলেন; প্রমথ লাল বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিনয়েন্দ্রের জীবনের এই অধ্যায়টি অতি সুখকর ও শিক্ষাপ্রদ। ইহার একটি দৈনন্দিন লিপি প্রকাশ হইলে ভবিষ্যৎ বংশের উপকার হইবে।

বিনয়েন্দ্র অত্যন্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন। আপনাকে বলপূর্ব্বক সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন না। অপর দিকে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদিগের সহিত ভাবভেদ উপস্থিত হইলে আত্মগোপন করিয়া নীরব থাকিতেন। তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র ও বাগ্মিতার আকর্ষণে বহুস্থান হইতে উপাসনা ও বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিত। তিনি সময় ও সুবিধা পাইলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন, এবং দেশের ও নববিধানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

বিনয়েন্দ্র নাথ বেতন গ্রহণ করিয়া সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন, কিন্তু তিনি যুবক দিগের সেবা করিতেই ব্যাকুল ছিলেন। যখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে বলিতেন তখন তিনি বলিতেন যে, এত গুলি যুবকের সহিত ভালবাসা স্থাপন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল সাধন কার্য্যের যত সুযোগ, অন্য কোন স্থানে তাহা পাইবেন না, এই জন্যই কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না। আমরা যতদূর জানি দুইবার অধিক বেতন দিয়া তাঁহাকে মফঃস্বলের কলেজে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু বিনয়েন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন

নাই। ফলে বিনয়েন্দ্র কলিকাতার যুবকগণকে যে কি ভাল বাসিতেন তাহা অবশ্যই সাধারণের জানা নাই, কারণ তিনি জীবনের এই বিশেষ ব্রত কাহাকেও বলিতেন না; কিন্তু যেসকল যুবক ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিতেন তাঁহারা অনুভব করিতেন যে তাঁহাদের এমন হিতার্থী বন্ধু হয়ত আর দ্বিতীয় নাই। বিনয়েন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে আপনার মনে করিতেন, অবকাশ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেন, নব বিধান মণ্ডলীকে আপনার পরিবার মনে করিতেন, ইহার নানা মহা অভাব দর্শন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং ইহার গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের যুবকগণের হিতচিন্তা, হিতসাধনচেষ্টা ও তাহাদের ভবিষ্যতের মঙ্গলোদ্দেশে বিবিধ ব্যবস্থা করা তিনি আপনার জীবনের কার্য্য মনে করিতেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ যুবকদিগের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা জীবনের কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নারীশিক্ষার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, সুযোগ ও অবকাশ পাইলেই নারীশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় যে ভাবে গঠিত হইয়া সমাজের সেবা করিতেছে ইহা অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিনয়েন্দ্রনাথের পরিশ্রম, চিন্তা ও সাধু-ইচ্ছার ফল। তিনি এই বিদ্যালয়ের সূচনা হইতে ইহার জন্য কত খাটিয়াছেন, কত ভাবিয়াছেন, আপনি কতরূপে ইহাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বয়স্থা বালিকাগণের উচ্চশিক্ষার জন্য ক্লাস করিয়া নিয়মমত পড়াইতেন। কতকগুলি কুমারীর ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের পরীক্ষা লইয়া গুণানুসারে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তিনি যেসকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা মহিলাগণের শিক্ষা ও আনন্দবর্দ্ধনে অতীব সুফল প্রদান করিয়াছিল। ফলে বিনয়েন্দ্রনাথের যে অত্যুচ্চ উচ্চশিক্ষা, উচ্চচরিত্র, সুন্দর কবিত্ব ও জীবন্ত ধর্ম্মভাব ছিল মহিলাগণ ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁহার উপদেশ, বক্তৃতাদি শ্রবণে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন।

কলেজের কার্য্যে, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যে ও বিবিধ প্রকারের সাধারণ হিতকর ও সামাজিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে কলিকাতার, বঙ্গদেশের, ভারতের, ইউরোপের ও আমেরিকার অনেক লোকের নিকট বিনয়েন্দ্র সুপরিচিত, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি, কিন্তু এই ভাবে জীবন দান করাতে তিনি আপনার গভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় কোন স্থায়ী পুস্তকাকারে লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই কতকগুলি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনের সারকথা প্রকাশ করিতে পারিবে না, তবে যে উদারভাবে মানুষের মঙ্গল করিয়া

ও ভগবানেতে প্রেম ভক্তি সাধন করিয়া তিনি জীবন শেষ করিয়া গেলেন তাহাই তাঁহার অলিখিত জীবন চরিত ও শিক্ষা হইয়া রহিল।

বিনয়েন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর প্রতিনিধিরূপে ১৯০৫ সনে জেনিভা নগরের ইউনিটেরিয়ান ও অপর সকল স্বাধীন উদার ধর্ম্মগুলীর মিলন সভাতে গমন করিয়াছিলেন, তৎপর ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও গমন করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে তীর্থযাত্রী নাম দিয়া এই ভ্রমণের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে তিনি যেখানে গমন করিয়াছেন সেখানে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বহুস্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে একেশ্বরবাদিগণের যে মিলন সভা হয়, বিনয়েন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের স্থান ও তাহার গভীরতা ও উদারতার বিষয় অতি উত্তম ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে সে বক্তৃতাটি রক্ষা করা হয় নাই।

আমরা এতক্ষণ যাঁহার কথা আলোচনা করিতেছি, তাঁহার অন্তরের ইতিহাস বলিলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন চরিত বর্ণনা করিলে বলিতে হয় যে, তিনি সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাঁহার অন্তরে ভগবানের শিবসুন্দর স্বরূপের একটি উজ্জলভাব অতি প্রথম অবস্থাতেই উপস্থিত হইয়াছিল। যত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ভক্তি বাড়িতে লাগিল ততই তিনি এই সৌন্দর্য্যকে অধিকতর উজ্জলরূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, এই সৌন্দর্য্যের শাসন তাঁহার জীবনে সর্ব্বদা দেখা যাইত। আপনার পরিবার, বাসভবন, শয়ন উপবেশনের ঘর সকলই যাহাতে সুন্দর হয় এজন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। একখানি পত্র লিখিতে হইলে তাহার কালি কাগজ লেখা ভাষা প্রভৃতি সকল যাহাতে সুন্দর হয় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, কোন বক্তৃতা করিতে হইলে বা কাহারও সহিত আলাপ প্রসঙ্গ করিতে হইলে সুন্দরভাবে করিতেন। তাঁহার সাধন ছিল সৌন্দর্য্যের কার্য্যগত উপাসনা। যাহারা কার্য্যোদ্ধার করিতে ব্যস্ত, তাহারা তাঁহার ব্যবহারে বড় দুঃখিত হইত।

পাশ্চাত্য জ্ঞান, ধর্ম্ম, উন্নতির মহোদ্যম প্রভৃতির বিদ্যুৎ স্পর্শে ভারতে যে নবজীবনের উদ্গম দেখা যাইতেছে তাহার সহিত একত্র স্থাপন করিয়া বিনয়েন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইনি পূর্ব্ববংশের শেষ ও নবীন বংশের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য আলোক স্পর্শে একেশ্বরবাদ আসিল, বহু দেব ও বহু ধর্ম্মস্থলে একেশ্বর ও এক ধর্ম্ম স্বীকার করা হইল। এই ধর্ম্ম মতরূপে গৃহীত হইয়া ক্রমে চরিত্রে, পরিবারে ও সমাজে প্রবেশ করিতে যে

সময় প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সময় মধ্যেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আসিয়া দেখা দিল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গীন-ভাবে গ্রহণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগী সমাজ ও পরিবার গঠন বিষয়ে কতকটা সফলও হইয়াছিলেন ; এমন সময়ে সমন্বয়ধর্ম্ম দেখা দিয়া ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্রতা ও একদেশ-দর্শিতা দেখাইয়া দিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মা-শ্রিত ব্যক্তি হইয়াও দিব্যজ্ঞানে বিশ্বজনীন মহাসমন্বয়ের ধর্ম্মকে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথ ঠিক তাঁহার পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি, ইনি স্বীয় ধর্ম্মপিতার প্রাচীন ব্রাহ্মভাব অজ্ঞাতসারে লাভ করি-লেন, অথবা একথা বলা যাইতে পারে যে প্রথম যুগের ব্রাহ্মগণ যেরূপ প্রাচীন সমাজ ত্যাগ করিয়াও অনেক বিষয়ে প্রাচীন ভাবাপন্ন ছিলেন, এক ভাবে বিনয়েন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন ; কিন্তু নববিধা নের বিশ্বজনীন উদারভাব তাঁহাকে ভবি-ষ্যতের উদার মনুষ্য-সমাজের এক জন করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথম যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন তাঁহারা পৌত্তলিকতা জাতি-ভেদ কুসংস্কার সকল ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-জীবন লাভ করিতে যত্নবান ছিলেন. বর্ত্ত-মান সময়ের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ আপনাকে কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বলিয়া আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহারা সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভাবকে আপনার ভাব করিতে যত্ন করেন, সকল মনুষ্যকে প্রেমে আপনার করিতে দৃঢ়ব্রত থাকেন তাঁহারা আপনার জীবনে সমস্ত জগৎকে গ্রহণ করিতে সাধন পরায়ণ—এই শ্রেণীর ধর্ম্মাত্মাই ভবি-ষ্যতের ধার্ম্মিক মনুষ্য, ইঁহাদিগের নিকট যে ধর্ম্মাক্রান্ত লোক উপস্থিত হইবে সেই অনুভব করিবে যে এ ব্যক্তি আমার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং আমার আপনার লোক। যে ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবনে সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় আরম্ভ হয় নাই তাঁহাকে আর নবযুগে জীবন্ত ধর্ম্মের লোক বলা হইবে না। সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা নাই অথচ আপনার ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা আছে, সকল সত্যধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সকল প্রকার উপাসনা সাধন ভজনের প্রতি সম্মান আছে অথচ আপনার অন্তরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আপনার সাধন ভজনের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং আপনার মণ্ডলীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ইহাই নবধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তির বিশেষত্ব। বিনয়েন্দ্রনাথ এই নবধর্ম্মাক্রান্ত নরবংশের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি। প্রাচীন হিন্দু, নব্য হিন্দু, মুসলমান, বিভিন্ন সম্প্র দায়ভুক্ত খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, বিভিন্ন ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম, উচ্চ জ্ঞান নীতির পক্ষপাতী নব্য সম্প্রদায় সকলেই বিনয়েন্দ্রনাথকে আপনার লোক মনে করিতেন এবং সত্য সত্য তাঁহার অন্তরে সকলের জন্য আদরের স্থান ছিল অথচ তিনি চিরজীবন নব-বিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম সাধক ও সেবক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত উপদেশ, বক্তৃতা, পুস্তক আলাপ প্রসঙ্গ সকলই কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র প্রভৃতির ভাবে ও আদর্শে পরিচালিত হইত। বিনয়েন্দ্রনাথ যুবকগণের হৃদয়কে কেন এত আকর্ষণ করিতেন ইহা হয়ত অনেকে জানেন না। আমরা বিশ্বাস করি

যে ইঁহার জীবনের উদার প্রেমপূর্ণ বিশ্বজনীন ভাবই যে সকলের অন্তরের প্রার্থনীয় অবস্থা, তাহাতেই সকলকে আকৃষ্ট করিত। এখন হইতে যাঁহারা সকল সজ্জনের প্রিয় হইবেন তাঁহারা এই শ্রেণীর লোক অবশ্য হইবেন। এইজন্য আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের বিশ্বপ্রেমিক-শ্রেণীর মনুষ্যদলের বিনয়েন্দ্র বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বপ্রকাশ। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার এই বিশ্বাসী ভক্তসন্তান দ্বারা যে নব-জীবনের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যাহাতে আমাদের দেশে সর্ব্বত্র গৃহীত হয় ইহাই প্রার্থনা। বহু উন্নতিশীল নরনারী বিনয়েন্দ্রকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার পরলোকগমনে দুঃখিত হইয়াছেন; এখন তাঁহারা বিনয়েন্দ্রের জীবনের উদার গভীর প্রেম পুণ্যের ভাব ও বিশ্বাস এবং সেবা জীবনে গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন হউন।

জন্ম—১৮৬৮ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর।
মৃত্যু—১৯১৩ সনের ১২ই এপ্রিল।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর আহার।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর, প্রত্যেক জীবের আহারের জন্য, পরমপিতা পরমেশ্বর মাতৃস্তনে অমৃত-ধারাস্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। এই দুগ্ধ পান করিয়া সদ্যোজাত শিশু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু সভ্যতার কি মাহাত্ম্য! আজকালকার প্রসূতিদিগের অনেকেরই স্তনে দুগ্ধ প্রায়ই থাকে না। অনেক প্রসূতির সন্তান গো-দুগ্ধ বা নানারূপ "পেটেণ্ট ফুড" খাইয়া থাকে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন যে, এই প্রকারে শিশুপালন দ্বারা কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। শৈশবাবস্থায় যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার অধিকাংশ আহারের অনিয়ম জন্য ঘটিয়া থাকে।

কি প্রকারে শরীর পালন দ্বারা নিজ নিজ স্তন হইতে সন্তান পোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারেন এবং শিশুদিগকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারেন এ বিষয় যদি জননীরা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন তাহা হইলে শিশুদিগের অকাল-মৃত্যু অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে।

সকল জননীই নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকেন। কোন্ জননী তাঁর নিজ সন্তানকে মেধাবী ও বলিষ্ঠ দেখিতে চাহেন না?

শিশুকে যেমন করিয়া লালন পালন করিবে, শিশু সেইরূপেই বর্দ্ধিত হইবে। শৈশবাবস্থায়ই পরবর্ত্তী জীবনের আশা ভরসার বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরে যে প্রকার আহার্য্য দেওয়া হইবে, বৃক্ষ সেইরূপই হইবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর মাতৃস্তনে এই আহার্য্য যোগাইতেছেন। এই স্তনদুগ্ধ সম্যক্‌রূপে শিশুকে না দেওয়াতে কত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত

হইতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। কত শিশু যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সংখ্যাতীত। কত লোক আত্মীয়স্বজন ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

শৈশবাবস্থায় উপযুক্ত আহার্য্য অভাবে মনুষ্য বিকলাঙ্গ হইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য মধ্যে অস্থিসকলকে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে বিশেষ উপকরণ থাকে তাহার অভাব জন্য শিশুর অস্থি অসার ভাবে বর্দ্ধিত হয় ও দেহের ভার দ্বারা ক্রমশঃ বক্রভাব ধারণ করে।

আহারের অভাবে কেবল যে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয় তাহা নহে। দুর্ব্বল শরীরে রোগ অধিক প্রবল হয় এবং সত্বই ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুদিগের শরীরের বৃদ্ধি ও উপযুক্ত পুষ্টি কেবল আহারের উপর নির্ভর করে না। যখন তাহারা ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন মাতার শরীরের অবস্থা, তাহার আহার ও শরীরের অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয়। বারান্তরে আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শিশুর স্বাভাবিক আহার।

সাধারণের ধারণা যে, মাতৃস্তনদুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক খাদ্য। কিন্তু সকল সময়ে মাতৃস্তনদুগ্ধ দ্বারা শিশুর সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয় না। সেইজন্য যে খাদ্য শিশুর শরীরের অভাবকে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে তাহাকেই আমরা শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া অভিহিত করিব।

এই বিশ্বজগতে প্রাণী মাত্রেরই নিজ নিজ শরীরের বিশেষত্ব দেখা যায়। শিশুদেরও সেইরূপ। ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই জন্য শিশুর আহার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রত্যেক শিশুর শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সকল অতিশয় যত্নের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি? কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব যে শিশুর পরিপাক, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সকলই স্বাভাবিক রূপে সম্পাদিত হইতেছে?

কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আমরা সদ্য-সদাই বুঝিতে পারি। কতকগুলি প্রতিক্রিয়া বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ।

আহার সম্যক্‌রূপ পরিপাক করিতেছে কি না তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। যদি শিশু আহারের পর তৃপ্ত হয়, বমি না করে, কোন প্রকার বেদনা বা অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ না করে এবং তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে আমরা স্বতঃই স্থির করি যে, শিশুর পরিপাকক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে এবং যে খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

শিশুর খাদ্য যথেষ্ট এবং উত্তমরূপ

পরিপাক প্রাপ্ত হইলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি না হইতে পারে।

উদাহরণঃ—শিশুদিগকে ঘন দুগ্ধ (Condensed milk), শুষ্ক দুগ্ধ (Dried milk) বা নানাপ্রকার পেটেন্ট খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় (Patent infant's food) এবং তাহারা এই প্রকার আহারে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রকারে পুষ্ট শিশুদের রিকেট্স ও স্কার্ভি নামক পীড়া হইতে প্রায়ই দেখা যায় এবং তাহারা সদাসর্ব্বদা নানারূপ রোগে ভুগিয়া থাকে।

অধ্যাপক চিডেল (Dr. Cheadle) তাঁহার লিখিত পুস্তকে এবিষয় অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। ব্রিনউইচ সহরে এক শিশুপ্রদর্শনী হইয়াছিল। যে শিশুটি হৃষ্টপুষ্টতা ও ওজনের আধিক্যের পুরস্কার পাইয়াছিল সে-ই পুনরায় তাঁহার নিকট Great Ormond Streetএর চিকিৎসালয়ে হস্ত ও পদের বক্রতা এবং শরীরের মাংসপেশী সমূহের দুর্ব্বলতার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল। এই বালকটী কেবলমাত্র বিলাতী দুধ (Condensed milk) এবং কর্ণফ্লাওয়ার (Corn Flour) খাইয়া বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

শিশুদের স্বাভাবিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক পাইতেছে ও শরীরের সম্যক্‌রূপ পুষ্টি সাধিত হইতেছে কি না, কেবল তাহা নির্দ্ধারণ করিলে হইবে না। কিন্তু এই সঙ্গে যাহাতে শিশুদের পরিপাক-শক্তি বিকাশ পায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে প্রকারে শিশুকে কথা কহিতে, চলিতে ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সেইরূপই যাহাতে শিশুর পরিপাকের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে ক্রমশঃ পরিপাক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসকল কার্য্যক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। শিশুর পরিপাক-ক্রিয়া অক্ষত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্তনদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আইসে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর পরিপাক-ক্রিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে।

যদি শিশুদিগকে কৃত্রিম উপায়ে (স্তনদুগ্ধ ব্যতীত) শরীরতত্ত্ব বিধান অনুযায়ী আহার্য্য দিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম যতদূর সম্ভব অনুকরণ করা আবশ্যক।

শিশুকে শরীর তত্ত্বানুযায়ী আহার্য্য দিতে হইলে তাহার পরিপাক, পুষ্টি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার প্রয়োজনের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

স্তন্যপান।

সাধারণের বিশ্বাস যে, স্তনদুগ্ধ দ্বারা যে কোন শিশুকেই উৎকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচনার কথা আছে। যদি শিশুকে নিয়ম মত

স্তনদুগ্ধ দেওয়া হয় তাহা হইলে শিশু যে উত্তমরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রসূতির শিশুকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং তিনি স্বাভাবিক নিয়ম সকল পালন করিতে যত্ন করেন না। এই সকল অনিয়মের জন্য স্তনদুগ্ধ-পুষ্ট শিশুদেরও নানা রোগ হইতে দেখা যায়। স্তনদুগ্ধ যতক্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম মত নিঃসারিত হয় ততক্ষণ ঠিক থাকে। মাতার স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার স্তনের দুগ্ধেরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়; এবং সময় সময় এই পরিবর্ত্তন শিশুর স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। যখন কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে খাদ্য দেওয়া হয়, তখন আমরা শিশুর আবশ্যক মত এই খাদ্যের পরিবর্ত্তন সহজেই করিতে পারি। শরীর-তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে স্তনদুগ্ধ দ্বারা শিশুকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে, স্তন্যপায়ী শিশুর লক্ষণ সকল কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা বর্দ্ধিত শিশুর লক্ষণের ন্যায় সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

সময়ে সময়ে স্তনদুগ্ধ একেবারেই বন্ধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ার আবশ্যক হয় এবং এই সঙ্গে প্রসূতির খাদ্যদ্রব্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম খাদ্যের সংমিশ্রণে অনেকের আপত্তি দেখা যায়। ভিন্ন প্রকারের খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিবে এ প্রকার ভুল ধারণা হইতেই অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোনই ভিত্তি নাই।

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক প্রণালীর সংমিশ্রণেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

স্তনদুগ্ধের স্বাভাবিক ও রাসায়নিক গুণ।

প্রসবের পরে স্তন হইতে যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহা পরবর্ত্তী কালের দুগ্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন। প্রসবের পরেই কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহাকে ইংরাজিতে Colostrum ও চলিত কথায় গাঁজাল দুগ্ধ বলে। পরবর্ত্তী কালের দুগ্ধের সহিত গাঁজাল দুগ্ধের অনেক রাসায়নিক বিভিন্নতা আছে।

(১) গাঁজাল দুগ্ধের আমিষ জাতীয় অংশ যদিও স্তনদুগ্ধের আমিষ অংশের সহিত সমান পরিমাণে থাকে কিন্তু গাঁজাল দুগ্ধে আমিষ অংশ (Lact albumen ও Lact globulin রূপে) অধিক পরিমাণে থাকায় পাকাশয়ে ডেলা বাঁধিয়া যায় না।

(২) গাঁজাল দুগ্ধে যে চিনি বর্ত্তমান থাকে তাহা দুগ্ধশর্করা রূপে থাকে না, অন্য (Dextrose) রূপে থাকে। এই আকারে বিনা পরিপাকে শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

(৩) গাঁজাল দুগ্ধে (Colostrum Corpuscles নামক) কতকগুলি কোষ বর্ত্তমান থাকে। গর্ভের বৃদ্ধির সহিত স্তনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্তনমধ্যে দুগ্ধকণা সকল উৎপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায়

দুগ্ধের আবশ্যক থাকে না, এজন্য প্রসবের পূর্ব্বে (Colostrum) কোষ দুগ্ধকণা সমূহকে শোষণ করিয়া ফেলে এবং প্রসবের পরেও, যতকাল পর্য্যন্ত না শিশুগণ তেজের সহিত দুগ্ধ টানিয়া নিঃশেষ করিয়া খাইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধে ঐ কোষ (Colostrum) দেখা যায়।

গাঁজাল দুধ।—গাঁজাল স্তনদুগ্ধ স্বাভাবিক স্তনদুগ্ধ হইতে ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং ইহার মৃদু বিরেচক শক্তি থাকায় শিশুর "মেকোনিয়াম' বা প্রথম মল পরিত্যাগের সহায়তা করে।

গাঁজাল দুধে (Lact albumen ও Lact globulin রূপে) আমিষ বর্ত্তমান থাকে এবং সাধারণ দুধে এতদ্ব্যতীত Caseinও বর্ত্তমান থাকে। এই কেজিন নামক আমিষ জাতীয় খাদ্য শিশুর পাকস্থলীতে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে পুনরায় পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত হইলে শিশুর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সদ্যোজাত শিশুর পাকস্থলী এই কেজিনোজেন" নামক আমিষ পরিপাক করিতে পারে না। সেইজন্য সদ্য গাঁজাল দুধে কেজিনোজেন দেখা যায় না।

ক্রমশঃ শিশুর বয়সের সহিত দুধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যেমন মাতৃস্তনদুধের পরিবর্ত্তনের সহিত কেজিন নামক আমিষ দেখা যায় তেমনি শিশুর পাকস্থলী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও নূতন পরিপাকশক্তি প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম উপায়ে শিশুদিগকে লালন পালন করিতে হইলে শিশুর পরিপাকশক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

প্রসূতি ও ধাত্রীরা শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুকে খাদ্য দেওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অনেক সময় তাঁহারা সাধারণ দুগ্ধ (যাহা পরিপাকের ক্ষমতা শিশুর একেবারেই নাই) দিয়া থাকেন ও তদ্দ্বারা কষ্ট ও রোগ আনয়ন করেন। প্রসবের পরেই শিশুকে স্তনপান করিতে দেওয়া অতি উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত। এতদ্দ্বারা মাতৃস্তন উত্তেজিত হয় এবং প্রসূতির জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। শিশু যে সামান্য পরিমাণ গাঁজাল দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহার অন্ত্রমধ্যে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত "মেকোনিয়াম' পরিত্যক্ত হয়। *

মাতৃস্তনে দুগ্ধবৃদ্ধির উপায়।

স্তনে যখন দুগ্ধের হ্রাস হয়, তখন সাধারণতঃ প্রসূতিকে অধিক মাত্রায় পানাহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু প্রসূতির আহারের পরিপাক যদি স্বাভাবিক থাকে তাহা হইলে অধিক খাদ্য পরিপাক করিতে না পারায় এই ব্যবস্থা উপকার জনক না হইয়া বরং অনিষ্টকরই হয়; অর্থাৎ ইহাতে দুগ্ধ বৃদ্ধি না হইয়া বিষাক্ত দুগ্ধের সৃষ্টি হয়।

দুগ্ধবৃদ্ধি নিম্নলিখিত দুইটী অবস্থার উপর নির্ভর করে।

১। শরীরের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি সাধন।

* স্বাস্থ্যসমাচারের এই প্রবন্ধটীর উপরের লিখিত অংশ ভারতমহিলা হইতে গৃহীত।

স্তনের পরিপুষ্টি প্রসূতির সমগ্র শরীরের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। এই শরীরের পরিপুষ্টি কখনও অপরিমিত আহার দ্বারা সাধিত হয় না। সুতরাং দুগ্ধের পরিমাণ কম হইলে কখনও স্তনদাত্রীকে অধিক আহারের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়। তাহার পক্ষে সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ লঘু বলকর আহার্য্য নিয়মিত সময়ে খাইতে এবং মুক্ত বায়ুতে অঙ্গ-চালনা জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। স্বাভাবিক উপায়ে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করণ।

বিবিধ উপায়ে স্তনের দুগ্ধ ক্ষরণ শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। প্রথমতঃ সমস্ত শরীরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হইয়া পরোক্ষে স্তনকেও সতেজ করিবে। আর মনে রাখিতে হইবে যে জননীর মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে দুগ্ধের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতি মাত্রায় মানসিক উত্তেজনা কিংবা মানসিক চাঞ্চল্য বশতঃ দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে। নৈরাশ্যে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে দুগ্ধক্ষরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে শুধু যে প্রসূতির দুগ্ধ অধিকতর বলকারক হয় তাহা নহে তাহার পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যাহাতে তাহার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বজায় থাকে তাহা দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ শিশু নিজেও যদি মাতার স্তন হইতে যথেষ্ট দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেও স্বভাবতঃ দুগ্ধ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু শিশু যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার দুগ্ধ আকর্ষণের ক্ষমতাও কম থাকে এবং মাতার দুগ্ধ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কোন বলিষ্ঠ শিশুকে প্রসূতির স্তনপান করিতে দেওয়া হয়, তবে যথা নিয়মে আকর্ষণ করার জন্য দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে।

সাধারণতঃ দরিদ্র ঘরের প্রসূতিদের দুগ্ধের অভাব দেখা যায় না। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, জননী জানে যে তাহার সন্তানকে স্তন্য দানে পরিপালন করিতে হইবে ইহা ভিন্ন তাহার সন্তান প্রতিপালনের আর অন্য উপায় নাই। তাহাদের হৃদয়ের এই আবেগই দুগ্ধ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। ঔষধের মধ্যে Codliver oil ইত্যাদি এবং খাদ্যের মধ্যে মাষকলাই ইত্যাদি দুগ্ধ বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু মুসুরী, লঙ্কা ইত্যাদি দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

যে পর্য্যন্ত জননীর স্তনে পরিমিতরূপে দুগ্ধ সঞ্চার না হয় সে পর্য্যন্ত সন্তানকে উপবাসী রাখা যায় না। মাতার স্তন হইতে যথারূপে দুগ্ধক্ষরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যবিধ খাদ্য দ্বারা শিশুর সে অভাব পূরণ করা আবশ্যক। এই অবস্থায় শিশুর খাদ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না। যিনি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবেন তাঁহাকেই বিবেচনা করিয়া খাদ্যের পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিলে উপকার দর্শিতে পারে—

১। কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধে শিশুর পেট ভরে কিনা দেখিতে হইবে।

২। যদি পরিমাণ কম হয় তবে অঙ্গ-লিখ খাদ্য বিধান করিয়া শিশুর সে অভাব পূরণ করিতে হইবে।

৩। শিশুর পরিপাক শক্তি অনুসারে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা দরকার। অবস্থা ভেদে ছানার জল অথবা জল মিশ্রিত দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

৪। স্তনে সামান্য দুগ্ধ থাকিলে শিশুকে পর্য্যায়ক্রমে মাতৃদুগ্ধ এবং উপরো-ল্লিখিত খাদ্য প্রদান করা দরকার। এমন কি স্তন যদি একেবারেই দুগ্ধহীন হয় তবুও শিশুকে প্রথম স্তনাকর্ষণ করাইয়া পরে ঐ খাদ্য দিবে।

৫। মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্য দুগ্ধ প্রদান করিতে হইলে তাহাতে অত্যধিক পরিমাণে মিষ্ট দিবে না কারণ তাহা হইলে শিশু মাতৃস্তন গ্রহণ করিতে চাহিবে না।

৬। শিশুকে কম পরিমাণে খাইতে দিয়া তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করা আবশ্যক কারণ তাহা হইলে সে প্রবল ভাবে দুধ আকর্ষণ করিয়া লইবে।

দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহার হ্রাসের উপায়—

এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে দেখা দরকার যে প্রসূতির দুগ্ধের মাত্রা সত্য সত্যই অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না। শিশুদের আহারের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শিশুর অবস্থা অনুসারে তাহার খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবে।

যখন নিঃসন্দেহ রূপে বোঝা যায় যে দুধ বৃদ্ধি বশতঃ শিশুর অপরিমিত আহার হইতেছে, সে স্থানে নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা দুধের পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে।

১। প্রসূতি এক সময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে দুধ দান করিবেন না।

২। একবার স্তন পান করিলে পুন-র্ব্বার স্তন দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সময় অতি-বাহিত হওয়া আবশ্যক।

৩। স্তন পানের সময় অঙ্গুলিদ্বারা স্তনের বোটা টিপিয়া দুধের ধারা কমাইতে হইবে।

সন্তানের আবশ্যক অনুযায়ী কিরূপ ভাবে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইবে। মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইহার উপকারিতা বৃদ্ধি করা কঠিন বিষয়।

স্বাভাবিক অবস্থায়ও মাতৃদুগ্ধ সম্পূর্ণ-রূপে নির্দোষ নহে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা অনেক সময়ে দুধের নিকৃষ্টতা অনুভব করিতে পারি না কিন্তু সন্তানের শারীরিক অবস্থা দেখিয়াই আমরা দুধের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি।

মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রকার খাদ্যাখাদ্যের পরিবর্ত্তন ও অনেক নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রসূতিকে লঘু খাদ্য প্রদান এবং তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ

ব্যবস্থাই একমাত্র মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করে।

স্তনদুগ্ধ নিকৃষ্ট হইলে স্তনদাত্রীপ্রসূতিকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে।

১। প্রসূতিকে সুসিদ্ধ ভাত, রুটী, মৎস্য, দুগ্ধ, শাক সবজী প্রভৃতি লঘু খাদ্য খাইতে দিবে। লঙ্কা, গরম মশল্লা প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য কদাচ প্রসূতিকে প্রদান করিবে না।

২। স্তনদাত্রীকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য প্রদান করিবে।

৩। চা, কফি অথবা অন্য কোনরূপ উত্তেজকদ্রব্য কদাচ ব্যবহার করাইবে না।

৪। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও সকালে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে দিবে।

৫। তাহাকে সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার এবং অতি প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিবার জন্য উপদেশ দিবে।

৬। যাহাতে তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৭। তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে জলপান করিতে দিবে।

৮। যথা সম্ভব তাহাকে ঔষধ ব্যবহার করাইবে না।

আর্সেনিক, এণ্টিমনি প্রভৃতি অনেক ঔষধ আছে যাহা প্রসূতি ব্যবহার করিলে দুগ্ধের সহিত নির্গত হইয়া শিশুর পক্ষে অপকারী হইয়া থাকে, কাজেই ঐ প্রকার ঔষধ প্রসূতিকে কখন ব্যবহার করিতে দিবে না।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি স্তনদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করা না যায় তবে অন্য উপায়ে সে অভাব পূরণ করিতে হইবে।

মাতৃদুগ্ধে আমিষ, স্নেহ ও লবণ জাতীয় উপাদানের মাত্রা কম বেশী হইতে পারে। এই সকল নিকৃষ্টতা আমরা কতক পরিমাণে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিতে পারি, কিন্তু তদপেক্ষা আমরা শিশুর শারীরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

নিম্নলিখিত শিশুর উপসর্গগুলি দ্বারা আমরা মাতৃদুগ্ধের নিকৃষ্টতা অবধারণ করিতে পারি :—

১। বমি, পেটের অসুখ, অনেক বার সবুজ মলত্যাগ প্রভৃতি শিশুর উপসর্গগুলি যদি জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে হইবে যে মাতার অসুস্থতাই ইহার কারণ। এরূপ অবস্থায় সন্তানকে কখনও দূষিত স্তন পান করিতে দিবে না।

২। স্তন্যপান করিবার কিয়ৎকাল পরেই জমাট দুগ্ধ বমন ইহা প্রায়ই স্তন্য পান করাইবার পর শিশুকে নড়া চড়া করার জন্য হইয়া থাকে, সুতরাং শিশুর আহারের পর তাহাকে নড়াচড়া করিবে না। দুগ্ধ অধিক মাত্রায় পান করিলে অথবা দুগ্ধে আমিষ অংশ বেশী থাকিলে এরূপ বমন হইয়া থাকে। যদি দুগ্ধাধিক্য বশতঃ বমন হয় তবে দুগ্ধের মাত্রা হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। যদি দুগ্ধের মাত্রা হ্রাস করা সত্ত্বেও বমন হয় তবে শিশুকে

স্তন পান করাইবার পূর্ব্বে অল্প চিনি ও সোডিয়াম সাইট্রেট মিশ্রিত জল পান করাইলে বমন বন্ধ হইবে।

৩। অম্ল গন্ধযুক্ত বমন—দুগ্ধে স্নেহ অংশের আধিক্য বশতঃ উহা হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে স্তন পান করাইবার পূর্ব্বে সামান্য শর্করার ও অগুনালের জল পান করাইলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

৪। অজীর্ণ ও পেট বেদনা—স্তন পানের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ল্যাক্টোপেপটিন বা এসেন্সিয়া পেপটিকা ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

৫। তৈলাক্ত ভেদ—দুগ্ধের স্নেহ অংশের আধিক্য জন্য ইহা হইয়া থাকে।

৬। কোষ্ঠবদ্ধ—দুগ্ধের মাত্রা কম হইলে হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে গো দুগ্ধ দ্বারা অভাব পূরণ করিতে হইবে এবং প্রসূতিকে কড লিভার অয়েল ও মণ্ট খাইতে ব্যবস্থা দিবে।

৭। মস্তকে ঘর্ম্ম—আহারের মাত্রাধিক্যই ইহার কারণ।

৮। মস্তকে ঘা—জননী বাতগ্রস্ত হইলে এরূপ হইয়া থাকে।

৯। অধিকরূপ শিশুর ওজন বৃদ্ধি—সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে শিশু ৬ হইতে ৮ আউন্স করিয়া ওজনে বাড়িয়া থাকে। যদি ইহা অপেক্ষা বৃদ্ধি বেশী হয় তাহা হইলে তাহাকেই অত্যধিক বিবেচনা করিবে। মাতৃস্তনদুগ্ধ কমাইয়া দিবে। এবং কৃত্রিম খাদ্যাদি দিতে পারা যায় তবে চিনি যথাসম্ভব কম দিবে।

প্রসূতি শিশুকে স্তন্য দিতে অক্ষম হইলে স্তনদায়িনী ধাত্রী কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয় আমরা এখন আলোচনা করিব।

(ক) উক্ত ধাত্রীর বয়স ২০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের হইলে ভাল হয়।

(খ) সে বেশ সুস্থকায়া ও সবলা হইবে।

(গ) তাহার কাসি, বাত প্রভৃতি না থাকে সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ঘ) তাহার উপদংশ রোগ অথবা জননেন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাধি না থাকে।

(ঙ) তাহার স্তন বেশ বড় আর শক্ত হইবে এবং তাহাতে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকিবে। তাহার স্তনের বোঁটা বেশ উচু হইবে।

(চ) তাহার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা এবং মন প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক এবং প্রসূতির ন্যায় সব নিয়ম পালন করিতে হইবে।

আমরা উক্ত স্তনদায়িনী ধাত্রীর সন্তানকে দেখিয়াও তাহার দুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে কতক ধারণা করিতে পারি। যদি ঐ সন্তান বলিষ্ঠ, রোগহীন হয় তবে আমরা বুঝিতে পারি যে ধাত্রীর দুগ্ধ বেশ উপকারী হইবে।

যদি কোন সদ্যোজাত শিশু অন্য কোন স্তনদাত্রী দ্বারা পালিত হয় তবে স্তনদাত্রীর সন্তানের বয়স এবং ঐ পালিত শিশুর বয়স ঠিক একইরূপ হওয়া উচিত। কারণ প্রসবের পর হইতেই দিন দিন প্রসূতির দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দশদিনের

অনধিক বয়স্ক শিশুকে তাহার নিজ জননী ব্যতীত অন্য কোন স্তনদায়িনী ধাত্রীর দুগ্ধ ব্যবহার করাইতে হইলে (breast pump) দ্বারা স্তন আকর্ষণ করিয়া উক্ত দুগ্ধ পেপ্টোনাইজ ও জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাইলে কোনরূপ অপকার হইবার আশঙ্কা থাকে না। দশদিনের পর শিশু নিজে ধাত্রীর স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইলেও কোনরূপ কুফল জন্মায় না।

এখন আমাদের বিবেচ্য, স্তনদায়িনী ধাত্রী তাহার নিজ সন্তানকে স্তন্য পান করাইবে কি না? নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ধাত্রীকে তাহার সন্তানকে স্তন প্রদান করিতে অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য—(১) তাহা না দিলে ধাত্রীর শিশুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয়—(২) যদি স্তনদায়িনী ধাত্রী তাহার নিজ সন্তানকে স্তন না দেয় তাহা হইলে অনেক সময় তাহাকে অসন্তুষ্ট দেখা যায় এবং তাহার নিজ সন্তান কৃত্রিম খাদ্যাদি খাইয়া পীড়িত হয় তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা বিকৃত হয় ও দুগ্ধও দুষ্ট হইয়া থাকে। নিজের সন্তানকে স্তন পান করাইলে ধাত্রীর মন বেশ প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার দুগ্ধের উপকারিতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে।

যদি হিসাবপূর্ব্বক শিশুদিগকে স্তন দেওয়া হয় তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে দুইটী শিশু অতি সন্তোষজনকরূপে এক স্তনদাত্রী হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য্য পাইতে পারে। অনেক প্রসূতি উপযুক্ত আহার পাইলে যথেষ্ট উত্তম দুগ্ধ দিতে সক্ষম হয়। প্যারিস সহরের শিশু হাঁসপাতালে একজন স্তনদায়িনী ধাত্রী ৪ হইতে ৫টী শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিতে সক্ষম হয়।

৫০ হইতে ৭৫ আউন্স অর্থাৎ প্রায় /১॥০ হইতে /২।০ পর্য্যন্ত দুগ্ধ একটী স্তনদায়িনী ধাত্রী দিতে সক্ষম হয়।

আমাদের মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণ যাঁহারা অর্থব্যয় দ্বারা অন্য কোন স্তনদায়িনী ধাত্রীর বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন না তাঁহারা অনায়াসেই আত্মীয়বর্গ মধ্যের অন্য কোন প্রসূতি দ্বারা এ অভাব পূরণ করিতে পারেন।

[শিশুর কৃত্রিম আহার বর্ণন কালে ইহার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইবে।]—স্বাস্থ্যসমাচার।

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নারীদিগের ভোট দিবার অধিকারের জন্য যে মহা সংগ্রাম ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে ইহার সমাপ্তি কোথায় তাহা এখনও কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। যে দল বাড়াবাড়ি করিয়া, অনিষ্ট করিয়া বা আপনাদিগের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া রাজনৈতিক অধিকারের লাভের সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় এখন কমিয়া যাইবে, কারণ তাঁহাদের ব্যবহারে সাধারণ নরনারী অধীর হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন কেবল বাড়ীর সম্মুখের সারসী দরজা ভাঙ্গা তাহাদের কার্য্য ছিল ততদিন লোকে এতটা বিরক্ত হয় নাই, কিন্তু ইদানীং যেরূপ দুষ্কার্য্য

আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বিশেষ আইন করিয়া সাফ্রাজিট্ দলকে দমন করাই প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই উৎকট দলের পশ্চাতে এক দল সহজ বুদ্ধির নারী ও পুরুষ আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন যে নারীকে পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হইবার অধিকার না দিলে এবং নারীর প্রাপ্য অধিকার তাহাকে না দিলে আর ইংলণ্ড উন্নতির ও শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভায় নারীকে অধিকার দিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় আর ২।৩ বার এরূপ বিল উপস্থিত হইলেই এ আইন পাস হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডের যে সকল নারী মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার না দিলে কখনও চলিবে না। মহিলার পাঠিকাগণ লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে ব্যস্ত হইবেন সে আশঙ্কা নাই; কিন্তু তাঁহারা এই গৃহ বিবাদের সার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের প্রাপ্য স্থান লাভ করিতে যত্নবতী হউন একথা তাঁহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

— --

বরদার মহারাজা গাইকোয়াড় আপনার রাজ্যের নানা প্রকারের উন্নতি সাধন করিতেছেন, শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত দেশকে উন্নত করাই তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য। সম্প্রতি তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে তিনি এই দিনকে বৃথা আমোদে ব্যয় করেন নাই, এই শুভদিনে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি উন্নততর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে একটি আইন হইয়াছিল যে বালিকাগণকে এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে হইবে — বিবাহ দেওয়া হইবে না; সে দিন বিধি হইয়াছে যে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকাকে শিক্ষা দান করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বে বালকগণকে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার আইন ছিল, তাহার স্থানে ১৪ বৎসর বয়স করা হইয়াছে। এবিষয়ে ইংলণ্ডও এত অগ্রসর হইতে পারে নাই। পূর্ব্বে বালকগণ চতুর্থ মান পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে বাধ্য ছিল, এখন হইতে তাহারা পঞ্চম মান পড়িবে। ইহাতে দেশের যে কত উপকার হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি তাঁহার শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী সকলকে বিশেষ আদেশ করিয়াছেন যে উপযুক্ত রূপ সহানুভূতি, বিচক্ষণতা ও সুবিচারের সহিত এই নূতন বিধি যেন কার্য্যে পরিণত করা হয়। তাহার এই বিধি যে একমাত্র রাজ্যের মঙ্গল সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহা বুঝিয়া প্রজাগণও অবশ্য ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণও সেই ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। গাইকোয়াড় শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে জাতিভেদেরও মূলোচ্ছেদ করিতেছেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে তিনি অস্পৃশ্য মেথর জাতির একটি শিক্ষিত ভদ্র লোককে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে উচ্চ জাতীয় লোকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন,

কিন্তু তাঁহাদের ক্রোধ উন্নতির স্রোতকে কখনও রোধ করিতে পারিবে না।

চিরকাল পৃথিবীতে প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে যেমন মহা মহা যুদ্ধ হইয়া এক দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইত, নূতন জাতি আসিয়া তাহাতে বাস করিত, এখন ততটা না হউক, রক্তস্রোত এখনও অবরুদ্ধ হয় নাই। তুরস্কের সহিত ইটালী যুদ্ধ উপস্থিত করিলেন, স্বার্থ সাধন করিলেন, পুনরায় সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো, গ্রীস প্রভৃতি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কত নররক্তপাত করিলেন। মনে হইতেছিল পারস্য, তিব্বত, চীন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া শত সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিবে। কিন্তু আজ কাল সংবাদ পত্রে যত দূর প্রকাশ হইতেছে তাহাতে মনে হয়, পৃথিবীতে অন্তত কিছু দিনের জন্য শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। চীনদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে সম্রাট রাজ্য করিতে ছিলেন, রাজাকে দেব-ভাবাপন্ন বিশ্বাস করিয়া অসীম মান্য দান করা হইত। কিন্তু কালস্রোতে সেই চীন সাম্রাজ্য ভাসিয়া গেল, সেই প্রাচীন দেশে এক নূতন শাসন প্রণালী স্থাপিত হইল। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপিত হইয়া এখন ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সকল মহাশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হইতেছে। সন্ইয়েটসন্ প্রতিনিধি সভার সভাপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন, আশা হয় চীন এখন নূতন ভাবে শান্তি ও উন্নতি লাভ করিবেন। ইউরোপের যুদ্ধ যদিও আজও শেষ হয় নাই, কিন্তু মনে হয় এখন কামান দ্বারা পরস্পরের প্রাণ নাশের কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং রাজনীতিজ্ঞ গণের যুক্তি, ভয়প্রদর্শন ও পক্ষের বল বিচার দ্বারা ক্রমে শান্তি স্থাপিত হইবে। শান্তির দেবতা পৃথিবীতে কিছু কাল রাজত্ব করিলেই সকল জাগ্রত উদার প্রেমিক লোক বুঝিতে পারিবেন যে ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার শান্তি স্থাপন সকল মঙ্গলের নিদান, তখন আর কেহ স্বার্থান্ধ হইয়া পৃথিবীতে অশান্তি আনয়ন করিতে সাহসী হইবে না।

ঢাকা মহিলা সমিতি :—এই সমিতিটী বহুকাল জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি নূতন সম্পাদিকা শ্রীমতি স্বর্ণলতা বসু মহোদয়ার যত্নে ইহার নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতা মহিলা পরিষদের অনুকরণে এখানেও প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে অভিজ্ঞদিগের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; ইহা খুবই সুখের কথা। কিন্তু সমিতি আরো কিছু কর্মভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ঢাকার একটি অনাথাশ্রম আছে, একটি বিধবাশ্রম আছে; মহিলা সমিতির মহিলাগণ এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি সপ্তাহে একদিন করিয়া এক একটি আশ্রমের জন্য কিছু সময় দিতে পারেন তবে বোধহয় আশ্রম দুইটির অনেক উপকার হইতে পারে। কোন শিক্ষিতা মহিলা একখানা নূতন ভাল বই পড়িয়া ব্যখ্যা করিলেও উপকার হয়। অতএব আমাদের অনুরোধ, সমিতির মহিলাগণ হাতে-কলমে কিছু কাজ আরম্ভ করুন। দেখিবেন, শক্তি খুলিবে, পরেরও উপকার হইবে নিজের উন্নতি হইবে।

(ভারতমহিলা)

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:।"

১৮শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। জুন, ১৯১৩। [১১শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে অদ্ভুতকর্ম্মা পরমদেবতা, তুমি পৃথিবীকে কত সমুদ্র পর্ব্বত নদী বন মরুভূমি শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি বিচিত্র মহত্ব, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ বস্তুদ্বারা সজ্জিত করিয়াছ। ইহার এক একটি বস্তুর ভিতরে তোমার কত জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের শ্রী রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া ভাবুকের মন ভাবরসে বিগলিত হইয়া যায়। এই পৃথিবীতে তোমার সন্তান নর-নারী বাস করিয়া ও ইহার উপর তোমার প্রদত্ত শক্তি সকল প্রয়োগ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন ও আপনাদিগের পার্থিব জীবনের কত আরাম শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা দর্শন করিয়া তোমার জড়সৃষ্টির ও মানবসৃষ্টির মহত্ব উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী বিশ্বাসী কত বিমল আনন্দ লাভ করেন। এই প্রাণহীন জ্ঞানহীন পৃথিবীতে বাস করিয়া এই দুর্ব্বল মোহমুগ্ধ নরনারীগণ তোমার কৃপায় কি উচ্চ জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দময় নিত্য সত্য জগতের আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হন, তাহা দর্শন করিয়া বিশ্বাসী ভক্ত-হৃদয় ভাবে প্রেমে বিগলিত হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করে ও তোমার মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ করিতে জীবনকে উৎসর্গ করে। তাই তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তুমি যদি এত অলৌকিক লীলা করিয়া নরনারীকে বিশ্বাসী ভক্ত করিয়া স্বর্গধামে লইয়া যাইতে বিধি স্থাপন করিয়াছ, তবে দেবতা, বঙ্গনারীকে আশী-র্ব্বাদ কর, ভারতনারীকে আশীর্ব্বাদ কর, তাঁহারা যেন আর সামান্য অন্নবস্ত্রে তৃপ্ত হইয়া না থাকেন, তাঁহারা যেন কেবল গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে আপনাদিগকে ডুবাইয়া না রাখেন, যেন তাঁহারা পৃথিবীতে, নরনারীর জীবনে ও স্বর্গীয় আলোকে তোমার প্রকাশ দর্শন করিয়া ভাবে প্রেমে মত্ত হইয়া তোমার সচ্চিদানন্দঘন-রূপসাগরে নিম-

জ্জিত হইয়া অমৃত পান করিতে পারেন, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

আকর্ষণ বা প্রেম।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি ইহার বিষয় স্বভাবতই আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবী ও ইহার অন্তর্গত ঘন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ সকলের বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে মনুষ্য যত্নবান আছেন। মহা মহা পণ্ডিতগণ ইহার আলোচনা করিতে নিযুক্ত আছেন। সাধারণ ভাবে ইহাকে জড়তত্ত্ব আলোচনা বলে। বস্তুর গুণ ও রাসায়ণ ক্রিয়া সকল অথবা জড়বস্তুর সংযোগ বিয়োগের নিয়ম ও ফলাফল বিচার করা এই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পণ্ডিতগণ এই বিদ্যাদ্বারা জড়-পদার্থ সকলের আদিম অবস্থা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রাচীন-কালে এদেশের পণ্ডিতগণ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পাঁচটিকে মুল উপাদান বলিতেন, এদেশের শাস্ত্রেও প্রচলিত ভাষায় এখনও এই পাঁচটিই সকল জড়বস্তু গঠনের উপাদানরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ষাট সত্তরটি মুলবস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহারা বিশ্বাস করেন যে, আরও অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যাহা এখনও আবিষ্কার করা হয় নাই। রাসায়ণিক পণ্ডিতগণ বলেন, মুলবস্তু পাঁচটি, কি সত্তরটি বা অধিক-সংখ্যক হইতে পারে, কিন্তু সকল বস্তুই পরমাণু সকল দ্বারা গঠিত, এক পরমাণু হইতেই সকল জড়বস্তুর গঠন হয়। এতদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, পরমাণুই সৃষ্টির আদি উপকরণ; তাহারা অনেকগুলি মিশিয়া যে ক্ষুদ্র সমষ্টি হয়, তাহাদ্বারা সমস্ত বস্তু গঠিত হয়। কিন্তু এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত কেন মিলিত হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না, বৃহৎ জড়বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া লয়, এ নিয়ম এস্থানে খাটে না; কারণ সকল পরমাণুই প্রায় সমান। কতকগুলি পরমাণু মিলিয়া এক একটি সমষ্টি প্রস্তুত করে ইহা প্রমাণ হইল, কিন্তু ইহার কারণ কেহ জানে না, কোন্ অপরিচিত আকর্ষণে ইহা ঘটিয়া থাকে। তাহার পর যতরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কঠিন, তরল, বাষ্পীয় বস্তু গঠিত হইতে লাগিল তাহাদিগের পরস্পর মিলিত হই-বার নিয়ম কিছু কিছু জানা হইয়াছে, কিন্তু তাহারও কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এক জাতীয় পরমাণু সমষ্টি সকল একত্র মিলিত হইয়া একটি বিশেষ বস্তু রচনা করিল, তাহার পর রাসায়ণিক, বা জড়ীয় অন্য সকল পরিবর্ত্তনের নিয়ম জানিতে পারা গেল। বস্তু সকল যত বৃহৎ হইতে থাকে ততই তাহাদিগের বিষয় বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে, কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হয় যে আমরা যেমন আদি পরমাণু সক-লের ক্ষুদ্রতম সমষ্টি হইবার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তেমনই পরে যে সকল নিয়ম জানিতে পারিয়াছি তাহার বিষয়ও আমরা মূল সত্য কিছু জানি না,

কেবল কতকগুলি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই; এজন্য স্বীকার করিতে হয় যে,পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া জড়রাজ্যে যতকিছু ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহার মূলে একটা আকর্ষণ কার্য্য করিতেছে তাহাকে জড়ের আকর্ষণ বলে, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ বলিলে ক্ষতি নাই। পরমাণুর সহিত পরমাণুর মিলনের ভাব, শক্তি বা স্বভাবের নাম আকর্ষণ, ইহা প্রেম বই আর কি?

গত কয়েক বৎসর মধ্যে জড়তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে যুগপ্রলয় অনুভব করিতেছেন, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, পরমাণুই সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশ নহে—ম্যাডাম কুরী রেডিয়াম নামক অভিনব ধাতুর আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে পরমাণুকে জড়পদার্থের কঠিন ক্ষুদ্রতম অংশ মনে করা হইত, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বৈদ্যুতিক বা অন্য শক্তি প্রয়োগে পরমাণু চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে তাহার অংশ সকলকে ইয়ন বলা হইতেছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে ইলেক্‌ট্রন বা তড়িত্‌বিন্দু বলিতেছেন, এই সকল অতি ক্ষুদ্র অংশ পুনরায় কি কারণে মিলিত হইয়া পরমাণু গঠন করে তাহা কিন্তু কেহ বলিতে পারেন না। পুনরায় তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, পরমাণু গুলিকে চূর্ণ করিলে তাহারা পুনরায় কোন অজানিত আকর্ষণে বা ভালবাসার প্রভাবে মিলিত হইয়া পুনরায় পরমাণু গঠন করে ও যথাক্রমে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জড়বস্তু রচনা করে। যে পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এই অহেতুকী মিলন-প্রবৃত্তিকে মান্য করিতে শিখিলেন না,তিনি কখন পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবেন না। বায়ু-সমুদ্র, জল সমুদ্র, স্বর্ণ রৌপ্য পারদ লবণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তু এই মিলন স্বভাব হইতে গঠিত হইয়াছে। যদি জলবিন্দু জলবিন্দুর সহিত মিলিত না হইত, ভূস্তরে স্বর্ণবিন্দু অপর স্বর্ণবিন্দুর সহিত মিলিত না হইত, কোন বস্তুই পৃথকত্ব লাভ করিত না। তাহা হইলে এই সুন্দর সৃষ্টির কি অবস্থা হইত, কে ভাবিতে পারে?

যাহা প্রাণহীন, জ্ঞানহীন, জড়, তাহা যে একটি আকর্ষণের দ্বারা বা মিলন-ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। অপর উদ্ভিদ রাজ্যের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহারাও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহারা এক দিকে আপন আপন পৃথকত্ব রক্ষা করিতে যত্নশীল, অথচ এক অন্যের সঙ্গ না পাইলে ফলবান হয় না, স্ফূর্ত্তি পায় না। পণ্ডিতগণ যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করুন, কিন্তু বৃক্ষগণ সৃষ্টির নিয়মে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। নিম্নস্তরের জীবগণের মধ্যেও এই আকর্ষণ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়,কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীব জন্তুর মধ্যে এই আকর্ষণের কার্য্য এত সুস্পষ্ট যে তাহাকে প্রেম না বলিয়া পারা যায় না। মাঠে ৩।৪টা বাছুর ঘাস খাইতেছে, কি এক আকর্ষণে তাহারা পরস্পরের নিকটস্থ হইল, এক পংক্তিবদ্ধ হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল,পরে হয়ত এক বৎস অপরের গাত্র-লেহন করিতে লাগিল। দুইটি বলদ সমস্ত দিন গাড়ী

টানিয়া যখন বিশ্রামের অবসর পাইল তখন এক অন্যের গা চাটিতে লাগিল,—তাহাদের এ ভালবাসা কোথা হইতে আসিল? এখানে স্বার্থের গন্ধ বিন্দুমাত্র নাই, নিরাকার প্রেম জল বাতাস বৃক্ষ লতা তরুগুল্ম কীটপতঙ্গ জীবজন্তু সকলকে শাসন করিল, সকলের শেষে মানুষ পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। আমরা সাধারণত দেখিতে পাই, মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর জীব, আপনার সুখ সুবিধার জন্য কয়েকজনকে মাত্র ভালবাসে, তাহা ব্যতীত সকলকেই পরভাবে, ভালবাসে না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষ আপনার বলিয়া অর্থাৎ স্বার্থের নিয়মে যে কয়েকজনকে ভালবাসে তাহা একটা সাময়িক ও বাহিরের ব্যাপার, প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা পরস্পরকে ভালবাসাই মানুষের স্বভাব। বিস্তৃত জন সমাজের প্রতি সাবধানে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক প্রেমের বন্ধনে সমস্ত নরনারী বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজের এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধ একমাত্র প্রেমের সম্বন্ধ। যদি একজনকে ধরিয়া টান, যদি সামান্য এক জনের প্রতি অন্যায় বা অপ্রেমের ব্যবহার কর তাহা হইলেই দেখিবে সমস্ত সমাজ বিক্ষোভিত হইয়াছে, সকল অঙ্গকে আঘাত করা হইয়াছে—শত সহস্র ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতেছে—তোমাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ নগরের সকল লোকই ভয়ানক স্বার্থপর, সকলেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, পার্শ্বের বাড়ীর লোকের সংবাদ রাখে না, নূতন লোকের নিকট মহানগর একটি মহা অরণ্য বিশেষ, অথচ এই মহানগরের রাজপথের বিমিশ্র জনস্রোতের মধ্যে যদি একজন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, কোন দুর্ঘটনায় আহত হয়, অমনই স্বদেশী বিদেশী সকল হৃদয়ে প্রেম জাগিয়া উঠে; জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে মানুষ প্রেমের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। শতবার সহস্রবার এরূপ দৃশ্য দেখিয়া কে বলিবে যে, মহানগরের লোকগুলি মহা স্বার্থপর। সত্য কথা এই যে রাজপথে সহস্র সহস্র লোক প্রেমের শাসনে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, অথচ সেই মহা জনস্রোতের প্রত্যেক ব্যক্তি অপর সকলের সহিত অপরিলক্ষিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মানবসমাজে প্রেমের শাসনের বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই দেখিতে পাওয়া যে, সমাজ প্রেমেই রচিত, প্রেম দ্বারাই পরিচালিত যেমন মৎস্যগণ জলে বাস করে, মানুষ বায়ুসাগরে বাস করে—অন্যত্র বাস করিতে পারে না, তেমনই সমস্ত নরনারী প্রেমে বাস করে—অপ্রেমে বাস করিতে পারে না। মানুষের সহিত মানুষের কি গূঢ় গভীর সম্বন্ধ তাহা ধারণ করা কঠিন! কি এক রহস্য ইহার ভিতরে আছে, আমরা তাহা ভেদ করিতে পারি না। কোন জনশূন্য স্থানে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিতেছি,

অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি, নানারূপ জীবজন্তু দেখিয়া প্রীত বা ভীত হইতেছি, পুষ্পের গন্ধে আমোদিত হইতেছি, সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি, নদী বন পর্ব্বত প্রভৃতির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, প্রকৃতির বিবিধ ভাবের প্রকাশে মন প্রাণ ডুবিয়া যাইতেছে। এই সময়ে হঠাৎ একটি মানুষ দেখিতে পাইলাম, আর সমস্ত প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া আমার চক্ষু, মন, চিন্তা ভাব অন্য সকল আকর্ষণের বস্তু ত্যাগ করিয়া সেই মানুষের দিকে ধাবিত হইল। যখন মানুষ মানুষকে দেখিল, চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন সমস্ত সৃষ্টি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—মন আপনার মত আর একজনকে পাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে ব্যস্ত হইল—ইহা কিসের টান? ইহা পরিবারের ভালবাসার বা স্বার্থের টান, নহে—ইহার অন্য নাম না দেওয়াই ভাল, ইহা একপ্রকারের আকর্ষণ। এক পরমাণু অপর পরমাণুকে যে অজানিত আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, ইহা সেই জাতীয় আকর্ষণ। ইহা হইতে পারে যে, নির্জ্জন স্থানে এক জন মানুষ অন্য একজন মানুষকে দেখিলে তাহাকে শত্রু মনে করিতে পারে, তাহার প্রাণ বধের চেষ্টা করিতে পারে বা তাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া কোন কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে, তাহা বুদ্ধিবিচারের কথা, পরের কথা, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে গভীর প্রেমের টান বা আকর্ষণ, তাহা প্রমাণিত হইল।

বর্ত্তমান সময় রেলগাড়ী, তাড়িতচালিত যন্ত্রসকল, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি আমাদিগের নানারূপ সেবা করিতেছে, দিন দিন আরও কত শক্তির আবিষ্কার হইবে, কত যন্ত্র নির্ম্মাণ হইবে যাহা দ্বারা আমাদিগের সুখ সুবিধা আরও কত বৃদ্ধি হইবে, আমরা আশা করিতেছি। আমরা জানি যে এ সমস্ত শক্তি চিরদিনই এই পুরাতন পৃথিবীতে ছিল—মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই বলিয়া এত দিন আমরা সে সকল ব্যবহার করিতে পারি নাই, কত কষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। সেইরূপ এই প্রাচীন মানবহৃদয়ে চিরদিন এক অশেষ প্রেমের খনি রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ দেখিতে পায় নাই, আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই, তাই এত অপ্রেমের দুঃখ সহ্য করিয়াছে। আদিম কালে মানুষ এই প্রেমের বিস্তৃত ভাব একেবারেই বুঝিতে পারে নাই বলিয়া প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল। কিন্তু ক্রমে পরিচিত মানুষকে—প্রতিবাসিগণকে ভাল বাসিতে শিখিল, অপরিচিত বা বিদেশী মানুষকে শত্রু মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রেম প্রসারিত হইতে লাগিল, সমাজের মধ্যে যাঁহারা উন্নতমনা হইলেন, যাঁহারা ধর্ম্মভাবে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা প্রেমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সত্যই ধর্ম্মনেতৃগণ ভবিষ্যদ্বক্তা হন। ভবিষ্যতে যে প্রেমের রাজ্য হইবে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। যিশুখ্রীষ্ট বলিলেন, ঈশ্বরকে ও মানুষকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ভালবাসা, ইহা স্বর্গলাভের এক-

মাত্র পথ। শাক্যসিংহ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিলেন, অহঙ্কার বিনাশ করিয়া শুদ্ধ মৈত্রীতে জীবন ধারণ কর—চৈতন্য জগতের প্রেমে মত্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, যেন সকল নরনারীকে ভক্তি দিয়া রক্ষা করিতে পারেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদাভেদ আছে কিন্তু স্বর্গরাজ্য প্রেমরাজ্য, প্রেমই সার ও সত্য ধর্ম্ম এবিষয়ে কোন ধর্ম্মের ভিন্ন মত নাই। কিন্তু ধর্ম্ম চিরদিনই পৃথিবীর সাধারণ লোকের নিকট অনাদৃত, ধর্ম্মাচার্য্যগণ যাহা বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল উপদেশ দেন, তাহা অনুসারে কার্য্য করিলে সংসার চলে না, অর্থ বিত্ত বৃদ্ধি হয় না, এ সংস্কার চিরদিনই আছে। এজন্য ধর্ম্ম যেন একঘ'রে হইয়া সংসারে বাস করেন।

প্রেম যে একমাত্র জীবনোপায়, এ কথা আর এখন কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নয়—বর্ত্তমান সময়ের সুচতুর বণিকগণ ও শিল্পিগণ অতি উত্তমরূপে দেখিতে পাইয়াছেন যে, মানুষ মানুষকে বন্ধুরূপে বা ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিলেই উভয় পক্ষের লাভ হয়, পর বা শত্রুভাবে গ্রহণ করিলে উভয়েরই ক্ষতি। যাঁহারা শিল্পকার্য্য বা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রেমের রাজ্য স্থাপন হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ফলে এই কারণে এখন যুদ্ধ কম হইয়া আসিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও কম হইবে। এ বিষয়ে বণিকদিগের কথায়ও তেমন মান্য না হইতে পারে, কারণ তাঁহারা অন্যকে ভাল বাসিয়া আপনারা ধনী হইতে ইচ্ছা করেন। আজ কাল যে সকল ব্যক্তি শিক্ষাতে, মনের উৎকৃষ্টতাতে ও জীবনের উচ্চ আদর্শের জন্য সকল চিন্তাশীল মহৎ লোকের সম্মানের পাত্র হইয়াছেন, সেই সকল বিশ্বজনীন সমতাবাদী সামাজিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের চিরদিনের সার শিক্ষার সহিত একভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন, সকল প্রকার প্রকৃত উন্নতির ও সুখের জন্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব একমাত্র পথ। পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য সমাগত করা ভিন্ন মনুষ্যের অন্য কর্ত্তব্য নাই। একজনকেও দুঃখে রাখিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। এতদিনে পৃথিবীর বিভিন্নপথের স্বর্গযাত্রিগণের উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই ধ্রুব সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরস্পরের ভালবাসাই পৃথিবীতে জীবনধারণ করিবার পক্ষে ও স্বর্গে প্রবেশ লাভের পক্ষে একমাত্র পথ।

পরমাণু পরমাণুর সহিত কেন মিলিত হইল তাহা পরমাণুগণ জানে না, জলবিন্দু জলবিন্দুর সহিত কেন মিলিত হইল তাহা তাহারা জানে না, পশুগণ পশুগণের সহিত কেন মিলিত হইল তাহা তাহারা জানে না, মানুষ যখন প্রথম মানুষের সহিত মিলিত হইয়াছিল তখন মানুষও জানিয়া বুঝিয়া মিলে নাই, কি এক আকর্ষণে মিলিয়াছিল; ক্রমে জগতে ধার্ম্মিক লোক আসিলেন, প্রেমরাজ্যের পূর্ব্বাভাসের কথা বলিলেন। স্বার্থপর বণিক নিঃস্বার্থ প্রেমে মিলিত হইতে বলিলেন, শেষে বিশ্বভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রচারক নব উৎসাহে প্রেমরাজ্যের কথা জগৎকে বলিতেছেন। নবযুগে প্রাচীন

...হবিধি, বর্ত্তমান যুগোচ্চ জ্ঞান ও জীবন্ত জাগ্রত দেবতার প্রত্যাদেশ বলিতেছে—প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই মোক্ষ, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। ইহাকে আর জড়বাজ্যের ভাষাতে আকর্ষণ বলিও না, বল সকলের অন্তরে অপর সকলের জন্য প্রেম রহিয়াছে অর্থাৎ প্রেমময় দেবতা প্রত্যেকের অন্তরে বসিয়া সকলকে প্রেম করিতেছেন, তাঁহার ইঙ্গিতে সকলের সহিত শুদ্ধ প্রেমে মিলিত হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিতে দেও।

বিধবা বালার দুঃখ গাথা।

একি কাজ, বিশ্বরাজ, তোমার কি সাজে ?
ন্যায়বান, তব নাম, চরাচর মাঝে।
লোকে কয়, দয়াময়, শোক দুঃখহারী ;
হরি দুঃখ, দাও সুখ, ভবের কাণ্ডারী।
তবে কেন, আমা হেন, দুঃখিনী বালার,
এ ধরায়, পুত্র হায়, এক ধন সার,
যার তরে, ছিনু প'ড়ে, মরমে মরিয়া,
কোন্ প্রাণে, সেই ধনে, লইলে হরিয়া ?
অতি দীনা, পতিহীনা, করেছ আমায়,
তাও আমি, অন্তর্য্যামী, সয়েছি সে হায় ;
শুধু তার, মনোহর, মুখপানে চেয়ে,
রেখেছিনু ক্ষীণতনু, দুঃখ জ্বালা সয়ে।
পরমেশ, তাও শেষ, করিলে আমার,
এ ধরায়, কিছু হায়, রাখিলে না আর।
কিবা সুখ, দিয়ে দুঃখ আমা হেন জনে ?
জগতের দুঃখভার আমার ক্রন্দনে
বাড়াইলে, হরে নিলে আমার সকল,
কেন তবে মোরে ভবে রাখিলে কেবল।
(কোন্)
পুণ্যবলে, দিয়েছিলে, এ হেন সংসারে,
কোন্ পাপে, পরিতাপে, ভাসালে আমারে ?
যদি সুখ ভরি বুক দিলেগো আনিয়া,
যদি স্নেহ ভরি গেহ দিলেগো ঢালিয়া,
তবে কেন নিলে পুনঃ কাড়ি সে সকল ?
শুধু মোরে আঁখিনীরে ভাসাতে কেবল।
কার হয়, কার যায়, আমার মতন
কেবা হাসে, কেবা ভাসে, হারায়ে রতন ॥

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।
খগোল।

নবযুগে মহর্ষির তিনটী বিশেষ দান। *

প্রতিভাসম্পন্ন ব্রহ্মভক্তের জীবন দিগন্তপ্রসারিত অতল স্পর্শ জলধিসদৃশ। কেহ উহার বিশালতায় মুগ্ধ, কেহবা উহার গাম্ভীর্য্যে বিমোহিত, অপর কেহবা উহার অন্তর্নিহিত ধনসম্পদের জন্য লালায়িত। ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন আধ্যাত্মিক সম্পদের এইরূপ একটী অতল স্পর্শ সমুদ্র বিশেষ। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ হইতে এ পর্য্যন্ত কত লোক কত ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু এখনও কত অজানিত সাধনতত্ত্ব, কত অপরিজ্ঞাত ধর্ম্মনিষ্ঠা লোক চক্ষুর অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। বহুবার এই মহজ্জীবন এই পত্রিকায় আলোচিত হইয়া থাকিলেও,

* ৬ই মাঘ মহর্ষির স্বর্গারোহণ উপলক্ষে হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

সাহসে ভর করিয়া এ যুগে তাঁহার তিনটী বিশেষ দান সম্বন্ধে আজ দু একটী কথা প্রতিভার পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে সাহসিক হইতেছি।

মহর্ষির অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রসপানের জলন্ত দৃষ্টান্ত নবযুগের বিশেষ শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছে, এবং এই শ্রদ্ধা হইতে জাতীয় জীবনে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এ প্রবন্ধে সে সব বিষয় কিছু বলিতে চাই না, যে তিনটী বিশেষ দানের জন্য আমার মনে হয় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে, আজ সে বিষয়েই অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১। আমার মনে হয় ধর্ম্মজগতে মহর্ষির সর্ব্বপ্রধান দান এই যে, তিনি বহুকাল পরে ভারতে ধর্ম্মকে ব্রহ্মাভিমুখীন করিয়াছেন। সকল খাঁটি ধর্ম্মই ব্রহ্মাভিমুখীন বা ব্রহ্মকেন্দ্রীয় God-centred সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা এদেশের ধর্ম্মের ইতিহাস একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাই, বহুকাল এদেশে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম বা কুধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছিল। খাঁটি ধর্ম্মের অর্থ ব্রহ্মগতজীবন, যখনই এই জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়, তখনই জনসমাজ সজীব ভাব ধারণ করে এবং আধ্যাত্মিক ফল পুষ্পে সুশোভিত হয়, কালক্রমে যখন এই ধর্ম্মস্রোত শুখাইয়া যায় তখনই জাতি মৃতপ্রায় হয়, যুগধর্ম্ম আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দশাও তাহাই হইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে এদেশে অনেক অধর্ম্মাচরণ হইতেছিল। ভারতের চিরন্তন ধন ব্রহ্মার্চ্চনার পরিবর্ত্তে জনসমাজ ভ্রান্ত শাস্ত্র, ভ্রান্ত গুরু, এবং হেয় দেশাচারের অর্চ্চনা করিতেছিল। মানব গুরু, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল (এখনও অনেক লোকের এ বিশ্বাস আছে) যে, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই এগুলিকে মানিয়া লইতে হইবে। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার মানবাত্মার ব্রহ্মাভিমুখীন গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রও সত্য ঈশ্বরের নিত্য বাণীর স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। ইহার মধ্যে বেদের প্রাধান্যই অতি প্রবল ছিল। অনেকের এরূপ বিশ্বাস ছিল বেদে আস্থাহীন ব্যক্তির হিন্দু নামে অধিকার নাই; এই বিশ্বাসের প্রসার এত বিস্তৃত ছিল যে, আমরা দেখিতে পাই, ভারতের প্রায় সকল জ্ঞানার্থীই বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতেন। এমনকি নাস্তিক দার্শনিকেরাও বেদের দোহাই দিতে ছাড়িতেন না। ইহা আপনারা সকলেই জানেন, বেদ প্রকৃতপক্ষে অভ্রান্ত কিনা ইহা মীমাংসার জন্য মহর্ষি বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি চারিজনকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি এবং ইহাদের আলোচনার ফলে এই জানিতে পারিলেন যে, বেদ কখনও অভ্রান্ত নহে, যে দিন তিনি ইহা ঘোষণা করিলেন, ভারতে সেদিন একটী চিরস্মরণীয় দিন। ইয়োরোপে মার্টিন লুথার Reformation নামে যে ধর্ম্মসংস্কারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন মহর্ষির এই সংস্কারের মূল্য

তাহা হইতেও অনেক অধিক। মার্টিন লুথার রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মগুরু পোপ অভ্রান্ত, এ মতের সত্যতা অস্বীকার করিয়া একমাত্র বাইবেলই অভ্রান্ত এবং মানুষের স্বাধীনভাবে তাহার আলোচনা করিবার অধিকার আছে, এই মত প্রচার করেন। বাইবেল অভ্রান্ত মার্টিন লুথার এ মতের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহর্ষি অসাধারণ ধর্ম্মপ্রতিভাবলে ভারতে বাইবেলস্থানীয় বেদের ভ্রান্ততা অকুতোভয়ে ঘোষণা করিলেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিত Max Muller এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Such heroism is unprecedented in the history of religions" অর্থাৎ ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ বীরত্ব আর দেখা যায় নাই। সে যাহা হউক, এই দিন হইতেই ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। অনেকদিন আমার মনে হইয়াছে, মহর্ষির আবিষ্কারের সহিত জ্যোতির্বেত্তা Copernicusএর আবিষ্কারের তুলনা হইতে পারে। Copernicusএর পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানীয়, সূর্য্য চন্দ্র এবং গ্রহগুলি এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে, কিন্তু Copernicus দেখাইলেন এ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলি উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এবং উহার আলোকেই আলোকিত হইতেছে, একমাত্র সূর্য্যই সৌর জগতের সকল আলোকের কেন্দ্রস্থানীয়। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত পার্থিব গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি নিজেদের আলোকে আলোকিত এবং ইহারাই যেন কেন্দ্রস্থানীয়। কিন্তু মহর্ষি দেখাইলেন, ইহাদের স্বকীয় কোনও আলোক নাই, ব্রহ্মই সকল আলোকের কেন্দ্রস্বরূপ। শত শত শাস্ত্র, সহস্র সহস্র গুরু তাঁহারই আলোকে আলোকিত হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ধরিতে হইবে। তাই মনে হয় মহর্ষিকে এযুগে ধর্ম্মজগতের Copernicus বলিয়া মনে করিতে পারি। নব্যভারতে ধর্ম্মকে নরকেন্দ্রীয় (Homo-centric) হইতে ব্রহ্মকেন্দ্রীয় (Theo-centric) করা মহর্ষির একটী প্রধান কাজ।

২। ধর্ম্মজগতে মহর্ষির দ্বিতীয় দান, তাঁহার আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মপুত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। এ কথাটা শুনিয়া অনেকেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ব্রহ্মানন্দ নিজেই যখন মহর্ষিকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া স্বীকার করিতেন, তখন নিশ্চয়ই এ কথার কোনও সার্থকতা আছে। ব্রহ্মানন্দ মহর্ষির ধর্ম্মপুত্র, ইহা বলিলে কেশবচন্দ্র আপনার অতুল ধর্ম্মসম্পদ সকলই উত্তরাধিকারসূত্রে মহর্ষি হইতে লাভ করিয়াছিলেন এ কথা বলা হইল না; আমি ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করি, ব্রহ্মানন্দ আপনার ধর্ম্মরত্ন ব্রহ্ম হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। বিধাতার বিশেষ কৃপায় জীবনের প্রথম হইতেই ব্রহ্মানন্দের জীবনে তাহার অসাধারণ ধর্ম্মপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং কালক্রমে তাহাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া

জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত মহর্ষির জীবনের যোগ এক মাহেন্দ্রক্ষণে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশ্বাসে বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, তাই কেশবের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মাগ্নি মহর্ষির জীবনের সংস্পর্শে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহা আর সন্দেহ করা যায় না। এই সম্পর্কে মহম্মদের জীবনের একটী কথা মনে হইতেছে। মহম্মদের দ্বিতীয়া পত্নী খদিজা একদিন প্রথমা পত্নী আয়েসার প্রতি মহম্মদের অত্যধিক প্রেম উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন, "আমি সুন্দরী, কিন্তু আয়েসা কুরূপা, তবুও তুমি আমাকে ছাড়িয়া উহাকে অত ভালবাস কেন?" মহম্মদ ইহার উত্তরে বলিলেন, "আয়েসাকে ভালবাসি কেন? যখন সমুদায় জগত আমার ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিত, তখন আয়েসা প্রথম তাহাতে বিশ্বাসী হয়, তাহাকে ভালবাসিব না?" মহম্মদ অসহায় অবস্থায় আপনার ধর্ম্মপ্রাণা ভার্য্যার বিশ্বাসে মহাবলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন। ইহাই ধর্ম্মজগতের নিয়ম। তাই বলিতেছিলাম, যখন সকলে ব্রহ্মকে ভুলিয়াছিল, কেশব সেই ব্রহ্মে বিশ্বাসী হইয়া যখন দেখিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাস বুকে ধরিয়া নবধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তখন কেশবের বিশ্বাস অমিতবলে বলীয়ান্ হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসবলেই তিনি মহর্ষির নিকট ব্রহ্মানন্দ নাম পাইয়াছিলেন। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, ব্রাহ্মসাধারণের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান যে মহর্ষির জীবনপ্রতিভার নিকট বহুলরূপে ঋণী, ইহা আর সন্দেহ করা যায় না। মহর্ষির জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবে কেশবের বিশ্বাসবহ্নি অশেষগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই জন্যই বুঝি ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়াছিলেন।

৩। মহর্ষির প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির নব্যভারতে তৃতীয় দান। মহর্ষির অধ্যাত্মদৃষ্টি যে নবীন কবি রবিকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কেশবের আধ্যাত্মিকতা যেমন কবি চিরঞ্জীবের অনুপ্রেরণার সহায় হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথের সুমহান ধর্ম্মভাবও সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার প্রাণ। সান্তে অনন্তের এবং দুঃখে আনন্দের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই দুইটী বিশেষ ভাব। এই দুইটীই মহর্ষির জীবন হইতে রবীন্দ্রনাথে বিশেষভাবে সংক্রামিত হইয়াছিল। মহর্ষির দেবচরিত্রের ছায়াতে বর্দ্ধিত না হইলে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ কতদূর বিকাশ প্রাপ্ত হইত কে জানে? এই বিষয়টী বারান্তরে বিশদরূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তাই আমার মনে হয়, ধর্ম্মকে ব্রহ্মকেন্দ্রীয় করিয়া এবং বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি কেশবচন্দ্র ও আদর্শ কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মহাযোগী দেবেন্দ্রনাথ যে নব্যভারতের সুমহান্ কল্যাণ করিয়াছেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

মিলন।

মিলনই সংসারে স্বভাবসিদ্ধ। মা

মিলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সকলকে সতত মিলিতে শিখাইতেছে। ঐ দেখ! নীলাকাশে একখণ্ড মেঘ ছুটিয়া গিয়া অপর একটী মেঘের সহিত মিলিত হইল। কেন জগতে মিলনের জন্য সকলে সদাই উৎসুক? কেন একে অন্যের সংসর্গ লাভে বঞ্চিত হইলে আপনাকে বড়ই ভারবহ ও হতভাগ্য মনে করে? ইহার প্রকৃত কারণ সুখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মিলনে যে এক অনির্বচনীয় সুখের উদয় হয় সেই সুখ সকলকে ইহার দিকে টানিয়া আনে। কিন্তু প্রকৃত মিলন যে কি মনোহর ও নয়নাভিরাম তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ধিক্ মানব! তোমাকে শতবার ধিক্! তুমি প্রকৃত মিলনের জন্য লালায়িত না হইয়া তুচ্ছ সাংসারিক মিলনে ব্যস্ত। ভগবচ্চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস, একত্র আলাপ কর, তবে তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে। ইহা প্রকৃত, অকৃত্রিম ও উৎকৃষ্ট মিলন। ভগবানের চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকা ভিন্ন আমাদের মুক্তি কোথায়? হে পাঠক পাঠিকাগণ! বল দেখি এ সংসারে কয়জন এই মিলন লাভের জন্য ব্যগ্র। আমরা সাংসারিক জীব, সংসারই আমাদের লীলাক্ষেত্র; সেই নিমিত্ত আমরা এই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এবং ইহার মিলন লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা উচ্চে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব না? কেবলই কি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কূপে আজীবন নিমজ্জিত হইয়া থাকিব? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। সতী যেমন পতির সহিত মিলনের জন্য প্রাণ মন বিসর্জ্জন করে, আমাদেরও সেইরূপ ভগবানের সহিত মিলনের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জগতে এমন লোক বহু দৃষ্ট হয়, যাহারা সাংসারিক অকিঞ্চিৎকর মিলন লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু তাহাতে কি তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অকৃত্রিম ও প্রকৃত সুখ পাইয়াছেন? ভগবানের কি সুন্দর কৌশল যে, দেখিলে বিস্ময়ে আত্মহারা না হইয়া থাকা যায় না! পরম পিতা ভগবান্ জাগতিক মিলন-সাহায্যে জগতবাসীকে এই দেখাইয়া দিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক মিলনের মত এমন মনোহর সামগ্রী আর নাই। আমরা যদি প্রকৃত ও নির্ম্মল সুখলাভে ইচ্ছুক হই, তবে আমাদের ভগবানের চরণে শরণ লওয়া আবশ্যক, তাঁহার নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করা উচিত, "হে দয়াময়! তুমি আমাকে দরশন দাও। আমি ঘোর নারকী। আমাকে তোমার কোলে টানিয়া লও। আমি তোমার সহিত মনে প্রাণে সর্ব্ববিষয়ে মিলিত হইতে চাই! হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" এইরূপ নিয়মাবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন লাভ করিতে পারি ও তাহা হইলে আমরা বিমলানন্দ ভোগে সক্ষম হইতে পারি।

মালদহ।
৩১।৫।১৩। } শ্রীমু—

সুনীতিকলেজের পারিতোষিক বিতরণ।

বিগত ১২ই এপ্রেল শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকার সময় ল্যান্সডাউন হলে সুনীতি কলেজের পারিতোষিক বিতরণ খুব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহামতি লেডি কারমাইকেল স্বহস্তে বালিকাদিগকে খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত পারিতোষিক দান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে মাননীয়া মহারাণী কুচবেহারাধিশ্বরী সি, আই, কুমারী কারমাইকেল, অনারেবল মিঃ ডিউক, কুচবেহার ষ্টেটের ভাবী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কলিন্স, বর্ত্তমান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডেনটিথ এবং আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ইংরাজমহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় দেওয়ান বাহাদুর মিঃ পি, এন ঘোষ, জজ মিঃ এন্ এন্ সেন, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, পুলিশবিভাগের উচ্চতম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিঃ গজেন্দ্রনারায়ণ, স্থানীয় জমিদার মিঃ এম এম্ বকসী, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জে, জি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলাও উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে বালিকাদিগের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করা হয়।

(১)

আশার আলোক আজ উদিল আকাশে—

"বিহার" গগনে নব অরুণ উদয়,

নবীন উৎসাহ, আশা হৃদয়ে প্রকাশে,

বড় শুভদিন আজ আমাদের হয়।

(২)

এসেছ বিহার রাজ্যে উৎসুক হৃদয়ে

মহোদয়া "লেডিকারমাইকেল" তুমি,

দেখ নৃপ "নৃপেন্দ্রের" প্রিয় বিদ্যালয়ে,

ভক্তি-উপহার করে দিই সবে নমি।

(৩)

বহু দিন হ'তে মোরা ছিলাম আশায়

দেখিতে তোমারে এই বিহার প্রদেশে,

ছিলাম যেমন মোরা তব প্রতীক্ষায়

তেমনি এসেছ তুমি কত ভালবেসে।

(৪)

তব ভালবাসা মোরা জেনেছি সকলে,

নও পরিচিতা শুধু বঙ্গ মহিলার,

দূর দাক্ষিণাত্যে দূর মান্দ্রাজ অঞ্চলে

এখনও সুখ্যাতি তব, মুখেতে সবার।

(৫)

সেখানে যেমন তুমি আর্য্য মহিলার

উন্নতির পথ চির দিয়াছ খুলিয়া,

সেইরূপ তুমি হেথা বঙ্গ মহিলার

উন্নতি সাধনে আজ এসেছ ছুটিয়া।

(৬)

এখানেও দিলে তুমি উৎসাহ কতই

জেনেছি শুনেছি মোরা—তাই শুভদিনে

আমাদের তাই আজ আনন্দ বড়ই

তব দীনা কন্যা মোরা এসেছি এখানে।

(৭)

এসেছ ভালই তুমি—আরও আসিও

দেখে যেও আমাদের এমনি করিয়া,

দেখে যেও আমাদের—কভুনা ভুলিও,

ধন্য হব মোরা তোমা ভক্তি, শ্রদ্ধা দিয়া।

(৮)

এসেছ যখন—লও প্রণতি মোদের,
আমরা তোমার কন্যা রাখিব স্মরণে,
কোমল আদর স্নেহ তব হৃদয়ের,
দিই নমস্কার আজ তোমার চরণে।

সুনীতিকলেজের বিবরণ।

১৯১২—১৩।

শিক্ষাপ্রণালী।—বিগত চারি বৎসর হইতে সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান চলিয়া আসিতেছে। বালিকাদিগের উপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা এবং নানাবিধ শিল্প-শিক্ষাদানই এ প্রণালীর উদ্দেশ্য।

বালিকাগণের মধ্যে যে বালিকা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে স্কুলের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে মাসিক দুই টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে, Anglo Vernacular Lower Primary পরীক্ষায় যে দুইটী বালিকা দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী আদিম কোচবিহারী ও অপরটী রাজবংশী। পরীক্ষার ফল বিগত ১৩ই জানুয়ারির কোচবিহার গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাত্রীসংখ্যা।—১৯১৩ সালে মার্চ্চ মাসের ছাত্রীসংখ্যা ১৮৫। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৭ জন অধিক। গড় উপস্থিতি ১৭০ জন, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২০ জন অধিক। এই সকল ছাত্রীদিগের মধ্যে ১৩ জন মুসলমান, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৪ জন অধিক, ৪ জন ব্রাহ্ম অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা একজন অধিক। ১ জন খ্রীষ্টিয়ান, ৩৭ জন রাজগণ ও কোচবিহারের আদিম অধিবাসী, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৭ জন অধিক। এই ৩৭ জনের মধ্যে ১৫টী বালিকা রাজগণ-পরিবারভুক্ত। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে, স্থানীয় রাজগণ-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

মহিলা বিভাগ।—উন্নত ও অধিক বয়স্কা মহিলাগণই এ বিভাগের ছাত্রী। ইঁহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৪০ জন। এই বিভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ইঁহারা সূচিকার্য্য, পশম ও জরি প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদিগকে পুস্তকাদিও পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা ইঁহাদের সময়ের অসদ্ভাব হেতু তদনুরূপ শিক্ষায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। শিক্ষয়িত্রী ইঁহাদের উপযোগী গার্হস্থ্য, ঐতিহাসিক ও সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিষয়ে বক্তৃতাচ্ছলে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সকল মহিলাগণের মধ্যে ৫ জন রাজগণ ও ৩৫ জন আদিম ও স্থানীয় কোচবিহার পরিবার হইতে শিক্ষার্থ আসিতেছেন। অবস্থার প্রতিকূলতানিবন্ধন রাজগণ ও এদেশীয় অনেক মহিলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা। নিয়মিত উপস্থিত হইতে পারেন না।

মক্ষিকা মানবের শত্রু।

লক্ষপতি হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই সদাসর্ব্বদা মক্ষিকার সহিত পরি-

চিত হইতেছে। যাহা কিছু পরিত্যক্ত ও মানবের পক্ষে অনিষ্টকারী, তাহাই মক্ষিকার আকর্ষণের ও বাসের উপযোগী। কেবল যে তাহারা আবর্জনা ইত্যাদিতে বাস করে তাহা নহে, মানবের সঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করা দুরূহ ব্যাপার। মক্ষিকার ক্ষুদ্র কায় ও নিরীহ ব্যবহার দর্শনে মনে করি যে, তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে না। কিন্তু মক্ষিকা সম্বন্ধে বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে অবহেলা করিলেও আমাদের ভীষণ দুর্ঘটনা সম্ভবপর। মক্ষিকা যে শত শত ব্যক্তিকে ভীষণ মারাত্মক রোগাক্রান্ত করিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সামান্য মক্ষিকা মানবসমাজে কি ভীষণ ব্যাধি-বর্দ্ধক ও জনসংক্ষয়ের কি দারুণ শত্রু, এবিষয়ে আমরা এ প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা অন্যূন ৬,৬০,০০০ জীবাণুর আবাসভূমি কাহারও কাহারও মতে একটী মক্ষিকা শতাধিক ডিম্ব এককালে প্রসব করে এবং এক ঋতুতে দ্বাদশ বংশ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

উপরিলিখিত হিসাবের অনুপাতে একটী মক্ষিকা হইতে ১,০৯৬, ৮১,২৪৯,-৩১০,৭২০,০০০,০০০,০০০,০০০ মক্ষিকা এক ঋতুতে উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা অচিন্তনীয় ও অপূর্ব্ব, মানববুদ্ধির অবোধ্য ঘটনা।

মশক কেবল মাত্র ম্যালেরিয়া-বীজাণু বহনকারী। কিন্তু মক্ষিকা নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু বহন করে। আবর্জ্জনাময় স্থান হইতে নানা প্রকার রোগের বীজাণু সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিতে তাহা মিশ্রিত করিয়া আমাদিগকে কিরূপ সহজে ব্যাধি মন্দির করে তাহা সহজেই বোধগম্য।

কলেরা, আমাশয়, ইঙ্ক্ষাবসন্ত, শিরঃশ্লেষ্মা, কণ্ঠনালীর প্রদাহ Laryngitis, শ্বাসনালী প্রদাহ Bronchitis, যক্ষ্মা, উদরাময়, সান্নিপাতিক বিকার (Typhoid fever), ডিপ্থিরিয়া, Anthrax Pharyngitis ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, Meningitis ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধি মক্ষিকাবাহিত বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই ক্ষুদ্র অথচ ভীষণ প্রাণী মক্ষিকার হস্ত হইতে রক্ষা লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে দুইটী পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যদেশীয় বিজ্ঞানবিৎ ও চিকিৎসকগণ মক্ষিকা ধ্বংস করিতে জনসাধারণকে উপদেশ দিতেছেন। বস্তুতঃ মক্ষিকা বিনাশ করিলে ঐ বহুরোগ বীজাণুবাহী ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র জীবের প্রচণ্ড প্রকোপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে মক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু শীতের সময়ে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মক্ষিকা বিনাশের উহা প্রকৃষ্ট কাল। প্রতি গৃহস্থ তৎকালে যদি মক্ষিকা বিনাশে বিশেষ চেষ্টা করেন তিনি আপন পরিবারের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। তৎকালীন এক মক্ষিকা বিনাশে সহস্র

সহস্র ভাবী মক্ষিকার বিনাশ সাধিত হইবে।

আবাসগৃহ ও পারিপার্শ্বিক সর্ব্বস্থান পরিষ্কার ও আবর্জ্জনাশূন্য করিয়া রক্ষা করা মক্ষিকা হইতে পরিত্রাণের দ্বিতীয় পথ। আবর্জ্জনাহীন, সূর্য্যালোকে আলোকিত ও মুক্ত স্বাস্থ্যকর বায়ুর ক্রীড়াভূমি আবাসকক্ষে প্রায় মক্ষিকা থাকিতে দেখা যায় না। রন্ধনশালা, ভোজনাগার বা খাদ্য গ্রহণের স্থান যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল-সূর্য্য-কিরণে আলোকিত থাকে। সেস্থলে যেন পবনের গতি অবারিত হয় ও আলোকের দ্বার রুদ্ধ না থাকে। অনেক গৃহস্থ প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বা বাটীর সম্মুখে পথের এক কোণে আবর্জ্জনা সমূহ একত্রীভূত করিয়া রাখেন। সেই স্থানে মক্ষিকাদলের মহা সভার অধিবেশন হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা বীজাণু জড়িত দেহ লইয়া গৃহস্থের বাটীর বিভিন্নাংশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে পরিবারের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। রন্ধনগৃহের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার আবর্জ্জনা না থাকিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বীজাণুপূর্ণ মক্ষিকা একবার রন্ধনস্থলে প্রবেশলাভ করিলে কি ভীষণ অনিষ্ট করিতে পারে তাহা সহজে বোধগম্য. মক্ষিকাগণের দেহ যখন বীজাণুদ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা কোন বস্তুর উপর উপবেশন পূর্ব্বক, তাহাতে কিছু বীজাণু দান করিয়া আপন ভার লাঘব করে। আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে অসাবধানতাবশতঃ প্রতিদিন এইরূপ কত বীজাণু মিশ্রিত হইতেছে। আমরা যদি অনুসন্ধান করি, তবে সহজেই দেখিতে পাইব যে আমাদের বহুরোগ এই দূষিত এবং বিষাক্ত খাদ্য ও পানীয় হইতে উৎপাদিত।

মক্ষিকা সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাধি সংখ্যারও হ্রাস হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই নরশত্রুর বিনাশের জন্য বিংশ শতাব্দীর মানবকে অধিক বেগ পাইতে হইবে। আপনাদের আলস্য জড়তাপরিহার পূর্ব্বক ক্ষুদ্রকে পরিহাস না করিয়া কিছু যত্নবান হইলে এ শত্রু শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের বংশধর ভাবী উন্নততর মানবজাতি আর মক্ষিকা দ্বারা এত প্রপীড়িত হইয়া অস্বাস্থ্যের দাস হইবে না।

মক্ষিকা বিনাশের নিম্নলিখিত উপায়ের প্রত্যেকটীই বিশেষ উপযোগী। আবর্জ্জনাদি পুড়াইয়া, পুতিয়া বা তাহার উপর জীবাণু নাশক ঔষধ দিতে হইবে। যেখানে মক্ষিকা ডিম পাড়িয়াছে বুঝা যাইবে তাহার উপর "ক্লোরাইড অব্ লাইম" বা হিরাকস গুড়া করিয়া দিতে হইবে।

প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের সময় বিশেষ করিয়া দেখিয়া কিনিতে হইবে ও পরে আবৃত স্থানে রাখিতে হইবে যে সকল দোকানে খাদ্যাদি আবৃত না থাকে, সেখান হইতে কিছুই কেনা উচিত নয়। আস্তাবল ও গোয়াল সমূহ যাহাতে সকল সময়ে পরিষ্কার থাকে তাহার উপায় করা উচিত। আস্তাবল ও গোয়ালে আবর্জ্জনাদির স্তূপ মক্ষিকা জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

সহরের প্রত্যেক খাবার ও ফল বিক্রেতাকে তাহার পণ্য আবৃত রাখিবার জন্য বাধ্য করা উচিত। মানব সমাজে নানা রোগ আনয়নকারি-মক্ষিকা বিনাশের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত।

বর্ষা আগত প্রায়। এসময় যাহাতে আবর্জনার স্তূপ বাসগৃহের নিকট হইতে দূরীভূত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক পল্লী-বাসীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যসমাচার।

নব্য তুর্কীরমণী।

(The Literary Digest) :—

Les Documents du Progres নামক ফরাসী পত্রিকায় সেদিন দেখিলাম এক ফরাসী লেখক তুর্কী রমণীদের বিষয়ে লিখিতে গিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বড়ই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তিনি বলেন যে তুর্কীরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা এখনো ভয়ঙ্কর বর্ব্বর রকমেরই আছে। কোনো স্ত্রীলোক ঘোমটা খুলিয়া পথে বাহির হইতে পারে না; যদি দুঃসাহসিকা কেহ ঘোমটা খুলিয়া বাহির হয় তবে পুরুষ যে কেহ তাহাকে দেখে সেই তাহাকে অপমান করে, ঢেলা-ধূলা ছুড়িয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করে। একজন গ্রীক একটি তুর্কী রমণীকে ভালো বাসিয়াছিল, ভালো বাসাও পাইয়াছিল; সে রমণীর পিতামাতার নিকট আপনার প্রণয়িনীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাঁহারা প্রত্যাখ্যান ত করিলেনই, অধিকন্তু কন্যাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন—বিদেশী বিধর্ম্মীর সহিত বিবাহে বাধা দিবার জন্য ততটা নহে যতটা পর্দ্দার বাহিরে গিয়া কন্যার আবরুহানি হইবে বলিয়া! অবশেষে প্রণয়িযুগল মিলনের অন্য কোনো উপায় না পাইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু উত্তেজিত জনসঙ্ঘ শীঘ্রই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল।

কিন্তু The Literary Digest তুর্কী সংবাদ পত্র 'ইকদম্' হইতে তুর্কী রমণীদের যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা ঠিক উল্টা। তুর্কীরা গৃহসংস্কার আরম্ভ করিয়া বলসঞ্চয় করিবার উপক্রম করিবার মুখেই পরশ্রী-কাতর য়ুরোপীয় শক্তিরা তাহার উন্নতির পথে বার বার বাধা উপস্থিত করিতেছে, পাছে অখৃষ্টান জাতি বলবান হইয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে। এইজন্য তুর্কীর নব্য সম্প্রদায় রক্ষণশীল ও অত্যাচারী সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া যখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংস্কারে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইটালি তুর্কীর দূরস্থ রাজ্য ত্রিপলি আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লইল; সে উৎপাত চুকিতে না চুকিতে তুর্কীর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি ভূতপূর্ব্ব বিজেতার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া সমর ঘোষণা করিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া তুর্কী ক্রমাগত পরাজিত হইতেছে। ইহার ফলে তুর্কীদের মন একেবারে দমিয়া গেছে; আত্মপ্রত্যয় তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে; দেশহিতৈষণা তাহাদের শিথিল হইয়া

আসিয়াছে। তাহারা যে য়ুরোপবিজয়ী বীর তুর্কীদেরই বংশধর, তাহাদের বীরত্ব ও বিজয়ের উত্তরাধিকার যে বড় সামান্য নয়, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তুর্কী নামে পরিচয় দিতে তাহাদের হৃদয়ের রক্ত গর্ব্বে গৌরবে নাচিয়া উঠে না; ইংরেজ, জার্ম্মান, রুশ প্রভৃতির সমকক্ষ বীর বলিয়া সে তাহাদের পাশে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না; তাহারা নিজের দেশকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতে পারিতেছে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে য়ুরোপীয়েরা তাহাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তুর্কদিগকে হয় ঘৃণা করিতেছে নয়ত কৃপা দেখাইতেছে।

দেশের ও দেশের পুরুষদের যখন এই অবস্থা তখন সেই দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পুরুষদিগকে উদ্বোধিত করিবার ভার লইয়াছেন পুরুষের সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী রমণীরা। দেশের এই দুর্দ্দিনে পুরুষেরা যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছে তখন রমণীরা আর হারেমের গণ্ডির ভিতর বিলাস ব্যসনে নিশ্চিন্ত হইয়া নাই; তাঁহারা এতকালের প্রথা ও সংস্কার একই দিনে ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়াছেন এবং পুরুষদিগকে অতীত গৌরবের কাহিনীতে উদ্বোধিত করিয়া ভবিষ্যতের মুক্তির বাণী শুনাইতেছেন। এখন যেখানে সেখানে প্রকাশ্য সভায় মহিলারা বক্তৃতা দিয়া দেশপ্রীতির ও বীরত্বের নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে বিধূনিত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছেন, দেশরক্ষার জন্য সমর যজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে পুরুষদিগকে তাঁহারা আহ্বান করিতেছেন। পুরুষেরা রমণীর এই শক্তি ও পটুতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের এক সভা হয়; সুলতানা নীমৎ হানুম এই সভার নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তুর্কীর প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হালেদ হানুম জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশরক্ষার জন্য আপনার দেহের সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া যখন দান করিলেন, তখন সভায় যেন আগুন ধরিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে বারোটি বাক্স ভূষণ-জহরাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"নাই বা থাক আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, চাই শুধু প্রবল দেশপ্রীতি! নরনারী শিশু বৃদ্ধ প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যদি আমরা গতিরোধ করি, জগতে এমন কোন নৃশংস শক্তিশালী শত্রু নাই যে সে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, আমাদিগকে বধ করিতে পারে। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই এক জাতিকে অপর জাতির কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখে। এই অনুরাগই অতীতকালে তুর্কীকে এত বড় এত দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছিল। এখনো চাই শুধু সেই দেশানুরাগ। তাহার অভাবে আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা। আমাদের গোয়ালা প্রজা বুলগারেরা সেদিনও আমাদের দুধের জোগান দিত; এই দেশানুরাগে আজ

তাহারা আমাদের বিজেতা, সমগ্র জগতের চক্ষে গৌরবান্বিত।

"কিন্তু আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এই ত ফ্রান্স বৎসর চল্লিশ আগে জার্ম্মাণীর হাতে কি অপমানিতই না হইয়াছিল; কিন্তু পঁচিশ বৎসরে সে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীস একদিন তুর্কীর অধীন ছিল, এখন গ্রীস তুর্কীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা তুর্কী মাতারা আমাদের স্তনদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের অন্তরে তীব্র দেশানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিব—এই হইবে আমাদের ব্রত! কাপুরুষ সন্তান আমাদের থাকিবে না।—তুর্কী জাতিকে আমরা মরিতে দিব না। আশা মুহ্যমানকে বল দান করুক, আশা সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া নরনারীকে দেশসেবায় নিযুক্ত করুক। তখন কোনো বাধাই বাধা বলিয়া মনে হইবে না, কোনো ত্যাগই ক্লেশকর বোধ হইবে না। মরণের ডাক পড়িলে আমরা যেন বলিয়া যাইতে পারি—'আমার দেশের জন্য আমি রাতে ঘুমাই নাই দিনে বিশ্রাম করি নাই!' তখনই আমার দেশ সকল স্বাধীন শক্তিমান জাতির পার্শ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সকলে তাহাকে গৌরবের আসন ছাড়িয়া দিবে।"

আর একটি সভায় সুলম্যা হানুম নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং ফাতিম আলি হানুম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভাতেও সকলে আপনাদের দেহ নিরাভরণ করিয়া দেশহিতে সমস্ত অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন।

'তস্‌বির্‌রি আফকিয়ার' নামক সংবাদ পত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—আমাদের রমণীদের মধ্যে যে কি আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত আছে তাহা এই সমস্ত সভা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। যে জাতির এমন সম্পত্তি বর্ত্তমান তাহার আর মার নাই, তাহার ভবিষ্যৎ স্থির হইয়াই আছে। আমরা এই প্রথম আমাদের জাতীয় শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারিলাম, আর বুঝিতে পারিলাম যে পুরুষ এই রমণী মাহাত্ম্যের কাছে কত খর্ব্ব কত দুর্ব্বল।

ইকদম বলেন—আমাদের রমণীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের আশা ভরসা। তুর্কী জাতির যে অর্দ্ধাঙ্গকে এতদিন গ্রাহ্য বা স্বীকারই করা হইত না, আজ তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ স্থিতির একমাত্র আশ্রয়রূপে দেখা দিয়াছে।

প্রবাসী।

ব্রহ্মের রমণী।

ব্রহ্মের রমণীরা যেন বায়ুর মতো অবাধ, কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং আনন্দিত। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। বৌদ্ধধর্ম্মে গুণের তারতম্যেই মানুষে মানুষে যা কিছু পার্থক্য, অন্যথা সকল মানুষই সমান। এইজন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীসমাজ যে সমস্ত অধিকারের জন্য লালায়িত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সে সমস্তই ব্রহ্মরমণীর আয়ত্ত হইয়া আছে। ব্রহ্মরমণীরাই সংসারের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করে; অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করে,

এমন কি নিজের নিষ্কর্ম্মা স্বামীগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও তাহাদেরই। এইজন্য ব্রহ্মরমণীকে বড় বড় চালের আড়তদারী, কাঠের কারবার, তেলের ব্যবসায় প্রভৃতি করিতে দেখা যায়; ব্রহ্মরমণীর দ্বারা চালিত ছাপাখানা ও দৈনিক খবরের কাগজ খানির কাজ, প্রভৃতি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধেও ব্রহ্ম-রমণীর সুবিধা বিস্তর। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের সম্পত্তির মালিক। যদি উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা হয়, তবে সম্পত্তিও অর্দ্ধা-অর্দ্ধি ভাগ হয়। পুরুষের বহু বিবাহের প্রথা থাকিলেও প্রথমা পত্নীর সম্মতি ব্যতীত দ্বিতীয়বার বিবাহ অসিদ্ধ; যদি কেহ প্রথমা পত্নীর অসম্মতিতে বিবাহ করে, তবে প্রথমা স্ত্রী স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে উভয়ের সম্পত্তি জীবিত ব্যক্তিতে বর্ত্তে; কেবল জ্যেষ্ঠ সন্তান সিকি ভাগ পায়। স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত স্বামী কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না; কিন্তু স্ত্রী তাহার স্ত্রীধন স্বয়ং হস্তান্তর করিতে অধিকারিণী।

ব্রহ্মরমণী যাহাকে খুসি বিবাহ করিতে পারে। ভারতের বিবাহে যেমন পাত্র বি-এ পাশ কি ফেল দেখিয়াই কন্যাসম্প্রদান করা না করা স্থির করা হয়, অথবা পণের পরিমাণ বুঝিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করা হয়, তেমনি ব্রহ্মদেশে বরকন্যার মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে কিনা দেখা হয়। ইহাই বিবাহের স্বাভাবিক ও সমীচীন বিধি। ব্রহ্মদেশে বাল্যবিবাহ না থাকাতে বালিকা বিধবাও নাই; এবং বিধবারও পুনর্বিবাহে কোন বাধা নাই; যাহাদের সঙ্গতিতে কুলায় না তাহাদের কুমারী থাকাতেও লজ্জা বা নিন্দা নাই। ব্রহ্মরমণী সর্ব্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

তাহাদের মধ্যে বর্ণজ্ঞানহীনা অশি-ক্ষিতা প্রায় দেখা যায় না; তাহারা বাল্যকাল হইতেই গৃহস্থলীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া নিপুণ গৃহিণী হয়।

ভারতবর্ষ, তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রাচীন প্রথার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার যে রূপ পরিবর্ত্তন ঘটানো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঐ সব দেশের স্ত্রীলোকেরা আবহমানকাল পুরুষের অধীনতা করিয়া এমন জড়ভরত হইয়া যায় যে স্বামীর মনোরঞ্জন করিতেও পারে না; নির্ব্বোধ পুতুলের মত তাহাদের অতিবশ্যভাব এবং লীলার ছলের অভাব পুরুষকে আকৃষ্ট করে না; কোন কথা উত্থাপন করিলেই স্বামীর মতে সায় দিয়া তখনি বলে 'হাঁ তুমি যখন বলিতেছ।' এমন অবস্থায় হয় ত ঘরসংসার করা চলে, কিন্তু সখিত্ব ও সহযোগিতার আনন্দ হইতে চিরবঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মরমণী সকল অংশে শ্রেষ্ঠ।

প্রবাসী।

মরণে বরাভয়।

মরণে আশীষ করে, করেছ অমর।
কত শান্তি ঢালিয়াছ মরণ উপর।

মরণে করেছ নাম অমৃতের দ্বার।
সর্ব্বোপরে মরণের দে'ছ অধিকার ॥
মরণে সহায় করি সব নারী নরে।
অবহেলি সুখ দুঃখ যায় লোকান্তরে ॥
রোগ শোক দুঃখ তাপে অবসন্ন জনে।
শান্তি দিয়ে রাখে মৃত্যু সখার চরণে ॥
প্রিয়-সঙ্গে মিলাইতে মরণ সহায়।
ভাঙ্গিয়া দেহের বাঁধ মিলাইয়া দেয় ॥
মরণে শমন তবে বলিব না আর।
নিশ্চয় জেনেছি মৃত্যু অমৃতের দ্বার ॥
স্বর্গরাজ্যে লয়ে যেতে মৃত্যু শুধু দূত।
দূতরূপী মৃত্যু-বন্ধু বড়ই অদ্ভুত ॥
মৃত্যু আসে মৃত্যুঞ্জয়ী করিবারে নরে।
মরণে তাড়াতে চাই তবে কেন দূরে ॥
মরণে মরণ বলে আর না ডাকিব।
মরণের সনে এবে সখ্যতা স্থাপিব ॥
জেনেছি মরণ নয় মৃত্যুর কারণ।
সকল যাতনা মৃত্যু করে নিবারণ ॥
দূতরূপে কাছে এসে মৃত্যুঞ্জয় পাশে।
মৃত্যুভয়ত্রস্ত নরে রাখে অনায়াসে ॥
এস দূত, এস বন্ধু, থেকোনাকো ভুলে।
পরশি এ তপ্ত তনু দাও তাঁর কোলে ॥
যাঁর কোলে দে'ছ মোর কত প্রিয়জন।
তাঁরই কাছে রাখ মোরে এই নিবেদন ॥
জানি আমি জানি, তিনি মৃত্যুভয়হারী।
আমিতো তাঁহারি তিনি আমারি আমারি ॥

প্রার্থনা।

জীবনের দিনগুলি হীন যেন নাহি হয়,
তব পদে এমিনতি ওহে হরি দয়াময়।
দিনের কর্ত্তব্যগুলি প্রতিদিন সাধিবারে,
জ্ঞান ও শকতি দানে সমর্থ করিও মোরে।
দেখো প্রভু দয়াময় তোমার গচ্ছিত ধনে,
যেন আমি না হারাই অবহেলা অযতনে।
যেদিন যেভাবে মোরে যেকাজে লাগাও প্রভু
তব কার্য্যে, পরমেশ, বিমুখ না হই কভু—
তোমার সংসারে রাখ এশকতি দিয়ে মোরে,
কাজসারা হলে প্রভু নিও ডেকে তব ঘরে।

সমালোচনা।

মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব SociAl Problem (সামাজিক সমস্যা) নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক সমালোচনার জন্য পাঠাইয়াছেন। পুস্তিকাখানির মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। ৯নং গুল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ও ২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ বাক্য—যে গৃহে নারীগণ সম্মানিত হন সে গৃহে দেবগণ আনন্দিত হন কিন্তু যে গৃহে নারীর সমাদর নাই সেখানকার সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য নিষ্ফল—এই পুস্তিকার ইষ্টমন্ত্র বা মটো। মহারাজ কুমার বিশেষ পরিশ্রম করিয়া নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে বেদ হইতে, সংহিতা হইতে এবং প্রাচীন ও আধুনিক এদেশীয় ও অন্য দেশীয় চিন্তাশীল গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি নারী-শিক্ষা, বিবাহ, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বহু মনিষিগণের চিন্তা ও বহু-দর্শিতার ফল অল্প আয়তনের ভিতরে সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থকার যে সকল সংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন তাহা

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে নারীশিক্ষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয় ও অল্পবয়সে বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত এ সকল বিষয় ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, মনুসংহিতা, প্রভৃতি গ্রন্থ অথব জার্ম্মান, ইংরেজ বড় বড় গ্রন্থকারদের বাক্যদ্বারা প্রমাণ করিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। এ সকল কথাতো সকলেই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় মহারাজ কুমার অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও অধিকার লাভ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন সত্য, তাঁহারা সভাসমিতি করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এরূপ জ্ঞানের বা উৎসাহের অধিক মূল্য নাই। দেশাচারের সংস্কার করা অর্থ সংগ্রহ করা তাহাতে অনেক বল চাই, ক্ষতিস্বীকার করা চাই, আপনাকে ব্যয় করা চাই। শুধু বক্তৃতাতে তাহা হয় না। বহুদিন বহুলোক মিলিয়া আলোচনা করিতে করিতে যদি দেশের একটা নূতন ভাব আসে, সংস্কারের উৎসাহ সকলের হয় তাহা হইলে সময়ে কিছু ফল হইতে পারে। এরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য-সকল সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য্য; আমরা মহারাজ কুমারের দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এই কার্য্যের প্রশংসা সর্ব্বান্তঃকরণে করি।

আমাদের দেশের সকল চিন্তাশীল লোকই সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী। এদেশের প্রাচীনশাস্ত্র মধ্যে মধ্যে উন্নততর সমাজের কথা লিখিত আছে, হয়ত কোন কোন সময়ে নারীজাতির অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্র বা ইতিহাস হইতে সে সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা উৎসাহিত বা আনন্দিত হইতে পারি, কিন্তু সামাজিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া চলিলে হইবে না। যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে সম্মুখের দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিত্য নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া সমাজ ভবিষ্যতের উন্নতির পথে চলিয়াছে, ভবিষ্যৎ সমাজে নারীর স্থান কি হইবে, বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ কি নিয়মে হইবে তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিবে। ভবিষ্যতে যে উন্নত অবস্থা হইবে তাহা প্রাচীন কালে হয় নাই। মনুষ্য সমাজ পূর্ব্বকালে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল এখন অধঃপতিত হইয়াছে—এখন একমাত্র কর্ত্তব্য প্রাচীন উদ্ধার করা,—মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সে ভাবে কথা বলিবার লোক নহেন, তিনি প্রাচীন শাস্ত্র দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরাইয়া যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেও অনেক উৎকৃষ্ট বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভাবের প্রশংসা করিয়া-

ছেন। ফলে আজকাল সমাজ বিষয়ে নানাদেশে বিভিন্ন প্রকার অবস্থাতে মহা মহা আন্দোলন হইতেছে এবং সামাজিক উন্নতি ও অবনতির স্বাভাবিক নিয়ম সকল বৈজ্ঞানিক ভাবে স্থির করা হইয়াছে—আমাদের দেশের অবস্থা অন্য দেশের অবস্থার মত নহে তাহা সত্য, কিন্তু মনুষ্য-স্বভাব সর্ব্বত্র সাধারণ ভাবে একই প্রকার, এবং এদেশের নারীগণের অবস্থা হীন হওয়াতে দেশের যে দুর্গতি হইতেছে ইহাও ভগবানের নিত্য বিধিভঙ্গ করাতেই হইয়াছে এবং উন্নতি সাধন করিতে হইলেও বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। এ সকল বিষয় যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

কলিকাতা সহর।—কলিকাতাবাসী নরনারী কলিকাতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন —ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কলিকাতার গৌরবে আমাদের গৌরব, কলিকাতার হীনতায় আমাদের মাথা হেঁট। যখন উদারমতি ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বঙ্গদেশকে পৃথক শাসনকর্ত্তা দিয়া দিল্লিকে রাজধানী করিলেন, তখন বঙ্গবাসী মাত্রেই কৃতজ্ঞ ও সুখী হইলেন. কিন্তু কলিকাতাবাসী মাত্রেরই অন্তরে বিষাদ উপস্থিত হইল, কারণ কলিকাতা রাজধানীর মহাগৌরব হইতে বঞ্চিত হইল। এখন সে দুঃখ আমাদের একরূপ সহিয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে কলিকাতা নগরের কত ক্ষতি হইয়াছে বা হইবে তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে কলিকাতা ব্যবসাবাণিজ্যে, ধন মানে, জনসংখ্যায় ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর থাকিবে। অপর দিকে কলিকাতার উন্নতিকল্পে যে মহা উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার কার্য্যও চলিয়াছে। দুই বৎসর কাল উন্নতি চলিয়াছে মাত্র. ইহার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে নূতন শ্রীসৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, আমরা আশা করি আর ৪।৫ বৎসরে কলিকাতা ইহার অস্বাস্থ্যকর বস্তী ও বহুজনাকীর্ণ অংশগুলিকে শোধরাইয়া দিয়া সর্ব্বাংশে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হইবে।

স্বাস্থ্য।—আমাদের মিউনিসিপালিটীর চেষ্টায় নগরের স্বাস্থ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখন কলিকাতা একটি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া পরিচিত হইতেছে। কিন্তু একটি বড় কথা এই যে, এ নগরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এমন কি যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার সিকি শিশুকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কোন কোন ডাক্তারের মতে উত্তমরূপে শুশ্রূষা না হওয়াই এরূপ মৃত্যুর কারণ। ফলে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যেসকল দরিদ্র লোক সরকারী দাই-শুশ্রূষাকারিণীদিগের সেবা গ্রহণ করে, তাহাদিগের শিশুরা প্রায়ই রক্ষা পায়, অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার স্ত্রীলোকদিগের শিশুগণের মৃত্যুই অধিক। স্ত্রীলোকগণ শুশ্রূষাকার্য্য শিক্ষা না করিলে এ দুঃখ দূর হইবে না।

মহিলার পাঠিকাগণ অবশ্যই মনে রাখিবেন যে, তাঁহারা শুশ্রূষাকার্য্য শিক্ষা করিলে তাঁহাদের প্রাণাধিক শিশুর জীবন রক্ষা হয় এবং নগরের কলঙ্ক ও দুঃখ দূর হয়।

জলের অপব্যবহার।—কলিকাতার সুখের ও গৌরবের সামগ্রী যথেষ্ট পরিষ্কার জল। কলিকাতার অবস্থার বিষয় আমাদের গবর্ণর বাহাদুরের যে মন্তব্য সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতিদিন চল্লিশ লক্ষ মণ পরিস্কৃত জল নগরে ব্যয় হয়। অর্থাৎ অধিবাসী প্রতি জনে প্রায় ৪ মণ পায়। কিন্তু বালক বৃদ্ধ প্রত্যেক লোক কখনও দিন চারি মণ ব্যবহার করিতে পারে না। এজন্য ইহা নিশ্চয় যে, অনেক জল বৃথা নষ্ট হয়। যদি নগরের অধিবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলে জলের সদ্ব্যবহার করেন, যদি জল নষ্ট না করেন, তবে অচিরেই দিনরাত্র প্রচুর জল পাইবার ব্যবস্থা হয়। ফলে মিউনিসিপালিটীকে পর ভাবা বড়ই বোকামী, মিউনিসিপালিটির জল নষ্ট হইল তাহাতে আমাদের কি? ইহা যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, মিউনিসিপালিটির টাকা তাঁহাদের নিজের টাকা ও ইহার ক্ষতি তাঁহাদের নিজেদের ক্ষতি। ফলে জলের পরিমিত ব্যয় করা বিষয়ে আমাদের মেয়েদের অনেক শিখিবার আছে।

রবীন্দ্রনাথ।—কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের সর্ব্বজনপ্রিয়। এদেশের সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে রাজার মান্য, সাহিত্যসম্রাটের মান্য দিতেছেন। ইংলণ্ডে তিনি অত্যন্ত আদৃত হইয়াছেন। গীতাঞ্জলী নাম দিয়া ইংরাজীতে আপনার গীতের অনুবাদ আপনি প্রকাশ করিয়া ইংরাজীভাষার একজন কবিরূপে গৃহীত হইয়াছেন। আমেরিকায় সহস্র লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং মহোদয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক প্রশস্তহৃদয় সী. এফ এনড্রুস সাহেবের বক্তৃতাতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও অপর গ্রন্থাদির বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে এশিয়ার রাজকবি নাম দিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। যখন ঘরের লোক ঘরে মান্য পাইতেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ একভাবে আমাদের প্রিয় ছিলেন, আজ বঙ্গবাসী তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত, আজ তাঁহাকে আমরা আরও অধিক ভালবাসি, অধিক মান্য করি, অধিক ভক্তি করি।

আমেরিকার সকলই অদ্ভুত। সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, গত ১২ই মে বোষ্টন নগরের বন্দর হইতে হীরণ নামক একখানি জাহাজ ছাড়িয়াছে—এ জাহাজ স্ত্রীলোক দ্বারাই চালিত। হীরণের কাপ্তেন শ্রীমতী জর্জিয়া—তাঁহার স্বামী, একমাত্র পুরুষ জাহাজে আছেন, তিনি কাপ্তেনের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। হীরণ জাহাজের বয়স একশত বৎসর। আজ অনেক বৎসর হইল শ্রীমতী জর্জিয়া ইহার কাপ্তেন। ইনি জাহাজ চালাইতে সুনিপুণ ও অত্যন্ত সাহসী নাবিকা। গত বৎসরে জাহাজের

পুরুষকর্ম্মচারী ও খালাসীগণ ইঁহাকে বড় বিরক্ত করিয়াছিল, এজন্য তিনি পুরুষদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের স্থানে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এযাত্রায় এ জাহাজ যেন উপকূল হইতে কাষ্ঠ বোঝাই করিয়া নিউইয়র্কে যাইবে এবং সেখান হইতে কয়লা বোঝাই করিয়া আসিবে। কাপ্তেনের স্বামী হালের চাকায় দাঁড়াইয়াছেন—কাপ্তেন যথাসময়ে দৃঢ়তার সহিত হুকুম দিলেন, অন্য সকল স্ত্রীলোক খালাসী ও কর্ম্মচারী কৌশল ও উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিল — জাহাজ ঠিক চলিল। বহু লোক পিয়ারে দাঁড়াইয়া জাহাজ ছাড়া দেখিতেছিল— সকলে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বিদায় দিল— বন্দরের সমস্ত জাহাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল—জাহাজখানি ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগিল।

স্ত্রীস্বাধীনতা।—বিলাতের রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী নারীগণ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নন। যে দল সভা সমিতি করিয়া আপনাদিগের অধিকার লাভ করিতে যত্ন করিতেছেন,তাঁহাদের বিষয় অবশ্য কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু যাঁহারা দেশের নানারূপ অনিষ্ট করিয়া, লোকের ধন নষ্ট করিয়া বা আপনাদের প্রাণ দিয়া সাধারণের নিকট আপনাদের দাবী উপস্থিত করিতেছেন, তাঁহারা কখন কি একটা অদ্ভুত কার্য্য করিয়া বসিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। কখনও ডাকের বাক্সে বোমা মারিয়া উড়াইয়া দিতেছেন—কখনও বহুমূল্য গৃহ উড়াইয়া দিতেছেন। কখনও অন্য একটা নূতন পথে অনিষ্ট করিতেছেন। সম্প্রতি কুমারী ডেভিসন নামে একটি মেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ডরবী ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়ার সম্মুখে পড়িয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন এবং ঘোড়সোয়ারের জীবন ও আপনার জীবননাশের পথ করিয়াছিলেন। সোয়ারটি সারিয়া উঠিয়াছে। কুমারী ডেভিসনের মাথায় ও অন্যান্য স্থানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই দলের নারীগণ মহা সমারোহে ডেভিসনের কবর দিয়াছেন—এ দিকে ডেভিসন মৃত্যুর সময়ে বলিয়া গিয়াছেন—"যুদ্ধ করিয়া যাও। ভগবান্ জয়বিধান করিবেন।" এরূপ পাগলের মত প্রাণ দেওয়া অত্যন্ত দমনীয়কার্য্য সকলেই বলিবে, কিন্তু এরূপ করিয়া জীবন দিতে পারা যে একটা নূতন ব্যাপার, এই প্রকার দুষ্কার্য্যের মধ্যেও যে মহত্ত্বের গন্ধ আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩২০। জুলাই, ১৯১৩। [১০শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বেশ্বরি, হে জগজ্জননি, তুমি স্বরূপত যেমন, আমাদিগকে ঠিক তেমনই ভাবে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেও। তুমি আমাদের স্নেহময়ী জননী, তুমি তোমার বঙ্গবাসিনী কন্যাগণকে ভালবাস, বিশেষ যাঁহারা বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাস, এ কথা সত্য, কিন্তু তুমি শুধু তাঁহাদিগের জননী নহ, তুমি নিরক্ষর, নিঃস্ব, অধঃপতিত, দুস্থ, সকল নরনারীর স্নেহময়ী জননী, তুমি সকল পতিতা নারীগণেরও মঙ্গলময়ী জননী ইহা আমাদিগকে তুমি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেও। তোমার উদার প্রেমবক্ষে সকল নরনারীর জন্য অতি স্নেহকোমল স্থান আছে, তুমি সকল দেশের, সকল অবস্থায় ও সকল শ্রেণীর নারীগণের পরম মঙ্গলময়ী জননী এই সহজ সত্য হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া আমরা বড়ই ভ্রান্ত হই, তুমি কেবল আমাদের আপনার জনের জননী অন্য সকলের যেন তুমি বিমাতা এই সংকীর্ণভাবে পড়িয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া থাকি। তাই তোমার পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তোমার প্রেমের প্রকৃত স্বভাব আমাদিগকে একটু দেখিতে দেও। তোমাকে জননী বলিয়া ডাকিলে যে, সকল অবস্থার সকল নারীগণকে ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে হয়, আপনার করিয়া লইতে হয় ; আর যে তোমার কন্যাগণকে ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে পারে না, ব্রহ্মকন্যার মান্য দিতে পারে না সে যে তোমাকে মঙ্গলময়ী জননী বলিয়া ডাকিতে পারে না, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, দয়াময়ী জননী, যেন আমরা তোমাকে বিশ্বজননী, সকল নরনারীর স্নেহময়ী জননী বলিয়া ডাকি। তোমাতে কোন সঙ্কীর্ণতা বা পক্ষপাতিতা নাই জানিয়া সকল সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া

তোমাকে সকলের জননী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং সেই ভাবে তোমাকে জননী বলিতে পারি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

জাতিভেদ।

আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে আমাদের দেশ বহু বিষয়ে অত্যন্ত হীন। আমাদের দেশের শরীরে বল অল্প, মনের উদ্ভাবনী শক্তি অতি অল্প, আমাদের দেশের লোক অত্যন্ত দরিদ্র, শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত হীন, দশজনে মিলিত হইয়া কোন কাজ করিবার পক্ষেও আমরা অত্যন্ত অযোগ্য, এজন্য আমাদের দেশের উন্নতি করিতে যাঁহারা যত্নবান্ হন তাঁহারা প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হন। দেশের মঙ্গলের জন্য যিনি যখন যাহা করিতে আরম্ভ করেন তাহাতেই চারিদিকের অবস্থা তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়ায়। এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে জাতিভেদ দেশের উন্নতির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান শত্রু এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইবে না।

যাঁহারা জাতিভেদের সমর্থন করেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে মানুষে মানুষে প্রভেদ চিরদিন সকল দেশে আছে ও থাকিবে; যে সকল দেশে জাতিভেদ নাই সে সকল দেশেও ব্যবসায়-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, অবস্থা-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ প্রভৃতি ভেদ রহিয়াছে, তাহাতে কার্য্যত মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাস করে, তাহা হইলে এদেশের জাতিভেদকে নিন্দা করা বৃথা। কিন্তু অন্য দেশে লোকে যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে, ইচ্ছা অনুসারে ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং নূতন ব্যবসায়ের লোকের সহিত মিলিত হইতে পারে, কিন্তু এদেশে তাহা সম্ভব নয়। তন্তুবায়ের পুত্র মহাপণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও মহামান্যের যোগ্য হইলেও সে উচ্চতর জাতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে না, যদি কার্য্যত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-জীবন যাপন করে তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না। অপরদিকে ব্রাহ্মণ-পুত্র অজ্ঞ, ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন হইলেও ব্রাহ্মণরূপে গৃহীত হইবে। এসকল বিষয়ে শাস্ত্রে কি শাসন আছে, ভক্তি-শাস্ত্রে কি সারকথা লেখা আছে তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা, কারণ শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মকে না জানিলে ব্রাহ্মণ হয় না, কাজেই ব্রাহ্মণের মান্য পাইতে পারে না, কিন্তু এখন কোন্ ব্রাহ্মণ-পুত্র ব্রহ্মকে জানিয়াছেন? সকল সরল লোকেই স্বীকার করিবেন যে শত সহস্র ব্রাহ্মণ-তনয়ের মধ্যে একজনও ব্রহ্মকে জানেন নাই অথচ ব্রাহ্মণের মান্য পাইতেছেন। কেবল যে এ যুগেই এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজর্ষি জনকের সহস্র গাভী দান গ্রহণ করা লইয়া যে মহা প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, সে সময়ে এক যাজ্ঞবল্ক্যকেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সহস্র ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, কেহই সেই বহুমূল্য গাভী সকল পাইবার

যোগ্য হইলেন না। চিরকালই শত সহস্র লোকের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কোন বংশে বা জাতিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, এরূপ কখনও হয় নাই, এজন্য ব্রাহ্মণ একটা জাতিই হইতে পারে না, কিন্তু একথা আজ কে গ্রাহ্য করিবে? শাস্ত্রের বিধির সংবাদ কেহ লয় না, প্রচলিত রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণের পুত্রকে ব্রাহ্মণের মান্য দেয়।

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু যখন আমরা নিম্নশ্রেণীর কঠিনতর জাতিভেদের কথা আলোচনা করি তখন দেখিতে পাই যে তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ এত অধিক অনিষ্টকর যে তাহার সহিত তুলনায় উচ্চশ্রেণীর জাতিভেদ কিছুই নয়। যে সকল জাতিকে অনাচরণীয় বলে, অর্থাৎ যাহাদিগের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি গ্রহণ করে না তাহাদিগকে যেন একভাবে মনুষ্যেতর জীব করিয়া রাখা হইয়াছে। বিড়াল কুকুরের যেস্থানে যাইবার অধিকার আছে সেখানেও হয়ত মনুষ্যকে যাইতে দেওয়া হইবে না। আদিকাল হইতে বংশাবলীক্রমে গরিবেরা কেবল ক্লেশকর ঘৃণিত কাজ সকল করিয়া আসিয়াছে। কদন্ন ভোজন করিয়া সামান্য কুটীরে বাস করিয়াছে, দুর্ব্বহ ভারবহন করিয়া, বিরক্তিকর, ঘৃণার্হ কাজ সকল করিয়া তাহারা একান্ত হীনভাবে জীবন যাপন করে। জাতিভেদ আমাদের দেশের অস্থি মজ্জায় এমন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে যে, এই সকল পদদলিত নরনারীর জন্য কাহারও দয়ার উদ্রেক হয় না!

প্রতিবেশী নির্দ্দোষ দরিদ্র ভ্রাতাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিয়া, তাহার দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, চরিত্রহীনতা, ধর্ম্মহীনতা দেখিয়াও তাহার প্রতি সহানুভূতি না হওয়া যে মনের কত জড়ভাব বা অন্ধভাব প্রকাশ করে, তাহা ধারণার অতীত। নিম্নজাতির দুঃখ দর্শন বিষয়ে আমরা যেন সম্পূর্ণ অন্ধ। ফলে এরূপ মোহান্ধভাবের উপযুক্ত দণ্ড এদেশের লোককে পাইতে হইয়াছে। আপনার প্রতিবেশীর প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়া আমরা তাহাকে হীন করিয়া রাখিয়াছি, কার্য্যত জগতের নিকট সেই অবিচার আমরা পাইতেছি এবং সেইরূপ ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছি। এই লজ্জাকর অবস্থার মধ্যে একটি মহা শোচনীয় সত্য এই যে, আমাদের দেশের লোকের সে বিষয় কোন জ্ঞান নাই, সেজন্য লজ্জা বা অনুতাপ হয় নাই এবং এই দুরাচার দূর করিবার বিশেষ কোন চেষ্টাও আরম্ভ হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান প্রেমের আলোকে সকল দেশের সকল লোকেই দেখিতে পাইতেছেন যে সকল মানুষই মানুষ—শ্বেত কৃষ্ণ-প্রভেদ, ধনী-দরিদ্র-প্রভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ-প্রভেদ বা উন্নত-অনুন্নত-প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু সকল মানুষেরই শোণিত লোহিতবর্ণ, সকলের অন্তরেই সুখ দুঃখ বোধ হয়, পাপ ও পুণ্যের বীজ সকলের অন্তরেই নিহিত আছে। উন্নতির ইচ্ছা ও শক্তি সকলেরই

আছে। এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সকল দেশের ও সকল জাতির নরনারীর ভিতরেই দেবত্ব আছে এবং শিক্ষা, সঙ্গ ও অনুকূল অবস্থা পাইলে সকলের ভিতরেই দেবত্বের বিকাশ হইতে থাকে; কারণ পরম দেবতা সকল নরনারীকে আপনার সন্তানত্ব দান করিবেন বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে যেসকল জাতিকে উচ্চ হইতে দেওয়া হয় নাই, যাহাদিগকে নীচ কাজে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে, যাহাদিগের মনের উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়া হয় নাই, যাহাদিগকে স্বাধীন চিন্তা করিতে দেওয়া হয় নাই, দেবতার চরণ পূজা করিবার, অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগের বিরুদ্ধে যে ভয়ানক অপরাধ করা হইয়াছে তাহার জন্য সকল উচ্চজাতীয় ব্যক্তির সকল নীচ জাতীয় ব্যক্তির নিকট অবনত মস্তক থাকা উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞানধর্ম্মের জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই লজ্জাকর স্বার্থপরতা ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অবশ্যই আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিবেন। বহুকাল হইতে বংশানুক্রমে যে পাপ করা হইয়াছে, এখন তাহার বিচারের সময় উপস্থিত। এখন নিম্নশ্রেণীর নরনারীগণ দেখিতে পাইতেছে যে, উচ্চজাতি সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, এখন তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিলে আর তাহারা কিছু উপায় করিতে পারিবে না। ফলে নিম্নশ্রেণীর নরনারীর শরীর সুগঠিত, নীরোগ, কষ্টসহ এবং তাহাদের অন্তরে স্বভাবের নিয়মে স্বাভাবিক বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এখন যদি তাহারা উচ্চ জাতিকে ত্যাগ করে ও উচ্চ জাতি দ্বারা সমাজের যে কিছু কার্য্য হয় তাহা যদি আপনাদিগের যোগ্য লোক দ্বারা সম্পন্ন করায় তাহা হইলে আর উচ্চ শ্রেণীর গত্যন্তর নাই। তাহাদিগকে একান্ত অসহায় হইয়া পড়িতে হইবে ও ক্রমে নীচের নীচ হইতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ ভয়ানক প্রতিশোধ ইতিহাসে অনেক দেখা যায়—আমাদের দেশেও সেইরূপ প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে। এখন আর নিপীড়িত জাতি নিপীড়িত হইতে সম্মত নহে, এখন আর নীচজাতি আপনাদিগকে নীচ মনে করে না—স্বাধীনতার বাতাস বহিয়াছে, সকলেই স্বাধীন ভাবে উচ্চতার দিকে উঠিতেছে। এ গতি স্বাভাবিক, ইহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

হয়ত আমাদিগের পাঠিকাগণ এরূপ আশঙ্কার কথাকে অযথা ভয় বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, আমরাও স্বীকার করি যে, এরূপ মহাপরিবর্ত্তন দুই চারি বৎসরে হইবে না, কিন্তু আমাদের সৃষ্টি যে ন্যায়বান্ ঈশ্বরের সৃষ্টি, এখানে অন্যায় চিরকাল রাজত্ব করিতে পারে না—ভগবানের প্রিয় সন্তানকে কেহ পদদলিত করিবে ইহা তিনি কখনও চিরদিন সহ্য করিবেন না। যাঁহারা জাতিভেদের মহা অবিচার হৃদয়ঙ্গম করিবেন তাঁহারা অবশ্যই নিম্ন-

জাতি সকলের নিকট অবনত থাকিবেন এবং তাহাদিগকে উচ্চ করিতে সর্ব্বক্ষণ যত্নবান্ হইবেন। এদেশের শাস্ত্রে যেমন আছে যে, যে গৃহে নারীর উপযুক্ত সম্মান নাই, সে গৃহে দেবক্রিয়া বিফল, সেইরূপ ইহা সত্য যে, যে গৃহে দেবনন্দন মনুষ্যের প্রতি অসম্মান, সে গৃহে দেবতার গমন অসম্ভব—সেখানে দেবপূজা বৃথা আড়ম্বর মাত্র। যাঁহারা চক্রান্ত করিয়া ভগবানের সত্য নাম উচ্চারণ করার অধিকার হইতে আপনার প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ কর্ম্মফলে সত্য ঈশ্বরের পূজা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এইজন্য এ যুগে যাঁহারা সত্য সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বপিতা, সকল নরনারীর পিতামাতা, পরিত্রাতা, অদ্বিতীয় পরমদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা আর জাতিভেদ রক্ষা করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে, যিনি যত গভীররূপে জাতিভেদে বিশ্বাস করেন বা যত দৃঢ়তার সহিত আপনার জাতিকে অন্য হইতে উচ্চ মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের একত্বে ও পিতৃত্বে তত অল্প বিশ্বাস করেন।

জ্ঞানধর্ম্মের নবালোক যাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা স্বতঃপরত জাতিভেদ দূর করিতে যত্ন করিতেছেন। এজন্য বঙ্গদেশের উচ্চতর তিন জাতির মধ্যে মিশ্রণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। কারণ এই তিন জাতি শিক্ষা, উন্নতি, ধন, মানে প্রায় এক। ইঁহাদের শিক্ষিত সমাজের আদর্শও প্রায় এক। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমাজ যথেষ্ট বিস্তৃত হইলেও বহুপুরুষ হইতে প্রায় একরূপ মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিতে আবদ্ধ থাকাতে সন্তানগণের শক্তির বিকাশ অধিক হইতেছে না। বৈদ্যগণ সংখ্যাতে অল্প বলিয়া ঘনিষ্ঠসম্পর্কের ভিতরে বিবাহ হয়, তাহাতেও উন্নতির বাধা হয়—যদি শিক্ষিত সমাজের উচ্চ অঙ্গ এই তিন জাতি মিলিয়া একটি সম্প্রদায় হয় তাহা হইলে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল হইবে। এই নবালোক যত পরিমাণে সমাজের নিম্নস্তর সকলে প্রবেশ করিবে ততই জাতিভেদ চলিয়া যাইবে এবং নবধর্ম্মভাব অবলম্বন করিয়া নূতন জাতি বা জনসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পৃথিবীতে যখন যে দেশে নূতন একটি ধর্ম্ম আসিয়াছে, তখনই নূতন সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসনে বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে, বহু প্রাচীন কালেও এদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম তখনকার ধর্ম্ম ছিল না, তখনকার জাতিভেদ এখনকার মত ছিল না, কিন্তু তখন বৈদিক ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা একটি ভয়ঙ্কর কার্য্য ছিল—অথচ বুদ্ধের শাসনে শত সহস্র লোক প্রাচীন ধর্ম্ম ও জাতি ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিয়াছিল। মুসলমানধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায়, ইস্লামধর্ম্ম সকল সমবিশ্বাসীকে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব দান করিয়াছিল, যে মুসলমান হইল, সেই নূতন বিশ্বাস লাভ করিয়া সকল মুসলমানের ভ্রাতা

হইল। বৈষ্ণবগণের মণ্ডলীগঠনের আদি ইতিহাসও ঠিক এইরূপ। প্রত্যেক নূতন ধর্ম্ম আসিয়া নূতন ভাবে মানুষের সহিত অপর সকল মানুষের আত্মীয়তা নূতন করিয়া দেখাইয়া দেয় এবং নূতন ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজ গঠিত হয়। নানা কারণে আমাদের দেশের সামাজিক মহা পরিবর্ত্তন এখন সংঘটন হইতেছে—যদিও বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক জাতি পৃথক ভাবে আপন উন্নতির জন্য যত্নবান হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিতরের কথা এই যে, জাতির দিন শেষ হইয়াছে—নূতন জ্ঞানালোকে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, জাতি মিথ্যা, জাতি মানুষ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া রাখে—জাতি শতরূপে উন্নতির বাধা দেয়—অথচ এখন সকল জাতিই অবাধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল—এই উন্নতি লাভ হইলেই জাতির পৃথকত্ব চলিয়া যাইবে এবং সকল উন্নত নরনারী মিলিয়া নূতন জনসমাজ গঠন করিবে। যাঁহারা পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই নরনারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং যাহাতে ভাই ভাই সরলভাবে মিলিত হইয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন তাহার জন্য যত্নবান্ হইবেন।

সহধর্ম্মিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমার বাক্যগুলি বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা আগ্রহপূর্ণ ভাব ও আন্তরিকতা ছিল যে তাহা বন্ধুর হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করিল। আমি বন্ধুর প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম; সেইজন্য আমার কথায় বন্ধুর মনে যে সাময়িক-ভাবের উত্তেজনা আসিল আমি কৌশলে তাহাকে নিজ অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া বন্ধুর মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইলাম। বন্ধু বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় পত্নীর নিকট তাহার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনারাশি নিবেদন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

বন্ধুর আন্তরিক দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী সেই দুঃখে হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশিত করিবেন ও অম্লানবদনে তাহা বহন করিতে কুণ্ঠিতা হইবেন না একথা আমি বন্ধুকে বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা হইলেও বন্ধু যখন পত্নীর নিকট আপনার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন তখন তাহার ফল যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া আমার মন ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় দোলায়মান হইতে লাগিল। যাঁহার সমস্ত জীবন সুখ ও শান্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত, বিপদে তাঁহার ধৈর্য্য কতদূর স্থির থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? যে হৃদয় সৌভাগ্যসূর্য্যের বিমল কিরণে চিরদিন আনন্দোৎফুল্ল ছিল, সে হৃদয় দুঃখ দারিদ্র্যের ভাবী ঘনান্ধকারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার চিরপরিচিত আরামের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে না একথা কে নিঃসন্দেহে বলিতে পারে? সুখলালিত উচ্চবংশীয়দিগের মধ্যে হঠাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয়

ঘটিলে সেই শোচনীয় ঘটনার সহিত এমন নৃশংস অপমান ও লাঞ্ছনার বিভীষিকা জড়িত থাকে যে সেই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পীড়ন সহ্য করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। ফল কথা, পরদিন প্রভাতে যখন বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আমার হৃদয় উদ্বেগ ও আশঙ্কায় বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। বন্ধু স্ত্রীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আমি সাহস করিয়া সহসা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আমি সাহসে ভর করিয়া উদ্বেগপূর্ণ-হৃদয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—

"তোমার সকল কথা শুনিয়া তোমার পত্নী কি বলিলেন? তিনি এই নিদারুণ সংবাদ কিরূপে বহন করিলেন?"

"কিরূপে বহন করিলেন?—দেবলোক-বাসিনী দেবীর ন্যায়। বন্ধু, তুমিই আমার পত্নীর মন যথার্থ বুঝিতে পারিয়াছ। আমার সকল কথা শুনিয়া তিনি যেন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আরামলাভ করিলেন। তিনি তাঁহার কোমল ভুজলতায় সস্নেহে আমার কণ্ঠদেশ আবেষ্টন করিয়া বলিলেন—প্রিয়তম, এইজন্যই তুমি সম্প্রতি এমন মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইতেছিলে? সত্য করিয়া বল তোমার মনঃকষ্টের ইহাই কি প্রকৃত কারণ? না অন্য কোন কারণ আছে?"

আমি ভাবিলাম—"হায় সরল-হৃদয়া নারী; তুমি এ কারণকে সামান্য কারণ মনে করিলে! তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না—এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রকৃত অর্থ কি। তুমি এখনও জান না—ইহার পশ্চাতে তোমার জন্য কত নিষ্ঠুর বৃশ্চিক-দংশন লুক্কায়িত রহিয়াছে। তুমি কেবল কল্পনাতেই দুঃখের চিত্র আঁকিয়া দেখিয়াছ—শুধু কবির কাব্যে ও উপন্যাসের জগতে সেই ভীষণা দানবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেখিয়াছ। এখনও প্রস্ফুট কুসুমের সুষমারাশির মধ্যে মধুমত্তা মধুকরীর ন্যায় তুমি আনন্দে গুঞ্জন করিতেছ—পত্রপ্রচ্ছন্না নির্দ্দয়া ফণিনী এখনও ফণা উত্তোলন করিয়া তোমাকে দংশন করে নাই। কিন্তু যখন কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া আমরা কঠোর বাস্তব জগতের মর্ম্মঘাতী পীড়নের মধ্যে নিপতিত হইব—যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে দুর্ভাবনার অন্ধকার নিবিড় ভাবে ঘনাইয়া আসিবে—যখন অভাব অপমান লাঞ্ছনা তাহাদের দৃপ্তফণা উত্তোলিত করিয়া বিষধর ভুজঙ্গমের ন্যায় আমাদের মর্ম্মস্থান দংশন করিবে তখন—তখনই বুঝিবে এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের প্রকৃত অর্থ কি, তখনই বুঝিবে সংসারে নিঃস্বের নিয়তি কি মর্ম্মন্তুদ, কি সুভীষণ!"

আমি বলিলাম—"বন্ধু, তোমার কঠোরতম কর্ত্তব্য এক্ষণে শেষ হইয়াছে—তুমি সাহসের সহিত পত্নীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছ। সুতরাং এখন যতশীঘ্র সংসারের অন্যান্য লোকে তোমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা জানিতে পারে ততই তোমাদের পক্ষে মঙ্গল। জগতের নিকট এই সত্য প্রকাশ করিতে তোমাদের

হৃদয় দুঃখভারে অবনত হইবে স্বীকার করি কিন্তু জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা বীরের ন্যায় একবার দুঃখ বহন করা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? প্রকাশের বেদনা সাময়িক, তোমরা শীঘ্রই তাহার উপরে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কঠোর সরল সত্য অপেক্ষা কি কপট ছলনার ভার দুর্ব্বহ নহে? মানুষের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে মানুষ যে দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে অধিক ব্যথিত হয় তাহা নহে, কিন্তু দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াও মানুষকে যে সুখ ও সৌভাগ্যের কপটতা রক্ষা করিতে হয় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টের কারণ। মন ধনগর্ব্বে উত্তপ্ত, কিন্তু ধনভাণ্ডার অর্থ-শূন্য; জগতের সম্মুখে উচ্চপ্রাসাদ উন্নত রাখিতে হইবে অথচ অট্টালিকার ভিত্তি অন্তঃসার-শূন্য, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? সাহসের সহিত যদি আপনাকে দরিদ্র বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতে পার তবেই দারিদ্র্যের মর্ম্মচ্ছেদী বিষদন্তকে ভগ্ন করিতে সমর্থ হইবে।”

আমি দেখিলাম বন্ধু এবিষয়ে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। শূন্যগর্ব্বের অহমিকায় তিনি দর্পিত নহেন, তাঁহার পত্নীও তাঁহাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী জীবন যাপন করিতে সমুৎসুক। তিনি বন্ধুকে ইতিমধ্যেই এবিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ইহার কয়েকদিন পরে বন্ধু একদিন সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বন্ধু আপনার বৃহৎ বসতবাটী-খানি বিক্রয় করিয়া পল্লীগ্রামে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ক্রয় করিয়াছেন। পল্লীগ্রামটী সহরেরই সন্নিকটবর্ত্তী। সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া বন্ধু নূতন আবাসে মালপত্রাদি প্রেরণে ব্যস্ত ছিলেন। এই নব আবাস-গৃহে আসবাব পত্রের অধিক আবশ্যকতা ছিল না। সেখানে অতি সামান্য আসবাবেই তাঁহাদের অভাব পূর্ণ হইবে। সেইজন্য তিনি নিজের মূল্যবান যাবতীয় গৃহসরঞ্জাম পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, কেবল প্রিয়তমার প্রিয় বীণাটী তিনি ক্রেতার কবল হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটীকে বিক্রয় করিতে গেলে তাঁহাদের হৃদয়ের অনেকগুলি কোমলতন্ত্রী নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয় সেইজন্য সেটী তিনি বিক্রয় করিতে পারেন নাই। বন্ধু বলিলেন, সেই বাদ্যযন্ত্রটীর সহিত তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর অনেক মধুর স্মৃতি অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত, সে যন্ত্রটী তাঁহাদের উভয়ের প্রথম প্রেমকাহিনীর সুখময়ী গাথায় পরিপূর্ণ। যখন তাহার গুণবতী জীবনসঙ্গিনীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়, তখন উভয়ের প্রেমস্পন্দিত জীবনের অনেক সুখের মুহূর্ত্ত সেই বীণার কোমল সুরে বসন্তাগত কুসুমমঞ্জরীর ন্যায় শোভায় ও সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই যন্ত্রের পার্শ্বে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রেমপ্রতিমার কিন্নরী-বিনিন্দিত কণ্ঠের কোমল পদাবলী শ্রবণ করিয়া এই নীরস মর্ত্তে রসোচ্ছল নন্দনের রসাস্বাদ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। বীণাটী তাঁহা-

দেব দম্পতী জীবনের সুকোমল সাক্ষী— তাহার মায়া বন্ধু কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা।

পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির সভ্যতা যথেষ্টরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বহুলোক সাম্যবাদের বিশেষ পক্ষপাতী। অথচ বিংশশতাব্দীর সভ্যতা-গর্ব্বিত মানবসমাজও নারীজাতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং নিরূঢ় স্বাধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সেই পুরাতন অসভ্যাবস্থাতেও পুরুষজাতি নারীর ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতার উপরে যেমন কর্তৃত্ব করিয়াছে, অদ্যাবধি পুরুষ সেই অধিকারটি বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। নারীকে ব্যক্তিত্বের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া পুরুষের আধিপত্যের অধীন রাখিয়া পুরুষের প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযোগী কিঞ্চিৎ শিক্ষিত দীক্ষিত বেশভূষা-সমলঙ্কৃত করিতে পুরুষের কোন দেশে কোন আপত্তি দেখা যায় না। নারীজাতিরও সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজে এমনই অবস্থা ঘটিয়াছে যে পুরুষের অধীন থাকিয়া স্বাধীনতায় অধিকতররূপে বঞ্চিত হইয়াই যেন তাহাদের ভাল বোধ হয়। উহাই নিরাপদ মনে করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দণ্ডায়মান রাখিতে গেলে যে বিপদ পরীক্ষায় পড়িতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একারণে কি নারী এই বিংশ শতাব্দীতেও আপনার ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতা জনসমাজে দণ্ডায়মান করিতে ইচ্ছা করিবে না? নারীজাতির ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার যথোচিত সম্মান ও মূল্য কি সভ্যতাগর্ব্বিত বর্ত্তমান জনসমাজ প্রদানার্থ প্রস্তুত হইবে না? অবশ্য হইবে। সংসারে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন বিধানের আধিপত্য বিলুপ্ত হইতেছে। পরমেশ্বর সর্ব্ববিষয়ে ভুবনমণ্ডলে নবতর বিধান করিতেছেন। এ বিধানে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইতেছে। জনসমাজ ইহা কি আর অস্বীকার করিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে? কখনই না।

ভারতবর্ষে জ্ঞান সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রথম কিরণলাভ হইয়াছিল। কিন্তু সেই পুরাকালেও এদেশে নারীর স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকার নরসমাজ স্বীকার করিত কি না পরিষ্কার জানা যায় না। তৎকালে এদেশে নারীর সম্মান ছিল, পূজা ছিল, স্বাধীনভাবে জনসমাজে মিশিবার অধিকার ছিল। কিন্তু তথাপি এখন যাহার অভাব দেখা যায় তাহা ছিল বলিয়া বলা যায় না। কারণ দেখা যায় যে হিন্দুনারী ধন ও সম্পত্তির স্বত্বাধিকারে চিরকাল বঞ্চিত। এরূপ স্বত্বাধিকারের অভাব পুরুষের চিরাধীনতার একটি অনতিক্রমণীয় কৌশল। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও পার্শি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এরূপ নারীর বঞ্চনাকারী বিধি নাই। তাই বলিয়া সে সকল সমাজও যে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বকে পূর্ণরূপে

স্বীকার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। তথাপি ইহা নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকারের একটা প্রধান লক্ষণ বটে। হিন্দুজাতি সভ্যতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের গৌরবে যত কেন স্ফীত না হউক, নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও অন্য জাতি হইতে যত কেন শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন না করুক, ধনাধিকারে বিধিপূর্ব্বক নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া সামাজিকভাবে নারীকে অধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইহা আর গোপন করিবার উপায় নাই। হিন্দু বা আর্য্যজাতিতে উল্লিখিত পুরাতন দায়াধিকার যতদিন অপরিবর্ত্তনীয় আছে ততদিন হিন্দুসমাজ মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা কখনই অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। হইলেও উহা নামমাত্র, উহার ফলোপধায়িতা কিছুই নাই।

হিন্দুজাতির অধঃপতিত অবস্থাতে নারীজাতি জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার বিরহিত ছিল। জ্ঞান ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিষয়ে চৈতন্য কোন্ শক্তিতে প্রদান করিতে পারে? জ্ঞানে হীন হইয়া থাকিলে স্বভাবতঃই অন্ধের ন্যায় চলিতে ফিরিতে হয়—অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

উপধর্ম্মও মনুষ্যকে মনুষ্যের বশীভূত করিয়া থাকে। হিন্দুজাতিও সুদীর্ঘকাল হইতে সত্যধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়া বসিয়াছে। নরনারী মাত্র এসমাজে সকলেই নিতান্ত কল্পিত উপধর্ম্মের আশ্রিত। মূর্খ গুরু পুরোহিত এ ধর্ম্মের নেতা। তাহাদের আনুগত্যে কোন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না। একারণে এ ধর্ম্মে ভারতীয় মহিলাকুলেরও অধঃপতন হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য। এসকল প্রভাবে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে এদেশে নারীজাতি হতচেতন হইবার কথা।

পূর্ব্বোল্লিখিত কারণসমূহের সমবায়েও ভারতরমণী একেবারে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই। তাহার কারণ সতীধর্ম্ম এবং প্রেম। প্রেম স্বর্গীয়-শক্তি। সতীধর্ম্মেও স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। স্বাধীন ব্যক্তিরূপেই রমণী আপন সতীধর্ম্ম রক্ষা করেন। বিশুদ্ধ স্নেহ প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া ভারত-মহিলা যে স্বীয় পরিবার পরিজন এবং প্রতিবেশিগণের সেবা করেন, সেই পুণ্য-বলে বিস্তীর্ণ হিন্দু নরসমাজের সবিশেষ যত্নেও স্বকীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব হইতে একেবারে তিরোহিত হয়েন নাই।

যাহা হউক দুঃখিনী ভারত নারীর উপরে বিশ্ববিধাতার কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। যাহাতে ভারতবাসিনীগণ স্বকীয় স্বাধীনতার ভূমিতে অধিরোহণ পূর্ব্বক ব্যক্তিত্বের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন বিধাতা তাহার আয়োজন বর্ত্তমান যুগে বিধান করিয়াছেন। শিক্ষিতা মহিলাদিগের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান উপায় গ্রহণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানপ্রভাবে নারীদিগের স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব চিনিয়া লইতে হইবে। স্বাধীনভাবে শুদ্ধভাবে নীতি ও ধর্ম্মের অধীন হইতে হইবে। ইহা করিলে স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশুদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ প্রতিবেশিনী ভগিনীগণ যে প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া

রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান জন্মিবে। তখন তাঁহাদের দুর্গতি দূরীকরণার্থ যাহা করা প্রয়োজন তদ্বিষয়ে চিন্তা প্রধাবিত হইবে।

মনুষ্যের পক্ষে ধনাধিকার জ্ঞানাধিকার এবং স্বীয় জীবনের স্বাধীনভাবে ব্যবহারে অধিকার থাকাই ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য। পশু পক্ষীর ন্যায় অন্যের অধীন হইয়া আহার ও বিশ্রামস্থান লাভ করা, জীবনের ব্যবহার করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ। মনুষ্য মনুষ্যের অধীন হইলেও স্বাধীনভাবেই অধীন হইবে এবং তদ্দ্বারা কোনরূপে তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না।

সকল কালে এবং সকল দেশেই মহাপুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাপুরুষগণ নারীজাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়াছেন। ঈশা এবং গৌরাঙ্গের শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যবহারের প্রভাবে অনেক পতিতা রমণী পুণ্যের অত্যুচ্চ ভূমিতে অধিরোহণ করিয়াছেন। মেরি মেগ্‌ডেলিনীকে সেদেশে জনসাধারণ পতিতা বলিয়া খুব অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। কিন্তু একমাত্র যিশুখ্রীষ্টের সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে মেরী পুনরায় পুণ্যবতী ও ভক্তিমতী হইয়া চিরকাল জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্গ ও ব্যবহার পাইয়া কোন কোন বারবিলাসিনী ভক্তিমতী ও বৈরাগিনী হইয়া অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রিক ও জনসাধারণের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নারীজাতির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাযুক্ত-চিত্ত ছিলেন। তিনি শত্রু মিত্র, দেশ বিদেশ নির্ব্বিশেষে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের আদি প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও নারীজাতির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিতেন। একারণে নারীর অধীনতা ও দুঃখ বিমোচনার্থ তিনি কত অনন্য-সাধারণ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষগণ নারীজাতিকে চিরকাল স্বাধীন ব্যক্তিভাবে শ্রদ্ধা প্রীতি দিয়াছেন। জনসাধারণের ভাব নানা সূত্রে নানা দেশে ইহার বিপরীত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণে এরূপ বিরুদ্ধভাব আর তিষ্ঠিতে পারিবে না। নারী স্বাধীন ব্যক্তিরূপে জ্ঞানে গুণে ধনে সম্ভ্রমে জনসমাজে দণ্ডায়মান ও স্বীকৃত হইবে। ইহাতে জনসমাজের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না, কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হইবে না। "মহিলা" পত্রের মহিলা গ্রাহিকাগণ কি এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন?

একটী বৌদ্ধগল্প।

একদা জেতবন বিহারকালে বুদ্ধদেব একটী পুত্রশোকাতুর গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া এই গল্পটী বলিয়াছিলেন। এই গৃহস্থ পুত্রের মৃত্যুকাল অবধি স্নানাহার

ত্যাগ করিয়াছিল, কর্ত্তব্যকর্ম্মও সম্পাদন করিত না; কেবল নিরন্তর রোদন করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিত। কিন্তু নির্ব্বাণপথে স্রোতাপন্ন হইবার শক্তি তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল। একদিন প্রত্যুষ সময়ে ত্রিলোক অবধারণ করিতে করিতে বুদ্ধদেব তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, "ইহার শোক হরণ করিয়া ইহাকে নির্ব্বাণপথের পথিক করিতে সমর্থ আমাভিন্ন আর কেহ নাই, আমিই ইহার মুক্তির কারণ হইব।" এই চিন্তা করিয়া আহারান্তে অনুচর শিষ্যগণকে লইয়া তিনি গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থও তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সম্মানসহকারে নির্দ্দিষ্ট আসনে স্থান দিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ, অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছ কি?" "দেব, সত্যই আমি পুত্রের মৃত্যুকাল অবধি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছি", গৃহস্থ এইরূপ উত্তর দান করায় তিনি বলিলেন, "ভ্রাতঃ, যাহা ভঙ্গুর তাহা ভগ্ন হয়, যাহা নাশধর্ম্মী তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়; ইহা একজনের কিম্বা কোনও এক বিশেষ স্থানের অদৃষ্ট নহে, এই যে অপরিমেয় ত্রিভুবন ইহাতে অবিনশ্বর নামে বা একভাবে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে এরকম কোনও বস্তু নাই, সকল প্রাণী মরণধর্ম্মী, সমস্ত যৌগিক বস্তু বিয়োগধর্ম্মী। পরাকালে জ্ঞানিগণ পুত্রের মৃত্যু হইলেও 'নাশধর্ম্মী নষ্ট হইয়াছে' এই চিন্তা করিয়া শোক করেন নাই।" এই বলিয়া গৃহস্থ কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া বুদ্ধদেব অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন।

অতীতে বারানসী নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব নগরদ্বারসমীপস্থ গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গৃহধর্ম্মপালন করিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র এবং একটী কন্যা এই দুইটী সন্তান ছিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সমানকুলসম্ভূত একটী কুমারী পুত্রবধূরূপে গৃহে আনয়ন করিলেন। এইরূপে দাসীকে গণনা করিয়া তাঁহারা সংসারে ছয়জন হইলেন, অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ এবং দাসী। তাঁহারা সকলে আনন্দচিত্তে পরস্পরের প্রীতিসাধন করিয়া বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব অন্য সকলকে এই প্রকারে উপদেশ দান করিতেন, "তোমরা যথানিয়মে দান করিবে, শীল রক্ষা করিবে, উপবাস সাধন করিবে, মৃত্যু বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে এবং নিজ নিজ মরণশীলতা স্মরণে রাখিবে। সমস্ত প্রাণীর মরণ নিশ্চিত এবং জীবন অনিশ্চিত, সমস্ত যৌগিক বস্তু অনিত্য এবং ক্ষয়ধর্ম্মী। এই সকল চিন্তায় দিবারাত্রি সাবধানে অতিক্রম কর।" তাঁহারা সকলে উপদেশ গ্রহণ করিয়া এইরূপে সাবধানে সর্ব্বক্ষণ মৃত্যুবিষয় চিন্তা করিতেন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব ভূমিকর্ষণ করিবার জন্য পুত্রের সহিত একদিন ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রস্থিত সমস্ত জঞ্জাল একত্রিত করিয়া একস্থানে পোড়াইতে

লাগিল। তাহার অনতিদূরে একটী বল্মীকে একটী সর্প বাস করিত। ধূমে তাহার চক্ষে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হইল। সে ক্রুদ্ধভাবে বহির্গত হইয়া, "ইহারই জন্য আমার এই কষ্ট উপস্থিত," এই চিন্তা করিয়া তাহার বিষদন্ত দ্বারা বোধিসত্ত্বের পুত্রকে দংশন করিল এবং সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব লাঙ্গল রাখিয়া নিকটে আসিলেন এবং পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তখন তাহাকে উঠাইয়া একটী বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন, কিন্তু কোনও প্রকার ক্রন্দন বা শোকপ্রকাশ করিলেন না; "যাহা ভঙ্গুর তাহা ভগ্ন হইয়াছে, মরণধর্ম্মা মৃত হইয়াছে, সমস্ত যৌগিক বস্তু অনিত্য এবং মরণশীল" এইরূপে সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে কর্ষণ করিতে থাকিলেন।

কিছুকাল পরে ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া একজন প্রতিবেশীকে যাইতে দেখিয়া এবং সে গৃহে যাইতেছে শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ, আমাদের গৃহে যাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিবে যে, আজ অন্যদিনের ন্যায় দুই জনের আহার না আনিয়া যেন একজনের জন্যই আনা হয় এবং অন্যদিন দাসী একাকীই আহার আনয়ন করে, আজ যেন চারিজনেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্প ও গন্ধ হস্তে লইয়া সকলেই এখানে আসে।" ঐ প্রতিবেশী গৃহে যাইয়া ব্রাহ্মণীকে ঐ প্রকার বলিল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সংবাদ কে পাঠাইয়াছে?" প্রতিবেশী বলিল যে ব্রাহ্মণ নিজেই সংবাদ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণী তখনই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে সেই জন্যই এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন একটুও বিচলিত হইল না। এইরূপে স্থিরচিত্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া, পুষ্প, সুগন্ধ ও আহার সামগ্রী লইয়া অন্য সকলের সহিত ব্রাহ্মণী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। একজনও রোদন কিম্বা বিলাপ কিছুই করিলেন না। পুত্র যে বৃক্ষমূলে শায়িত ছিল সেই বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়াই বোধিসত্ত্ব ভোজন করিলেন। আহারান্তে সকলে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহ চিতার উপরে রাখিয়া পুষ্প ও গন্ধ সহকারে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক দাহ করিলেন। কাহারও একবিন্দু অশ্রু দেখা গেল না। সকলেই মৃত্যুচিন্তায় চিত্তসমাহিত করিয়া রহিলেন।

এদিকে তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতাপে শক্রের সিংহাসন উষ্ণ হইয়া উঠিল। "কে আমাকে স্থানচ্যুত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে?" এই অবধারণ করিতে করিতে শক্র ইঁহাদের গুণের প্রতাপ জানিতে পারিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন, "ইহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিয়া তদনন্তর ইহাদের গৃহ সপ্তরত্নপূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য।" এই চিন্তা করিয়া তিনি শীঘ্রগতি ঐ স্থানে গিয়া চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ?" "মহাশয়, একটী মনুষ্যকে চিতাগ্নিতে দাহ করিতেছি।"

"কিন্তু মনে হইতেছে যে, তোমরা কোনও মনুষ্যকে পোড়াইতেছ না, বরং যেন কোনও পশুকে মারিয়া পোড়াইতেছ।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না তাহা নহে, আমরা একটী মনুষ্যকেই পোড়াইতেছি।" শক্র বলিলেন, "তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এ নিশ্চয়ই তোমাদের কোনও শত্রু।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশয়, শত্রু নয়, আমাদের আপন পুত্র।" শক্র বলিলেন, "তবে নিশ্চয়ই এ তোমাদের অত্যন্ত অপ্রিয় পুত্র ছিল।" "না, মহাশয়, আমাদের অতি প্রিয় পুত্র।" "তাহা হইলে তোমরা রোদন করিতেছ না কেন?" তখন বোধিসত্ত্ব রোদন না করিবার কারণ বলিলেন, "মহাশয়, সর্প যেমন তাহার জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ আমার পুত্র তাহার শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পরে এই শরীর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান রহিত হইয়াছে; ইহাকে দাহ করিলেও জানিতে পারে না, জ্ঞাতিগণের শোক-কোলাহলও শুনিতে পারে না। এই কারণে আমি শোক করিতেছি না। তাহার যে গতি ছিল তাহা হইয়াছে।"

শক্র বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার এ কে হয়?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "যাহাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া স্তন্যপান করাইয়া মানুষ করিয়াছিলাম এ আমার সেই পুত্র।" শক্র বলিলেন, "মা, পিতা পুরুষ-স্বভাববশতঃ রোদন না করিতে পারেন, কিন্তু মাতৃহৃদয় তো কোমল হয়; তবে তুমি রোদন করিতেছ না কেন?" তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, "অনাহূতভাবে সেখান হইতে আসিয়াছিল, বিনানুমতিতে এখান হইতে চলিয়া গেল; যথা হইতে আসিয়াছিল তথায় ফিরিয়া গেল, ইহাতে দুঃখ কি? তাহার যে গতি ছিল তাহা হইয়াছে, এই কারণে আমি শোক করিতেছি না।"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া শক্র মৃতব্যক্তির ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ তোমার কে?" "আমার ভ্রাতা।" "মা, ভগিনী ভ্রাতার প্রতি সস্নেহ হন, তবে তুমি কেন রোদন করিতেছ না?" তখন ভগিনীও তাহার কারণ বলিলেন, "ক্রন্দন করিয়া আমারও কোন লাভ হইবে না, আমার মৃত ভ্রাতারও কোনও লাভ হইবে না। তাহার নিরূপিত গতিতে সে গিয়াছে, এইজন্যই আমি শোক করিতেছি না।"

ভগিনীর কথা শুনিয়া শক্র মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ইনি তোমার কি হন?" "মহাশয়, আমার পতি।" "পতি মৃত হইলে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হন, অনাথা হন; তবে তুমি কেন রোদন করিতেছ না?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আকাশের পূর্ণচন্দ্র লইবার জন্য ব্যস্ত বালকের ক্রন্দন যেমন নিষ্ফল তেমনি যাহা কখনও ফিরিয়া আসিবে না তাহার জন্য রোদন করাও নিষ্ফল। নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে আমার পতি গমন করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার জন্য শোক করিতেছি না।" তাঁহার কথা শুনিয়া শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা,

তোমার উনি কি হন?' "আমার প্রভু।" "তবে নিশ্চয়ই ইনি তোমাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতেন, সেইজন্য 'ভালই হইয়াছে' এই কথা ভাবিয়া তুমি রোদন করিতেছ না।" তখন দাসী বলিল, "মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না, এরূপ বলা উচিত নয়। আমার প্রভুর পুত্র আমার বক্ষে লালিত পালিত নিজ পুত্রের ন্যায় প্রিয় ছিলেন এবং সহিষ্ণুতা মৈত্রী ইত্যাদি নানা গুণে ভূষিত ছিলেন।" "তাহা হইলে তুমি রোদন করিতেছ না কেন?" তখন দাসী বলিল, "যেমন ভগ্ন-কুম্ভ আর জোড়া লাগিতে পারে না তেমনি আমাদের সকলের শোকও মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারে না। আমার প্রভুপুত্র নির্দিষ্ট পথে গমন করিয়াছেন সেইজন্য আমি আর তাঁহার জন্য শোক করিতেছি না।"

সকলের জ্ঞানপূর্ণ এই সকল উত্তর শুনিয়া শক্র প্রসন্ন-চিত্তে বলিলেন, "তোমরা সকলেই অবিচলিতভাবে এবং প্রকৃতরূপে মৃত্যুবিষয়ে চিন্তা করিয়াছ। আর তোমাদের স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমি দেবরাজ শক্র, আমি তোমাদের গৃহ সপ্তরত্নপূর্ণ করিব। তোমরা দান করিতে থাকিবে, শীল রক্ষা করিবে; উপবাস পালন করিবে। সকলে সুখে বাস কর।" এই উপদেশ দিয়া এবং তাঁহাদের গৃহ অপরিমিত ধনে পূর্ণ করিয়া দিয়া শক্র প্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধদেব এই ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া সত্যসকল প্রকাশ করিয়া তাঁহার গল্প শেষ করিলেন। ইহার ফলে পুত্র-শোকাতুর গৃহস্থ শোক জয় করিয়া নির্ব্বাণ পথে স্রোতাপন্ন হইলেন।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতি-পালন করিলেও কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই অসহায়তা ও দুরবস্থার প্রধান কারণ, সুতরাং লোকসমাজে যাহাতে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই যে পরিবারের মধ্যে একজনের কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে একটীর পর আর একটী করিয়া বাটীর সমস্ত লোককেই ক্রমে ক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ক্রমে পল্লীর মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে উহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইলে এই সকল রোগের আক্র-মণ হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যেও উহাদিগের পরিব্যাপ্তি কতকাংশে নিবারণ করিতে

সমর্থ হই। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে পল্লীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ যে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে, প্রতিবেশী সমাজকেও নানারূপ অসুবিধা, ক্লেশ ও বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে ও কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের ভালরূপে জানা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলে উহার নিবারণের চেষ্টা করা বৃথা হইয়া থাকে এবং এইজন্য আমরা অনেক সময়ে অনাশ, অসুবিধা ও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি।

কতকগুলি চক্ষুর অগোচর বিশেষ বিশেষ নিম্নশ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকনা, খোসপাঁচড়া, দাদ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ রোগীর বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা, অথবা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা রোগের বীজ রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে; উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সূক্ষ্মাংশ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় এবং নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যদি পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিফ্থিরিয়া রোগের বীজ বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগীর গলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা বায়ু, পানীয় জল বা দূষিত খাদ্য দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন কালে রোগীর

শরীর হইতে শোষিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়। পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং ঐ মশকী যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever), ফাইলেরিয়েসিস্, (Filariasis), কাল-নিদ্রা (Sleeping sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্ন জাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। সম্প্রতি গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আসামের সাংঘাতিক কালা-জ্বর (Kala-azar) ছারপোকা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার (Saliva) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষত-স্থানের রক্তের সহিত একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়।

বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্, যক্ষ্মা, প্লেগ্, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি অনেকানেক সংক্রামক রোগের বীজের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাতীয়। ইহারা চক্ষুর অগোচর, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ইহারা দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহাদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিবার পর অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহাদিগের এক একটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উদ্ভিদাণুতে পরিণত হয় এবং সেই সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) উৎপাদন করে। ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ঐ সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ সকল রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং বায়ু, বস্ত্র ব শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে উক্ত রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটী স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; নানা কারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে উহা

অবাধে বিষ-ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহারা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে অথবা যাহারা যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না, তাহারাই অধিক সংখ্যায় উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং রোগ-বিস্তৃতির মধ্যে বাস করিয়াও লোকে অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পুনশ্চ বসন্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, যাহা একবার হইলে আর পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড ফিভার্, প্লেগ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজ আমাদের পরীক্ষাগারে অথবা অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিবার পর বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া "টিকা" (Vaccine) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঐ সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই আজীবন বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। প্লেগ, টাইফয়েড ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল রোগে "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিক দিন বিদ্যমান না থাকিলেও যে সময়ে উহারা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন "টিকা" লইলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীচুণীলাল বসু।

(ভারতী)

কি প্রকারে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

এ জগতে সকলেই বলিবে যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিম্বা প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। যাঁহারা এই বিষয়ে কখনও নিজ নিজ জীবনে অনুসন্ধান করেন নাই, কিম্বা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন নাই তাঁহারাই এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। সাধনা ব্যতিরেকে জগতে কোন কাজ হয় না। কেবল কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া মাতৃস্তন পান করিলে কি জগতে কোন বিষয়ে সিদ্ধকাম হওয়া যায়? ধর্ম্মসম্বন্ধেই কেবল নয়, সংসারের কোন বিষয় সম্বন্ধেও ত হয় না। ভগবানকে যদি একান্তই প্রাপ্তির

বাসনা হয়, যদি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে একান্তই ঔৎসুক্যের উদয় হয়, তবে তাহার নিমিত্ত, আমাদের 'আমিত্ব' অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' ভাব পরিত্যাগ করা উচিত। কেবল কি তাহাই? না, তাহা নহে। উহা ব্যতীত আমাদিগকে ব্যাকুল হইতে হইবে। 'আমি ঈশ্বরকে দেখিব', তাহার জন্য আমার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা হউক এইরূপ ব্যাকুলতার ভাব আসা আবশ্যক। তাহা না হইলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? কোন্ সাধু ব্যক্তির প্রাণে ঈশ্বর-লাভের পূর্ব্বে এরূপ ব্যাকুলতার ভাব না আসিয়াছে? এইরূপ ভাব আসিলে তৎপরে স্বতই 'বিশ্বাস'—অর্থাৎ ভগবান্ যে আছেন এইভাব জাগরূক হয়। ভগবানের অস্তিত্বে আস্থা না আসিলে কেবল ব্যাকুল ভাব দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই দুই ভাবদ্বয়ের যখন সমন্বয় হয় তখন 'প্রার্থনা'—তাঁহার নিকট আমার মনের আকাঙ্ক্ষা, অভাব জানাইবার ভাবের উদ্রেক হয়। টলার নামক এক ব্যক্তি একদা এক ধর্ম্ম-পিপাসু কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপে ঈশ্বরকে পাইলে?" সে বলিল—"যখন আমি আমার 'আমিত্ব' ভাব পরিত্যাগ করি, তখনই তাঁহাকে পাই।" এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরকে পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের 'আমিত্ব' ভাব ও এ সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে ও তাঁহার নিকট শরণাপন্ন হইয়া নিত্য তাঁহার উপাসনা, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মাবলম্বন করিলে আমরা ঈশ্বর লাভে সমর্থ হইতে পারিব।

শ্রীসু—

মালদহ।

জীবনের অভিজ্ঞতা।

শ্রীহরির চরণে প্রণাম। সর্ব্বপ্রথমে সেই ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মহাপুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই ভারতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমি দেখি নাই। সেই মহাপুরুষের বিশেষ কিছু জানি না। তিনি বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই বৃক্ষ ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যত্নে রক্ষা ও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের চরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। তারপর ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মহাত্মা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেই বীজ বা সেই বৃক্ষের ফল পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিলেন। সেইজন্য তাঁর চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি। তাঁহারা এখন এ পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তাঁহাদের সেই জীবন্ত তেজ ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই তেজস্বী মহাপুরুষেরা ভারতকে জীবিত করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কথা আমি ক্ষুদ্র হইয়া কি লিখিব। তিনি একজন স্বর্গের লোক, তিনি সর্ব্বদা স্বর্গেই থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় স্বর্গের জিনিষে পূর্ণ ছিল। তাঁহাকে

দেখিলেই মনে হইত যেন তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন ; যেন ঈশ্বরেতে ডুবে আছেন। আমি প্রথম যখন তাঁহাকে কলিকাতার ব্রহ্মমন্দিরে দেখিয়াছিলাম—তিনি উপাসনা করিলেন, একটি গান করিলেন ; তাই দেখিয়া শুনিয়া তখনই তিনি যে একজন স্বর্গের লোক তাহা মনে হইয়াছিল। সেই ভাবটি এখনও আমার মনে রহিয়াছে। পরে যখন তাঁহাকে দেখিতাম,তখনই সেই সুন্দর ভাবটি আমার মনকে গলাইয়া দিত। তাঁহার ভিতর এত তেজ ছিল যে, যে তাঁহার কাছে যাইত তার ভিতরে সেই তেজ আসিয়া লাগিত। একবার তিনি সদলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গয়া গিয়াছিলেন। তখন আমরা গয়াতে ছিলাম। গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপরে একদিন উপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনার পরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন—তখন পাহাড়কে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল যেন উপদেশের সঙ্গে পাহাড় কথা বলিতেছে ; পাহাড়কে সম্বোধন করিয়া এমনই জীবন্ত ভাবের কথা বলিয়াছিলেন যে,পাহাড় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার তেজের ভিতরে কেমন এক সরল সত্যভাব ছিল। তিনি পুরুষ ও নারীজাতিকে সতী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতি যখন সতে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে আপনাকে সমর্পণ করে তখনই সতী হয়। তিনি ঈশ্বরেতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই নারীজাতির কোমলতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিলেন।

এই মহাপুরুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বর এক সুন্দর বিধান পাঠাইয়াছেন, তাহার নাম নববিধান। এই নববিধানে ঈশ্বরের মাতৃভাব কেমন সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে সকলের মা, ইহা কেশবচন্দ্রের ভিতরে অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাহা সকলকে দিয়া গেলেন। এই বিধানে আমি ঈশ্বরকে মা বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি —যেন ধরিতে ছুঁইতে পাইতেছি। কেশবচন্দ্র যেমন ধর্ম্মরাজ্যের লোক ছিলেন, তেমনই সংসারের সুশৃঙ্খলা জানিতেন। যাঁহারা নবসংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ধন্য নববিধান, ধন্য কেশবচন্দ্র।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মিকা।

নেপাল।

(কাঠমুণ্ডপ্রবাসী বন্ধুর পত্রাংশ)

এই দেশ অতি সুন্দর। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্থিত কাঠমুণ্ড সহরের সৌন্দর্য্যবর্ণনা লেখাতে করা যায় না। এই সৌন্দর্য্য কেবল অনুভব করা যায়। বিশ্বকে যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কারুকার্য্য যে কত নিপুণ হইতে পারে, এক জন নেপালে বসিয়া তাহা বেশ অনুভব করিতে পারে। জীবনে অনেক সুন্দর স্থান দেখেছি, কিন্তু

এমন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য কম দেখেছি। প্রতি প্রভাতে প্রতি সন্ধ্যায় এখানকার হিন্দু দেবতা পশুপতিনাথের আরতি হয়, এই আরতি হিন্দু ভক্তগণ করেন; কিন্তু প্রকৃতি, প্রতিদিন যে প্রাকৃতিনাথের আরতি করেন, সে আরতিতে প্রাণ যেমন মুগ্ধ হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। নেপালে আসিবার আগে কখনও ভাবি নাই যে, এমন সুন্দর স্থানে আসিতেছি।

এস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীই অধিক। বৌদ্ধদেবতার মন্দির অগণন। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে খুব ভালভাব আছে। এস্থানের হিন্দু আচারও আমাদের দেশ হইতে স্বতন্ত্র। বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণেতর রমণীকে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু সন্তানগণ ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয় হইবে। ভোটেরা এদেশে মৃত গোমাংস খায়; কিন্তু ভোট রমণীর সহিত একজন ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হইতে পারে, সন্তানগণ ক্ষত্রিয় হইবে, এ সমস্ত সন্তানেরা আপন মাতার স্পৃষ্ট অন্ন খায় না। নেওয়ার এক জাত আছে, তাহারা মহিষের মাংস খায়, তাহারাও হিন্দু এবং তাহাদেরও জলচল আছে। তাহাদের রমণীগণ চিরসধবা। বালিকা অবস্থায় নেওয়ার রমণীর বেলফলের সহিত প্রথমে বিবাহ হয়, এবং এই বেলটিকে অতি যত্নে রক্ষা করা হয়। পরে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার আবার বিবাহ হয়; কিন্তু এই বিবাহিত স্বামীর মৃত্যুতে নেওয়ার রমণী বিধবা হন না, তিনি ইচ্ছা করিলে আর এক জন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কোনও কারণে বেল ফলটি নষ্ট হয়, তাহা হইলে নেওয়ার রমণী বিধবা হন।

ভোটে রমণীগণ একসঙ্গে অনেক স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। স্বামিগণ প্রায় সকলেই ভ্রাতা। সর্ব্বপ্রথম সন্তান সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বামীর, এবং দ্বিতীয় সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর, এইরূপে সন্তানগণ বিভক্ত হয়। এস্থানের এ প্রকারের অনেক প্রথা আছে, যাহা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। মাতুলকন্যাকে এদেশে বিবাহ করা যায়। ঠিক মহাভারতে যে সমস্ত পাঠ করা যায়, সে সমস্ত অনেক প্রথা এখনও এস্থানে প্রচলিত দেখা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গত চৈত্র মাসের মহিলাতে আমরা আমাদের বড়লাট পত্নী লেডি হার্ডিংএর একখানি সুন্দর পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, বড়লাট লর্ড হার্ডিং মহোদয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ২০শে জুন সমস্ত ভারতের স্কুলের বালক বালিকাগণকে একটি আনন্দোৎসব দান করিতে হইবে। বড়লাটপত্নীর এই সুন্দর প্রস্তাবে দেশের সকল শ্রেণীর লোকই আনন্দের সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। লেডি হার্ডিংএর নিকট যে টাকা উঠিয়া ছিল, তাহা তিনি হাঁসপাতাল জেল প্রভৃতির বালক বালিকাগণের উৎসবের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। বালক, বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ

এজন্য নগরের অভিভাবকগণের সংগৃহীত টাকা হইতে কিছু কিছু অর্থ পাইয়া আপন আপন ছাত্রছাত্রীদিগের উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বড় বড় নগরে সহস্র সহস্র বালক বালিকাগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছে। কলিকাতা সেদিন প্রকৃতই আনন্দের শ্রীলাভ করিয়াছিল। মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ইংরেজ, ইহুদী, হিন্দু সকল বালক বালিকাগণ বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিল। কলিকাতা অনাথাশ্রম ও অন্যান্য বালক বালিকার স্থানে সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানারূপ আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় লর্ড হার্ডিং যে ভয়ানক অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং ক্রমে সুস্থতা লাভ করিয়াছেন তাহা যাঁহারা দিল্লীর শোভা যাত্রার কথা ও বোমা মারার দুর্ঘটনার কথা সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলেন তাঁহারাই জানিতেন। কিন্তু ২০শে জুন যে কৃতজ্ঞতাসূচক উৎসব হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত বালক বালিকা এই ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে এবং কেমন আশ্চর্য্যরূপে নৃশংস দুবৃত্তের ভয়ানক দুষ্কার্য্যে স্বয়ং ভগবান্ বাধা দিয়া বড়লাটের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সকলের চিরজীবন স্মরণ থাকিবে।

—

উত্তর মহাসাগরে আইসলাণ্ড নামে একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে। যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন তাঁহারাই ইহার নাম জানেন ও ইহাই জানেন যে এস্থানে অতি ভয়ঙ্কর শীত। বৎসরের বেশী ভাগ সময় দেশ বরফে ঢাকা থাকে। এই দেশের বিষয় কয়েকটি কথা সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। এদেশে জেলখানা নাই, দুষ্ট লোককে বদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান নাই। বিচারালয় নাই একজন মাত্র পুলিশ আছে। এদেশে এক ফোঁটা মদও তৈয়ার হয় না। এদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮ হাজার অধিবাসী, তাহারা সকলে সুরাপানমুক্ত, কারণ এদেশে অন্য দেশ হইতে মদ যাইতে পারে না। এখানে বয়ঃপ্রাপ্ত অশিক্ষিত লোক একটিও নাই—দশ বৎসর বয়স হইয়াছে অথচ পড়িতে পারে না এমন একটি মানুষও নাই।

—

একবৎসর বর্ষা না হইলে কি মহা দুঃখ উপস্থিত হয়, দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন কষ্ট হয়; সহস্র ২ লোকের অনাবৃষ্টি ভাবিতেই যেন কত বিপদের কথা মনে হয়। এবৎসর বৃষ্টি বেশ হইতেছে। কোন কোন স্থানে অতি বৃষ্টি হইয়া আবার বিপদ ঘটিতেছে। বোম্বাই প্রদেশে পালা-টিনা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে একরাত্রিতে অতি-বৃষ্টি হইয়া কি ক্ষতি ও কত মানুষের প্রাণ-নাশ হইয়াছে তাহা সংবাদ পত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনে পাঁচরা ষ্টেশনের সালপো নদীর পুল ভাঙ্গিয়া ইঞ্জিন ও যাত্রী গাড়ী নদীতে পড়িয়া আর এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে; ভোরের বেলায় আরোহিগণ নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব গম্য স্থানে যাইতেছে, ইহার

মধ্যে ভীষণ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত। বিধাতা মানুষকে আরও কত বুদ্ধিমান ও সাবধান হইতে বলিতেছেন তাহা আমরা এখন ও বুঝিতেই পারিতেছিনা।

দিন দিন কত অসম্ভব হইতেছে। আমরা এতদিন ভাবিতাম, পদ্মা নদীর উপর পুল হইতে পারে না। এত প্রশস্ত নদী, এত গভীর, স্রোত এত প্রবল যে ইহার উপর পুল করা অসম্ভব। রেলের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণও এ কার্য্যে হাত দিতে সাহস করেন নাই। কয়েক বৎসর হইল সাঁড়া ঘাটের নিকট পদ্মার উপর পুল নির্ম্মাণ করিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে, এজন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান সময়ের গণিত ও বস্তু বিদ্যার জ্ঞান যত শক্তি মানুষকে দিয়াছে তাহা ইহাতে প্রয়োগ করা হইতেছে। গত জুন মাসে এই অদ্ভুত পুলের প্রথম স্থায়ী বীম বসান হইয়াছে। ইহা যে কি মহা ব্যাপার হইতেছে, তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ভগবান মানুষকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, সে জ্ঞান দ্বারা জড়কে আপনার কার্য্যে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে। আমাদের চিরদিনের ভীতির সামগ্রী পদ্মানদী এখন পদতলে পড়িয়া থাকিবে, আর বালক বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা এক নূতন ব্যাপার। তবে এই পুল শেষ হইয়া রেল চলা পর্য্যন্ত লোকে এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

নারীগণের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ, একটি শুশ্রূষা শিক্ষার বিদ্যালয় দীল্লিতে স্থাপন করিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের উদার হৃদয়া মহামাননীয়া বড়লাট পত্নীর মনে স্থান পাইয়াছে; তিনি এ বিষয়ে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ টাকা দান সংগৃহীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এক জয়পুরের মহারাজাই তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, অচিরে এই মহৎ কার্য্য আরম্ভ হইবে। বড়লাটপত্নী নানা রূপে দেশের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত আছেন, তাঁহার ন্যায় উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কোন শুভ কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে অবশ্যই সফল হইবে। আমরা এই লেডী হার্ডিং মহিলা মেডিকাল কলেজ ও শুশ্রূষা বিদ্যালয় দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছি।

যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য তুরস্কের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া পরস্পরের বন্ধু হইয়া তুরস্কের রাজ্যের অনেক অংশ জয় করিয়াছেন, এখন লুটের মাল ভাগ করিতে যাইয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সকলেরই আপন আপন শক্তির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস হইয়াছে, এখন কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া বন্ধুতা রক্ষাকরা কঠিন। তুরস্কের যাহা হইবার তাহা হইল; এখন সারভিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো, গ্রীস প্রভৃতির সকলেরই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ-

পত্র পাঠে জানা যায় যে, সার্ভিয় সহিত বুলগেরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গত ১লা জুলাইর তারের সংবাদ আসিয়াছে যে, একলক্ষ বুলগার সৈন্য এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইয়াছে, শেষে বুলগারগণ শ্বেত পতাকা দেখাইয়া যুদ্ধ শেষ করিয়াছে। এখন এরূপ যুদ্ধ কতদিন চলিবে ও কত প্রাণনাশ হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না।

——

কলিকাতার বিষয়।—১৯১১ সনে যে জনসংখ্যা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা জানা যায় যে, কলিকাতার জন সংখ্যা ১০,৪৩,৩০৭; এই সংখ্যা দিল্লীর জন সংখ্যার তিনগুণেরও অধিক। বোম্বাইর জনসংখ্যা ইহা অপেক্ষা ৬২৮৩২ কম। এক লণ্ডন ব্যতীত ইংরাজরাজ্যে এত বড় নগর আর নাই।

কলিকাতার শিশুর মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ডাঃ পেয়ারস্ বলিয়াছেন যে, অকালে জন্ম, দুর্ব্বল শরীরে জন্ম, এবং অপরিস্কার ছুরি প্রভৃতিদ্বারা নাড়ী কাটাই শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়াও শিশুর মৃত্যুর বিশেষ কারণ। খালধারে ও নালার ধারে যাহারা বাস করে তাহাদিগের অধিক লোকের মৃত্যু হয়, আর এ সকল অঞ্চলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, কারণ হিন্দুগণ খালের ও নালার জল খায় ও তাহাতে স্নান করে, এ জন্য তাহাদের ম্যালেরিয়া রোগ অধিক হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানে ৬০৭৬৬৫ জন পুরুষ ও ২৮৮৩৯৩ জন স্ত্রীলোক আছে। হিন্দুর সংখ্যা ৬০৪৮৫৩, মুসলমান ২৪১৫৮৭, খৃষ্টান ৩৯১৫১।

কলিকাতায় মোট ৫১ ভাষাভাষী লোক বাস করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত ভাষার মধ্যে ২৮টী এইনগরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫০৭৬ ব্যক্তি আফ্রিকা ও এসিয়ার বিভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার মধ্যে নয়টী ভাষা ব্যবহার করে। মোট ৫১২৫ ৭৯ জন বাঙ্গালা, ৩৬৫৩৩৭ জন হিন্দী ১০০৫ জন উর্দ্দু, ৪১১৫৩ উড়িয়া, ৪৯৭৪ মারওয়ারী, ৮০২ গুজরাটী, ১৭৪৩ পঞ্জাবী, ১৭০১ তামিল এবং ২৪৩৯ জন তেলেগু ভাষা ব্যবহার করে। ২৮৭৩০ জন ইংরাজী, ২৬১১ জন পারস্য ও ৬৫৬ আরবীভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে।

শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা। শিক্ষিত পুরুষ অধিবাসীর এক সপ্তম পুরুষ অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষিত স্ত্রীলোক অধিবাসীর মাত্র এক সপ্তমাংশ শিক্ষিত।

প্রতি সহস্রের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা।

	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্ম	৮৩৮	৮৬২	৮১৩
পারসী	৮২৩	৮৭১	৭৪৩
খ্রীষ্টান	৮০০	৮২১	৭৭৩
ইহুদী	৬৯৩	৭৪৪	৬৪৫
জৈন	৬০৮	৭৬২	১৩৮
বৌদ্ধ	৫০৯	৫৬৪	২৯৯
শিখ	৫০১	৫৮৮	৮৮
কনফিউসিয়ান	৩৫৮	৩৯৫	১৩১
হিন্দু	৩২৭	৪২২	১৩৮
মুসলমান	১৫৩	২০৭	৩২